ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতসমূহ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত
অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Library
425557

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতসমূহ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত
অভিসন্দর্ভ

ঃ তত্ত্বাবধায়ক ঃ
ড. মুহাম্মদ আনসার উদ্‌দীন
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

ঃ গবেষক ঃ
মোঃ সিরাজুল ইসলাম
এম.ফিল গবেষক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিঃ নং-৬৫
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০২-২০০৩।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

ড. মুহাম্মদ আনসার উদ্‌দীন
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ।

Dr. Mohammad Anser Uddin
Professor
Department of Islamic Studies
University of Dhaka
Dhaka, Bangladesh.

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের এম.ফিল গবেষক মোঃ সিরাজুল ইসলাম কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রী অর্জনের জন্য দাখিলকৃত "ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতসমূহ" শীর্ষক গবেষণা থিসিসটি আমার তত্ত্বাবধায়নে প্রস্তুত করা হয়েছে। আমার জানামতে ইতিপূর্বে কোথাও এ শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য কোন গবেষণা কর্ম পরিচালিত হয়নি। আমি গবেষণা থিসিসটির পান্ডুলিপি আদ্যপান্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য সুপারিশ করছি।

১/৭/০৭

(ড. মুহাম্মদ আনসার উদ্‌দীন)
অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ।

425567

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, "ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতসমূহ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমি এর পূর্বে অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ণ অথবা অংশ বিশেষ কোথাও প্রকাশ করিনি এবং অন্য কোন ডিগ্রী/ডিপ্লোমা লাভের জন্য অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় উপস্থাপন করিনি।

(মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
এম.ফিল গবেষক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিঃ নং-৬৫
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০০২-২০০৩।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব্বুল আলামীনের জন্য যিনি আমাকে এ অভিসন্দর্ভটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করার তৌফিক দিয়েছেন। অসংখ্য দুরূদ ও সালাম বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত, কালজয়ী আদর্শের মূর্ত প্রতীক, ইসলামের ধারক ও বাহক হযরত মুহম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম এর প্রতি, যিনি মানব জাতিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্বেষণ, অধ্যয়ন ও গবেষণায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণীত করেছেন এবং পৃথিবীর বুকে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হিসেবে মানব জাতিকে হেদায়াতের সন্ধান দিয়েছেন।

আমি অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপনার শুরুতেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে, যারা আমাকে "ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতসমূহ" শীর্ষক গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক অত্র গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ড. মুহাম্মদ আনসার উদ্‌দীন স্যারের প্রতি, যিনি অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ দিক-নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণাকর্মকে সহজ-সাধ্য করেছেন।

আজকের এই দিনে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত সাবেক চেয়ারম্যান আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. মু. আব্দুস সাত্তার এবং ড. মু. আব্দুল মান্নান স্যারকে যাঁরা এ সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে আমাদের নিকট থেকে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন। আমি তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। আল্লাহ্ যেন তাঁদের জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড.মুহাম্মদ রুহুল আমীন স্যারসহ বিভাগের সকল স্যারকে, যাঁরা গবেষণা সুলভ পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে বিভিন্ন সময়ে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার বন্ধু সহযোগী অধ্যাপক ড. মু. আবু সিনা (চেয়ারম্যান, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়) কে, এবং সহযোগী অধ্যাপক মু. আব্দুর রব স্যার (চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, বি,এম বিশ্ববিদ্যালয়) কে, যাঁরা আমার গবেষণাকর্মে বিভিন্ন ধরণের পরামর্শ ও সহযোগিতা করেছেন।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার বন্ধু ড. মোঃ ছানাউল্লাহ্ (সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) কে, যিনি আমার গবেষণাকর্মে সব সময়ই পরামর্শ দিয়েছেন।

আজ এই মুহূর্তে আমি সবচেয়ে বেশী যাঁদেরকে স্মারণ করছি তাঁরা হলেন, আমার পরলোকবাসী মাতা-পিতা, যাঁদের নেক দোয়ায় এই গবেষণা কর্মে আমি অংশ গ্রহণ করতে পেরেছি।

এই গবেষণাকর্মে যিনি আমাকে বেশী উৎসাহ দিয়েছেন এবং সব সময় খোঁজ-খবর নিয়েছেন, তিনি হলেন আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুর এ্যাডভোকেট সেহাব উদ্দিন আহম্মদ। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাই সৈয়দ জাহাঙ্গীর হোসেন খন্দকার (প্রতিষ্ঠাতা-শাহ্ মাহমুদিয়া কলেজ, ঝালকাঠী), জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম তালুকদার (ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, শাহ্ মাহমুদিয়া কলেজ, ঝালকাঠী), জনাব আবু সোলায়মান মোঃ নিজাম উদ্দিন (সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা), আমার সহোদর মোঃ মফিজুর রহমান জালাল এবং আমার স্ত্রী নাজমা বেগম (প্রভাষক গণিত, আবদুর রব সেরনিয়াবাদ কলেজ, বরিশাল) এর প্রতি যাঁরা আমাকে এ গবেষণাকর্মে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ঢাকা, পাবলিক লাইব্রেরী, ঢাকা এবং বরিশাল ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বরিশাল-এর সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ গ্রন্থাগার থেকে গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যে সহযোগিতা করেছেন, সে জন্য তাঁদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে মহান আল্লাহ্ রব্বুল আ'লামীনের কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমার গবেষণা কর্মটুকু কবূল পূর্বক পরকালে নাজাতের ওয়াছিলা করে দেন। আমীন ॥

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

জ্ঞান-বিজ্ঞান পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক চিন্তাবিদ ও বিশেষজ্ঞরা দার্শনিক ও ব্যবহারিক উভয় পদ্ধতিতে অর্থনীতির বিশ্লেষণ করার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং আজও সে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। পুজিঁবাদের অনুসারীদের মধ্যে সর্বদাই তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। এ কঠোর প্রতিযোগিতা স্বভাবতই তাদের মধ্যে অধিকতর অর্থ সম্পদের লোভ-লালসা জাগ্রত করে এবং পরিনতিতে বিত্ত সম্পদের প্রতি তাদের আকর্ষণকে বহুগুনে বাড়িয়ে দেয়। রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন; "যারা কোন কিছুকে ভালবাসে, শেষ পর্যন্ত তারা তারই ভৃত্যে পরিণত হয়।" কাল মার্কস পুজিঁবাদের মতবাদকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে নিজেই আরেক ভ্রান্তির বেড়াজালে মানুষকে আবদ্ধ করে সমাজতন্ত্র নামে এক মতবাদ ও তার বাস্তব কর্মসূচীর মাধ্যমে ইউরোপে এক বিপ্লবের সৃষ্টি করেন। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিন্তা-ভাবনা প্রচলিত ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র পরিচালন পদ্ধতিতে এর যে প্রভাব পড়েছে তা সমর্থন ও বিরোধিতার সুরে শুধু ইউরোপকেই প্রভাবিত করছে না, এশিয়া তথা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সর্বত্র এক বিরাট উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। সমাজতন্ত্রের বাস্তবায়ন ক্ষেত্র সোভিয়েত রাশিয়া, অন্যদেরও এই পদ্ধতির সাথে সংযুক্ত করার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে বর্তমানে প্রায় নিশ্চিহ্ন। যত দ্রুত তারা মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল মানুষ ততদ্রুতই সমাজতন্ত্র নামক বন্দীশালার পিঞ্জর ভেঙ্গে বেড়িয়ে পড়ছে।

মুসলিম দেশগুলো ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের অধীনতা থেকে পুরোপুরি আজাদী অর্জনের পূর্বেই সম্প্রসারণশীল কমিউনিজমের সম্মূক্ষীন হওয়ায় ইসলামী রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিষয়টি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাড়িয়েছে। এহেন প্রেক্ষাপটে, আজ প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হয়ে পড়েছে ইসলামী রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করা; সেটা সম্ভব যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আল-কুরআনের মূল শিক্ষার সন্ধান লাভের মাধ্যমে।

ইসলামী অর্থনীতির উপর আমাদের দেশে আলোচনার সূচনা হয় ১৯৬০ এর দশকে। কিন্তু আধুনিক সময়ের বিশ্লেষণের পদ্ধতিতে রচনা শৈলীর সাথে সেসবের কোন মিল

Dhaka University Institutional Repository

ছিলনা। এদেশের সনামধন্য ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ ইসলামী অর্থনীতির উপর নানা ধরনের বই-পুস্তক রচনা, জার্নাল, সংকলন ও সেমিনার প্রসিডিংসে নানা দিক নিয়ে মূল্যবান আলোচনা ও বিশ্লেষণ এর মাধ্যমে তাকে এ স্তরে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এখনও চাহিদা মোতাবেক কোন পুণাংগ টেক্স্টবই পাওয়া যাচ্ছে না।

ইসলামী অর্থনীতির উপর গবেষণা মূলক পড়া-শুনার ইচ্ছা আমার অনেক দিন আগে থেকে, কিন্তু এত দিন সময়-সুযোগের অভাবে হয়ে উঠেনি। অবশেষে গত ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় ডঃ মুহাম্মদ আনসার উদ্দিন স্যারের সাথে আলোচনার পর আমার গবেষণার শিরোনাম "ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতসমূহ" স্থীর করে নেই।

আমার এ গবেষণাকর্ম যাতে সহায়ক গ্রন্থ নির্ভর না হয় সে বিষয়ে আমি সবসময়েই সচেতন ছিলাম। গবেষণা কর্মের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেমন ব্যাপক অনুসন্ধানে নিয়োজিত থেকেছি তেমনি প্রকাশিত তথ্য, দলিল, দুস্প্রাপ্য গ্রন্থ ও সাময়িকীর সাহায্যে এ বিষয়টিকে তথ্যনিষ্ঠ, যুক্তিগ্রাহ্য, সুস্পষ্ট, সাবলীল ও প্রঞ্জল করার চেষ্টা করেছি।

এ গবেষনা কর্মটিকে আমি পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যাস্ত করেছি ঃ

প্রথম অধ্যায় ঃ অর্থনীতির পরিচিতি, সংজ্ঞা, ইসলামী অর্থনীতির পরিচিতি, সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য অর্থ ব্যবস্থার তুলনা মূলক আলোচনা, ইসলামী অর্থনীতির জ্ঞানের উৎস, মূলনীতি, আল-কুরআনের আলোকে আয়ের উৎস্য ও ব্যয়ের খাতের মধ্যে সম্পর্ক, ইসলামে সরকারী অর্থ ব্যবস্থার নীতিমালা এবং আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রের কার্যক্রম ইত্যাদি।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ প্রাক-ইসলামী যুগের অর্থ ব্যবস্থা ঃ তথা-মক্কা, মদিনা ও তায়েফের অর্থনৈতিক অবস্থা, ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাষ্ট্রীয় আয়, অর্থনীতিতে হযরত ওমর (রাঃ) এর অবদান ঃ তথা-রাজস্ব আয়ের উৎস্য, ভূমি রাজস্ব ও সংস্কার, ইসলামী মুদ্রার প্রবর্তন, জনহীতকর কার্যাবলীতে অর্থ ব্যয়, শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় এবং বায়তুলমাল।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায় ঃ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয়, কর প্রসঙ্গ, ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস্যসমূহ, ভূমি রাজস্ব, উশর, বাংলাদেশে সম্ভাব উশরের পরিমাণ, খারাজ, জিযিয়া, যাকাত, যাকাতের নিসাব, যে সকল সম্পদে যাকাত হয় না, যাদের জন্য যাকাত নয়, যাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলী, বর্তমান বিশ্বে মুসলিম দেশ সমূহের যাকাত, বাংলাদেশের আদায়যোগ্য যাকাতের পরিমাণ, সাদাকাহ, কেরাউল আরদ (রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পত্তির ভাড়া), ফাই, খুমুস, ওয়াক্বফ, আমওয়ালী ফাযেলাহ (মালিকানা বিহীন সম্পদ), আশুর (বানিজ্যিক শুল্ক), বনজ সম্পদ থেকে আয়, নদী-সামুদ্রিক সম্পদের আয়, দারাইব (জরুরী পরিস্থিতিতে কর নির্ধারণ।

চতুর্থ অধ্যায় ঃ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের খাত, ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যয়ের নীতিমালা, ইসলামী রাষ্ট্রে সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের খাত সমূহ, কুরআনে নির্দিষ্ট ব্যয়ের খাত সমূহ, যাকাত ব্যয়ের খাত, দ্বিতীয় শাখা, যাকাতের অর্থ বন্টনের নীতিমালা, যাকাতের অর্থ যাদের জন্য নির্ধারিত, যাকাতের আর্থ সামাজিক প্রভাব, যাকাতের অর্থ দিয়ে বাস্তবায়নযোগ্য কর্ম-পরিকল্পনা, ত্রাণ ও কল্যাণ ধর্মী কর্মসূচী, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ মূলক কর্মসূচী, সমস্যা এবং সমাধান, তৃতীয় শাখার ব্যয়ের খাত, চতুর্থ শাখার ব্যয়ের খাত, পঞ্চম শাখার ব্যয়ের খাত, কুরআনে অবর্নিত ব্যয়ের খাত সমূহ।

পঞ্চম অধ্যায় ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগের ব্যয়ের খাত, আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারী ব্যয়ের খাত, বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যয়ের খাত, জনগণ কর্তৃক ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য ব্যয়ের খাত, বাংলাদেশে আয় ও অর্থ বন্টনে অন্তরায় ও সমাধান, উপসংহার, সহায়ক গ্রন্থাবলী।

আমি আশা করি, আমার এ গবেষণাকর্ম ইসলামী অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইসলামী জগতে সহায়ক হবে ইন্‌শাল্লাহ্‌। যুগে যুগে যাঁরা ইসলামী অর্থব্যবস্থায় অবদান রেখে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য উপহার দিয়ে গেছেন তাঁদের সর্বোচ্চ মর্যাদা ও আত্মার মাগফিরাত কামনা করে মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থণা জানাই। আমীন ॥

Dhaka University Institutional Repository

- ঃ সূচীপত্র ঃ-

প্রথম অধ্যায়ঃ

পৃষ্ঠা নম্বর

০১। অর্থনীতির পরিচিতি ও সংজ্ঞা ---------- ৮
০২। ইসলামী অর্থনীতির পরিচিতি ও সংজ্ঞা ---------- ১১
০৩। ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সমূহ ---------- ১৩
০৪। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ---------- ২০
০৫। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য অর্থ ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা -- ২৯
০৬। ইসলামী অর্থনীতির জ্ঞানের উৎস ---------- ৩৭
০৭। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতিসমূহ ---------- ৪২
০৮। আল-কুরআনের আলোকে সম্পদ আয় ও ব্যয়ের খাতের মধ্যে সম্পর্ক ---- ৫১
০৯। ইসলামে সরকারী অর্থ ব্যবস্থার নীতিমালা ---------- ৫৩
১০। আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রের কার্যক্রম ---------- ৫৬

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

০১। প্রাক ইসলামী যুগের অর্থ ব্যবস্থা ঃ
ক) মক্কার অর্থনৈতিক অবস্থা ---------- ৫৮
খ) মদিনার অর্থনৈতিক অবস্থা ---------- ৬৩
গ) তায়েফের অর্থনৈতিক অবস্থা ---------- ৬৭
০২। ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাষ্ট্রীয় আয় ---------- ৬৯
০৩। অর্থনীতিতে হযরত ওমর (রাঃ)-এর অবদান ---------- ৭১
০৪। খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর ভূমি রাজস্ব ও সংস্কার ব্যবস্থা ---------- ৭৩
০৫। বায়তুলমাল ---------- ৭৬

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

০১। ইসলামী অর্থ ব্যস্থায় রাষ্ট্রীয় আয় ---------- ৮০
০২। কর প্রসঙ্গ ---------- ৮২
০৩। ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস সমূহ ---------- ৮৫
০৪। ভূমি রাজস্ব ---------- ৮৬
০৫। ওশর ---------- ৮৬
০৬। বাংলাদেশের সম্ভাব্য ওশরের পরিমাণ ---------- ৯১
০৭। খারাজ ---------- ৯২
০৮। জিযিয়া ---------- ৯৬
০৯। যাকাত ---------- ১০০
১০। পূর্ববর্তী নবী রাসূলদের জামানায় যাকাত ---------- ১০২
১১। যাকাতের নিসাব ---------- ১০৩
১২। যে সকল সম্পদের যাকাত হয়না ---------- ১০৭

Dhaka University Institutional Repository

১৩। যাদের জন্য যাকাত নয় ---------- ১০৮
১৪। যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী ---------- ১০৯
১৫। বর্তমান বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহে যাকাত ---------- ১১০
১৬। বাংলাদেশে আদায়যোগ্য যাকাতের পরিমাণ ---------- ১১২
১৭। সাদাকাহ্ ---------- ১১৫
১৮। কেরাউল আরদ্/রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পত্তির ভাড়া ---------- ১১৭
১৯। ফাই ---------- ১১৯
২০। খুমুস ---------- ১২০
২১। ওয়াক্বফ ---------- ১২২
২২। আমওয়ালে ফাযেলাহ্ ---------- ১২৩
২৩। আশুর ---------- ১২৪
২৪। বনজ সম্পদ থেকে আয় ---------- ১২৬
২৫। নদী সামদ্রিক সম্পদের আয় ---------- ১২৭
২৬। দারাইব (জরুরী পরিস্থিতিতে কর নির্ধারণ) ---------- ১২৮

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

০১। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের খাত ---------- ১৩০
০২। ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যয়ের নীতিমালা ---------- ১৩২
০৩। ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য ---------- ১৩৪
০৪। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের খাতসমূহ ---------- ১৩৭
০৫। কুরআনে নির্দিষ্ট ব্যয়ের খাতসমূহ ---------- ১৩৮
০৬। যাকাত ব্যয়ের খাত ঃ যাকাতের অর্থ বন্টনের নীতিমালা ---------- ১৪০
০৭। যাকাতের অর্থ যাদের জন্য নির্ধারিত ---------- ১৪১
০৮। যাকাতের আর্থ-সামাজিক প্রভাব ---------- ১৪৪
০৯। যাকাতের অর্থ দিয়ে বাস্তবায়নযোগ্য কর্ম-পরিকল্পনা ---------- ১৪৬
১০। ত্রান ও কল্যাণধর্মী কর্মসূচী ---------- ১৪৭
১১। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচী ---------- ১৫৬
১২। সমস্যা এবং সমাধাণ ---------- ১৬৩
১৩। কুরআনে অবর্ণিত ব্যয়ের খাতসূমহ ---------- ১৬৬

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

০১। ইসলামের প্রাথমিক যুগের ব্যয়ের খাত ---------- ১৭৬
০২। আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারী ব্যয়ের খাত ---------- ১৭৭
০৩। বর্তমান সময়ে প্রেক্ষীতে প্রয়োজনীয় ব্যয়ের খাত ---------- ১৮০
০৪। জনগণ কর্তৃক ন্যাস্ত দায়িত্বের জন্য ব্যয়ের খাত ---------- ১৮২
০৫। বাংলাদেশে আয় ও অর্থ বন্টনে অন্তরায় এবং সমাধাণ ---------- ১৮৩
উপসংহার ---------- ১৮৭
সহায়ক গ্রন্থাবলীর তালিকা ---------- ১৮৮
অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত বাংলা, ইংরেজী ও আরবী, সাংকেতিক নির্দেশণা ----- ১৯১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায় ঃ

অর্থনীতির পরিচিতি ও সংজ্ঞা ঃ

মানব শিশু পৃথিবীতে আগমনের সাথে সাথে প্রয়োজন হয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, নির্মল বায়ু, নিরাপদ পরিবেশ ইত্যাদির। কারণ শিশুর জীবন বাঁচানো এবং সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠার জন্য এসবের একান্ত প্রয়োজন। তাই মানুষ এই প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এজন্য উদ্যম আগ্রহ, উৎসাহ এবং অন্তর্নিহিত প্রয়োজন-বোধ ও কর্মানুপ্রেরণা প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে বর্তমান। মানুষের মনে নিত্য নতুন আশা-আকাঙ্খা সঞ্চারিত হয়। মানুষ প্রবুদ্ধ হয় ভবিষ্যতের রঙ্গিন স্বপ্নে। এই স্বপ্ন পূরণ ও বাস্তবায়নের জন্যে তাকে নব-উদ্যমে সচেষ্ট হতে হয়। এই চেষ্টা আবার নতুন প্রয়োজনের উদ্ভূত হয়। সেই প্রয়োজন পূরণের জন্য আবার তাকে নতুন প্রচেষ্টায় মনোনিবেশ করতে হয়। এভাবে এক দিকে প্রয়োজন পূরণ করার জন্য অর্থোৎপাদন এবং সেই সংগে নতুন প্রয়োজন উদ্ভব হওয়ার এক অন্তহীন আবর্তনের নিরবচ্ছিন্ন ধারা মানুষের জীবনকে সক্রিয় ও গতিশীল করে রাখে। মানুষের জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য এই অপরিহার্য প্রয়োজন এবং তাহা পূরণ করার উপায় পরিকল্পনা সম্মন্ধে আলোচনা করা হয় যে, সামাজিক বিজ্ঞানে তার নাম হল অর্থনীতি।

সুতরাং মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য যে চেষ্টা, শ্রম, শ্রমের ফলে উৎপাদন এবং এই উৎপাদনের আয় দ্বারা প্রয়োজন পূরণ এসব কিছুই হল অর্থনীতির প্রাথমিক পর্যায়ের কথা। বস্তুতঃ ক্ষুধা যদি শরীরে পীড়া দায়ক ও প্রাণ সংহারক না হত, দেহ যদি নিজে নিজেই শীতাতাপের আক্রমনসহ যাবতীয় আক্রমন প্রতিরোধ করতে পারত তা হলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভান্ডার হতে অর্থনীতির নাম চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যেত।

তা হয়নি, হবেও না। কারণ এই প্রয়োজন সমূহ যেহেতু স্বাভাবিক, অপরিহার্য ও শ্বাশ্বত, তাই অর্থনীতিও চিরন্তন সত্য। এ কারণেই মানুষের প্রচেষ্টা ও সাধনা যত প্রাচীন ঠিক অর্থনীতিও তত প্রাচীন। যদিও কালের অগ্রগতির ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের চিন্তার বিবর্তন ঘটেছে অনেক, কখনও অর্থনৈতিক সমস্যা প্রচন্ডরূপে দেখা দিয়েছে, আবার কখনও উহার প্রয়োজনীয়তা অনেক হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু উহার মূল বিষয়বস্তুতে স্বাভাবিক ও

Dhaka University Institutional Repository

বুনিয়াদী গুরুত্বে আদৌ কোন পরিবর্তন কখনই হয়নি। এ সম্পর্কে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ স্যার জেমস স্টুয়ার্ট বলেছেন ঃ

"অর্থনীতি এমন একটি শাস্ত্র যা এক ব্যক্তি সমাজের একজন হওয়ার দিক দিয়ে কিরূপ দূরদৃষ্টি ও মিতব্যয়িতার সাথে নিজ ঘরের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করতে পারে তা আমাদেরকে বলে দেয়। এজন্য ব্যক্তিগত অর্থনীতির যে গুরুত্ব রয়েছে ঘরের ছোট পরিবেষ্টনীতিতে, সমগ্র রাষ্ট্রে অনুরূপ গুরুত্ব রয়েছে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির।"

অর্থনীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন ঃ "এই শাস্ত্রের প্রধানতম উদ্দেশ্য হলো রাষ্ট্রের অধীনে বসবাসকারী সকল মানুষের জন্য উপার্জন উপায়ের সন্ধান করা।"

অর্থনীতি একটি সামাজিক বিজ্ঞান। কারণ মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য চেষ্টা, সাধনা এবং উহার বন্টন ব্যয়ের নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনাই হল অর্থনীতির উপজীব্য।

অর্থনীতিবিদ এল.এম. ফ্রলার বলেছেন ঃ কেবল মূল্য ও সামঞ্জস্যের সমন্বয়েই অর্থনীতি হয় না। উহার পরিধি অতিশয় বিশাল ও সুদূর প্রসারী। বস্তুতঃ মানব জীবনের অধ্যয়ন ও অনুশীলনেরই নাম অর্থনীতি এবং মানুষের কল্যাণ সাধন ব্যতীত উহার অন্য কোন উদ্দেশ্যই হতে পারে না।

এ কথারই প্রতিধ্বনি করে-অর্থনীতিবিদ R.T. Ely বলেছেন ঃ "Economics is a Science, but something more then a science, a science that thought with the infinite variety of human life. Calling not only for systematic, imagination and in an unusual degree for the saving grace of commonsense.''

"অর্থনীতি বিজ্ঞান হলেও বিজ্ঞান অপেক্ষা অনেক বেশী। ইহা এমন বিজ্ঞান, যা মানব জীবনের অসীম বৈচিত্রময় দিক ও বিভাগ সমূহের আলোচনা করে। ইহা কেবল সুসংবদ্ধ ও

Dhaka University Institutional Repository

সুশৃঙ্খলিত চিন্তার আবেদনই জানায় না, মানুষের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করতে এবং বাস্তব জ্ঞান অসাধরণ পরিমান সম্প্রসারণ করতেও উহা সচেষ্ট।"

অর্থনীতিবীদ মার্শাল অর্থনীতির সংজ্ঞায় বলেছেন ঃ "Economics is a science which studies man in the ordinary business of life.''
"অর্থনীতি মানুষের জীবনের সাধারণ কার্যাবলীর পর্যালোচনা মাত্র। তিনি আরো বলেছেন ঃ মানুষ কিভাবে আয় উপার্জন করে এবং কিভাবে উপার্জিত আয় ব্যয় করে অর্থনীতি তারই নির্দেশ দেয়।"

অধ্যাপক এল. রবিনস্ এর মতে ঃ Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scaree means which have alternative uses.

"অর্থনীতি এমন একটি বিজ্ঞান যা মানুষের সে সকল আচরণকে অধ্যয়ন অনুশীলন করে, যে সকল আচরণ উদ্দেশ্য এবং নানা বিকল্প দিকে ব্যবহার যোগ্য উপায়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে।"

অর্থনীতির প্রকৃতরূপ সামাজিক। সামাজিক জীবনেই অর্থনীতির গুরুত্ব অপরিহার্য। অর্থনীতিবিদ কেয়ার্নকস (Cairncross) বলেছেন-Economics is a social science studying how people attempt to accommodate scarcity to their want and how these attempts interact through exchange.

বস্তুতঃ সমাজের সাধারণ মানুষের সর্ববিধ প্রয়োজন অনুসারে পণ্যের উৎপাদন, উৎপন্ন পণ্যের সুবিচারপূর্ণ বন্টন এবং উৎপাদনের উপায় ও সঠিক বন্টনের ন্যায়নীতি সম্পন্ন প্রনালী নির্ধারণ করাই হচ্ছে প্রধান কাজ। এজন্য হাও মেরী (How Mrey) দাবী করে বলেছেন ঃ "অর্থনীতিকে চরিত্রনীতি হতে কখনই বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারেনা বলেই এই বিজ্ঞান কোন দিনই উদ্দেশ্যের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। কারণ মানুষ মানুষ হিসেবেই উদ্দেশ্য ও উপায়-পন্থার যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।"

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থনীতির পরিচিতি ও সংজ্ঞা ঃ

ইসলাম সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষের জন্য স্থায়ী শান্তি, কল্যান কর জীবন ব্যবস্থা এবং বিশ্ব মানবতাকে প্রকৃত মানুষ্যত্বে উন্নীত করতে যে অর্থব্যবস্থা উপহার দিয়েছে তাকে বলা হয় ইসলামী অর্থনীতি। এই অর্থনীতিই পারে মানুষের সকল প্রকার আর্থিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দিতে। ইসলাম যেহেতু একটি পুর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী অর্থনীতি হল এই জীবন ব্যবস্থারই একটি অংশ। ইসলামী জীবনবোধ থেকেই ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উৎপত্তি।

বিশ্বের খ্যাতনামা মনীষী ও ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্ন ভাবে ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন ঃ

- ইসলামী অর্থনীতির ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃত ডাঃ এম,এ মান্নান ১৯৭০ সালে প্রকাশিত তাঁর পথ সৃষ্টিকারী বই Islamic Economics Theory and Practice-এ একটি সরল কিন্তু কার্যকর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন ঃ Islamic Economics is a social science which studies economic problems of the people in the light of Islam. অর্থাৎ "ইসলামী অর্থনীতি হল-একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে থাকে।" পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত তাঁর অপর বই The Making of Islamic Economic Society-তে তিনি এই সংজ্ঞা সংশোধন করেছেন। তিনি সামাজিক বিজ্ঞানের সাথে "পূর্ণাঙ্গ" শব্দ যোগ করেছেন যার অর্থ এটা শুধু অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধকেও অন্তর্ভূক্ত করেন এবং মানুষ বলতে শুধু মুসলমান নয় অমুসলমানদেরও বুঝিয়েছেন।
- ইসলামী অর্থনীতি বিনির্মানে অসামান্য অবদানের জন্যে প্রথম ইসলামী অর্থনীতিবিদ হিসেবে ১৯৮৮ সালে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক পুরস্কার অর্জনকারী অধ্যাপক খুরশীদ আহমদ ইসলামী অর্থনীতির সংজ্ঞা প্রদান করেছেন এভাবে ঃ ইসলামী অর্থনীতি হল

ইসলামী দৃষ্টিকোন হতে অর্থনৈতিক সমস্যা ও ঐ সব সমস্যার ইসলামী প্রেক্ষিতে মানবীয় আচরনকে বোঝার এক পদ্ধতিগত প্রয়াস[১]।

- জগতদ্বিখ্যাত মনীষী ইবনে খালদুন বলেন, "ইসলামী অর্থনীতি মহান আল্লাহ প্রদত্ত, ইসলামী আরোপিত, আদর্শিক, নৈতিক বিধি নিষেধ রক্ষা করে উৎপাদন, উপার্জন, ব্যয় ও বন্টনের যাবতীয় তৎপরতা পরিচালনার জ্ঞান ও সময়োপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা।"
- বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতিবিদ ডাঃ মনজের কাফ এর মতে, "ইসলামী অর্থনীতি বলতে ঐ অর্থনীতিকে বুঝায় যেখানে ইসলামী আইন ও প্রতিষ্ঠান সমূহ অস্তিত্বশীল থাকে এবং যেখানে অধিকাংশ মানুষ ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসি এবং বিশ্বাস অনুযায়ী আমল করে।"
- অর্থনীতিবিদ ডাঃ সাবাহ ইলদিন জাইমের মতে, "ইসলামী অর্থনীতি বলতে ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যা ও তার আচরণের সুসংবদ্ধ বিশ্লেষণ ও অধ্যয়নকে বুঝায়।"
- প্রখ্যাত অর্থনীতিবীদ ডঃ এস.এম. হাসানউজ্জামানের মতে, "ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে বস্তুগত সম্পদ আহরণ ও তা ব্যয়ের প্রক্রিয়ায় অবিচার-জুলুম রোধে আরোপিত ইসলামী শরীয়তের বিধি নিষেধ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং বাস্তব ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ যাতে করে মানুষ আল্লাহ এবং সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারে।"
- খ্যাতনামা অর্থনীতিবীদ এম. আকরাম খানের মতে, "সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের ভিত্তিতে জাতিগত সম্পদ সংগঠনের মাধ্যমে যে মানবীয় কল্যাণ অর্জন করা যায়, সে সম্পর্কিত জ্ঞানই হচ্ছে ইসলামী অর্থনীতি।"

এভাবে ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে আরো অনেক বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ বিভিন্নভাবে সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেহেতু ইসলামী অর্থনীতি শুধুমাত্র একটি ধর্ম নয়, বরং একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ এই জীবন বিধানেরই অংশ।

১। Khurshid Ahamed, Islamic Economic 1992-P-99.

Dhaka University Institutional Repository

এ আলোকে এভাবে সংজ্ঞা দেয়া যায় যে, "ইসলামী বিধানের সেই অংশ যা প্রক্রিয়া হিসেবে দ্রব্য ও সেবা সামগ্রী উৎপাদন, বন্টন ও ভোগের প্রসঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক আচরণকে সমন্বিত ভাবে অধ্যয়ন করে।

ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত পুজিঁবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা সহ সকল মানব রচিত অর্থব্যবস্থা থেকে ইসলামী অর্থব্যবস্থা আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। ইসলামী অর্থনীতির কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্যান্য অর্থব্যবস্থা থেকে উন্নত এবং মানব কল্যাণময়, যেমন ঃ

১) ইমলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত ঃ ইসলামী অর্থনীতি এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা ইসলমী শরীয়তের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে। যেহেতু ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূল ভিত্তি হল কুরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াস। তাই এই মূল ভিত্তির আলোকেই অর্থনীতির যাবতীয় কার্যাবলি পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

২) সম্পদের মালিকানা ঃ ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পদের ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকৃত। তবে এ মালিকানা চূড়ান্ত নয়। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাবতীয় সম্পদের চূড়ান্ত মালিকানা মহান আল্লাহ তা'আলা। মানুষ একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সম্পদের আয় উপার্জন ও ভোগ-ব্যবহারের অধিকারী মাত্র। প্রকৃত মালিকের প্রতিনিধি হিসেবে মানুষ তা ভোগ ব্যবহার করে। এই মর্মে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ " আকাশ ও পৃথিবীর মালিকানা আল্লাহর হাতে"।

আল্লাহতায়ালা আরো বলেন-"আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে তার মালিকতো আল্লাহই"।

৩) উপার্জন পদ্ধতি ঃ ইসলামী অর্থব্যবস্থায় যে কোন উপায়ে বৈধ-অবৈধ চিন্তা না করে এবং অন্য মানুষের কল্যাণ অকল্যাণ না ভেবে ঢালাউ ভাবে ধন সম্পদ উপার্জন করতে নিষেধ করেছে। যেমন ঃ আল্লাহপাক তার পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন-"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন কর না।"[১] (সূরা নিছা, আয়াত নং-২৯)

১। সূরা আন্-নিছা, আয়াত নং-২৯।

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (সাঃ) বলেছেন-"যে ব্যক্তি অন্যায় ভাবে কারো একবিঘত জমি দখল করেছে, কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক জমিন লটকিয়ে দেয়া হবে।"

৪) ভোক্তার নিয়ন্ত্রিত সার্বভৌমত্ব ঃ ইসলামী অর্থনীতিতে ভোক্তার সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত, তবে তা অনিয়ন্ত্রিত নয়। ইসলামে অনেক পণ্য ও আয়কে হারাম করা হয়েছে। তাই কোন ভোক্তাই হারাম পণ্য ভোগ করতে পারে না। তাছাড়া ইসলামে অপচয় ও অপব্যয়ের সমর্থন করে না। তাই সামাজিক কল্যাণের স্বার্থে ইসলামী অর্থনীতিতে ভোক্তার সার্বভৌমত্ব আংশিক নিয়ন্ত্রিক।

৫) উদ্যোক্তার সার্বভৌমত্ব ঃ এ অর্থ ব্যবস্থায় উদ্যোক্তার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়। তবে তা রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য অকল্যাণ বয়ে আনে এমন কোন পণ্য উৎপাদনে উদ্যোক্তাকে নিবৃত্ব করা হয়।

৬) বন্টন পদ্ধতি ঃ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সম্পদ কোন এক ব্যক্তির হাতে যাতে পুঞ্জীভূত না হয় সে জন্য সুষম বন্টন নীতি অবলম্বন করা হয়েছে।

এই মর্মে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-"সম্পদ যাতে কেবল মাত্র তোমাদের ধনীদের হাতে পুঞ্জীভূত না হয়ে থাকে"।[১]

৭) শ্রমের মর্যাদা ঃ ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রমের বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে, এবং শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন-"শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তার পারিশ্রমিক পরিশোধ কর।"

অন্য এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন-"সেরা উপার্জন হচ্ছে কর্মীর হাতে (শ্রমের) উপার্জন যখন সে আন্তরিকতার সাথে কাজ করে।"

১। সূরা হাশর, আয়াত নং-৭

৮) সুদ প্রথা উচ্ছেদ ঃ সুদ মানবতার জন্য অভিশাপ। এ জন্য ইসলাম সুদ কে হারাম করেছে এবং ব্যবসাকে করছে হালাল।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-"আল্লাহ ব্যবসা কে হালাল এবং সুদ কে হারাম করেছেন"।(১)

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে-"হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ গ্রহণ কর না।"(২)

পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে আরো বলা হয়েছে-"আল্লাহ সুদকে নির্মূল ও দানকে বৃদ্ধি করেন"।(৩)

আয়াতে রেবা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে রেবা বলতে কোন পরিশ্রম না করে অর্থ শোষণ করা এবং মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে বা ক্রয় বিক্রয়ের সময় ফাঁকি দিয়ে অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করাকে বুঝায়। মানুষের অভাবে ও অসহায়তার সুযোগ নিয়ে শোষণ করাকে ইসলাম কোন ক্রমেই সমর্থন করে না। একারণেই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় ব্যবসাকে হালাল করা হয়েছে। অপর দিকে সুদ সুস্পষ্ট ভাবে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

৯) নৈতিকতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঃ ইসলামী অর্থনীতির সাথে নৈতিক মূল্যবোধ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে কোন উৎপাদন ও ভোগ সমর্থন করা হয় না। এ জন্য ইসলামী অর্থনীতিতে মদ, জুয়া, ঘুষ, মজুতদারী, চোরা কারবারী, কালোবাজারী প্রভৃতি সমাজ বিরোধী ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ এ ধরনের নৈতিকতা বিরোধী অর্থ উপার্জন সমাজ ও দেশের জন্য কল্যাণ এর পরিবর্তে অকল্যাণই বয়ে আনে।

১। সূরা বাকারা, আয়াত নং-২৭৫

২। সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং-১৩০

৩। সূরা বাকারা, আয়াত নং-২৭৬

Dhaka University Institutional Repository

১০) সঞ্চয়ে নিষেধাজ্ঞা ঃ মূল্য বৃদ্ধি বা অধিক মুনাফা লাভের আশায় সম্পদ জমা করে রাখা এবং যাকাত আদায় না করে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলাকে ইসলাম কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-"যারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করবে ও তার যাকাত দেবে না, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তির দু'সংবাদ"।(১)

১১) সম্পদহীনদের অংশ পরিশোধ ঃ মহান আল্লাহ তা'আলা সকল জীবের মত মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা করেন। অথচ দান করা হয়েছে অল্প সংখ্যক ব্যক্তিকে। এতে অনুমান করা যায় যে, সম্পদ যার হাতেই থাকুক না কেন তাতে সকলেরই অধিকার রয়েছে।

এই মর্মে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন-"তোমাদের ধন সম্পদের মধ্যে গরীব, বঞ্চিত প্রার্থীদেরও অধিকার আছে।"(২)

আল্লাহপাক আরো বলেন-"তাদের প্রাপ্য অংশ শস্য কর্তনের দিনই দিয়ে দাও।"(৩)

১২) যাকাত ব্যবস্থা চালু ঃ সুদ যেমন পুজিঁবাদের মূল ভিত্তি, রাষ্ট্রীয় করণ যেমন সমাজতন্ত্রের মূলনীতি, তেমনি যাকাত ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। যাকাত হচ্ছে-মানুষের বৈধভাবে অর্জিত সম্পদ নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকলে নির্দিষ্ট হারে যাকাত দানকে ইসলাম ফরয করে দিয়েছে। এই যাকাত নগদ অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্য, ব্যবসায় পণ্য, কৃষি ফসল, গবাদী পশু প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। সুতরাং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যাকাতের ভূমিকা সীমাহীন। পবিত্র কালামে আল্লাহ পাক বহুস্থানে যাকাত প্রদান সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন। যেমন বলা হয়েছে-"তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত প্রদান কর।(৪)

যাকাত হচ্ছে ইসলামী সমাজের বিত্তশালী অংশের দায়িত্ব এবং গরীব মানুষের অধিকার।যাকাতের মাধ্যমে ধনী দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস পায় এবং সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকে।

১। সূরা তাওবা, আয়াত নং-৩৪

২। সূরা যরিয়াত, আয়াত নং-১৯

৩। সূরা ঃ আনআম, আয়াত নং-১৪

৪। সূরা মুজাম্মিল,আয়াত-নং-২০

১৩) সমাজ ব্যবস্থার সাথে জড়িত ঃ ইসলামী অর্থব্যবস্থা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন অর্থব্যবস্থা নয়, বরং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা এবং ইসলামী মূল্যবোধের সাথে এই অর্থ ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত।

১৪। সহযোগিতা মূলক ঃ পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগীতামূলক ভাবে কাজ করে। এ অর্থ ব্যবস্থায় প্রচুর অর্থ উপার্জন হলেও এর আচারণ নিষ্ঠুর ও নির্মম। আর ইসলামী অর্থব্যবস্থা মানুষের কল্যাণের জন্য সহযোগিতা মূলক ভাবে কাজ করে।

১৫) দান-সাদাকাহ চালু ঃ যদিও ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাত প্রদানের ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে, তথাপিও সম্পদ থেকে ঐচ্ছিক দান হিসেবে দুর্গত মানবতার জন্য দান-সাদাকাহ প্রদানের জন্য অতিরিক্ত কিছু নিয়মও চালু করা হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এই মর্মে ঘোষণা করেছেন-"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের উপর সাদকাহ নির্ধারিত করেছেন, যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে আদায় করে দরিদ্রের মধ্যে বন্টন করা হবে" (বুখারী-মুসলিম)

১৬) মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা ঃ ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। এব্যবস্থায় অর্থ উপার্জন ও ব্যয়ের নীতি এমন ভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে যাতে সমাজের কোন পর্যায়ের মানুষেরই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদনের মতো কাজে ভাবতে না হয়।

১৭) আর্থিক দুর্নীতি উচ্ছেদ ঃ ইসলামী অর্থব্যবস্থা এমন একটি অর্থ ব্যবস্থা বা অর্থ সংশ্লিষ্ট সব দুর্নীতি ও অনাচার হারাম করা হয়েছে। পৃথিবীতে শাস্তির বিধান দিয়ে এবং পরকালে চিরস্থায়ী শাস্তির ভয় দেখিয়ে এ ব্যবস্থায় সব অর্থনৈতিক অপরাধ নির্মূলের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে রাসূলে পাক (সঃ) এরশাদ করেন-"দাম বাড়ার আশায় যে লোক খাদ্য সামগ্রী চল্লিশ দিন ধরে মজুদ রাখে, তার সাথে আল্লাহর এবং আল্লার সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন-"ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা জাহান্নামে থাকবে।"

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র কালামে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-"পুরুষ চোর বা নারী চোর তাদের উভয়ের দুহাত কেটে দাও। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত দন্ড।[১]

১৮) জুয়া-লটারী নিষিদ্ধ ঃ জুয়া ও লটারীর মাধ্যমে সম্পদ বাড়ানো মানবতার জন্য একটি অভিশাপ। তাই মানব সমাজকে এ অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য ইসলামী শরীয়াত জুয়া-লটারীর মতো জঘন্যতম উপায়ে অর্থ উপার্জণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এ পর্যায়ে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে-"মদ, জুয়া, মুর্তি পুঁজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণয়ক তীর প্রভৃতি শয়তানী কাজের চরম মলিনতা। অতএব তোমরা এগুলো পরিহার করবে"।[২]

১৯) অপব্যয় ও অপচয় নিষিদ্ধ ঃ অর্থ সম্পদের যাবতীয় অপব্যয় ও অপচয় নিষিদ্ধ এটা ইসলামী অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেছেন- "তোমরা খাও ও পান করো, কিন্তু অপচয় করনা। নিশ্চয়ই আল্লাহপাক অপচয়কারীকে ভালবাসেন না।"[৩]

সূরা বনী ইসরাঈলে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন-"নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই।"[৪]

২০) বায়তুল মাল গঠন ঃ ইসলামী অর্থব্যবস্থার আর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল "বায়তুল মাল" গঠন যা সরকারের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। রাষ্ট্রীয় সব ধরণের অর্থ সম্পদ এই বায়তুল মালে জমা হয়। মানুষ ধর্মীয় দায়িত্বানুভূতি নিয়ে যাকাতসহ সব অনিবার্য ও ঐচ্ছিক দান বায়তুল মালে জমা রাখবে। দেশের দরিদ্র, অসহায় ও নিরুপায় ব্যক্তির সাহায্যসহ রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে অর্থ যোগান দেয়াই বায়তুল মালের উদ্দেশ্যে।

১। সূরা মায়েদা, আয়াত নং-৩৮

২। সূরা মায়িদা, আয়াত নং-৯০

৩। সূরা আরাফ, আয়াত নং-৩১

৪। সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত নং-২৬

Dhaka University Institutional Repository

২১) পরকাল ভিত্তিক ঃ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা পরকাল ভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থা। মানুষের ইহকালীন সুখ শান্তি নিশ্চিত করার পাশা-পাশি আখিরাতের সুখ-শান্তিও নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। পরকালিণ জীবনের জন্য কোন সমস্যা হতে পারে বা আখিরতে আল্লাহর শাস্তির কারণ হতে পারে, এমন সব বিষয়ের অর্জন ও ভোগ ব্যবহার নিষিদ্ধ করাই হলো এই অর্থ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতিয়মান হয় যে, একমাত্র ইসলামী অর্থ ব্যবস্থাই বিশ্বের সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে সক্ষম। এই ব্যবস্থায় সমাজ থেকে শোষণ ও লুণ্ঠনের সকল পথ বন্ধ করে, সকল প্রকার অন্যায় লোভ-লালসা চরিতার্থের প্রাসাদকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ঃ

ইসলামী অর্থনীতিই বিশ্ব মানবতাকে প্রকৃত মানুষ্যত্বের উন্নত মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে পারে এবং মানুষের সকল প্রকার আর্থিক সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান ও স্থায়ী কল্যাণ সাধন করতে পারে। মূলতঃ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা মানব জাতির জীবন দর্শনেরই একটি অপরিহার্য অংশ মাত্র। এ কারণেই ইসলামী জীবন দর্শনে ধর্ম, সৃষ্টি, সভ্যতা এবং অর্থনীতি একই সূত্রে গাঁথা।

পুজিঁবাদি ও সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি, তৃতীয় বিশ্বের দেশ সমূহের অর্থ সামাজিক সমস্যার মোকাবেলায় এর ব্যর্থতার কারণে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার চর্চা। ইহা অধ্যায়ন ও উন্নয়ন অগেকার যে কোন সময়ের চেয়ে খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। তা শুধু এই অর্থ ব্যবস্থার নিজের জন্যই প্রয়োজন নয়, বরং সনাতন অর্থনীতির হাড়ানো সূত্রের সেতুবন্ধন তৈরীর জন্যও চর্চা করা প্রয়োজন। নিম্নের আলোচনা থেকে এই প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১) আল্লাহর বিধান অনুসরণ ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষের আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পবিত্র কুরআনে অসংখ্য বার বিভিন্ন ভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন-"তোমরা খাও এবং পান কর কিন্তু অপচয় করনা।"

"সম্পদ যেন কেবল তোমাদের ধনীদের হাতে পুঁঞ্জিভূত না হয়ে থাকে"।[১]

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় আল্লাহর এসব নির্দেশনা বাস্তবায়ন অনিবার্য।

২) রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর আদর্শের অনুসরণ ঃ রাসূলে করিম (সঃ) তাঁর জীবদ্দশায় আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলি ও নির্দেশনার বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন-"ঘাম শুকানোর আগে শ্রমিকের পাওনা মিটিয়ে দাও"।[২]

১। সূরা হাশর, আয়াত নং-৭
২। সুনানে নাসাই

Dhaka University Institutional Repository

"দাম বাড়ার আশায় যে লোক খাদ্র সামগ্রী চল্লিশ দিনের বেশী মজুদ রাখে, তার সাথে আল্লাহর এবং আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

"ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা জাহান্নামে থাকবে।"

সুতরাং আমরা রাসূল (সঃ) এর অনুসারী সে হিসেবে আমাদের কর্তব্য হল রাসূল (সঃ) এর আদর্শ বাস্তবায়ন করা।

৩) হালাল উপার্জনের প্রেরণা এবং হারাম উপার্জন বিরোধী প্রেরণা ঃ ইসলামী অর্থব্যবস্থা ব্যবহারিক জীবনে সব আর্থিক লেনদেন হালাল বা বৈধ পদ্ধতি অবলম্বনের নির্দেশ দেয়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন-" কেবল ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন মানুষকে হালাল উপার্জনের উপর কায়েম রাখতে পারে। মানুষের জীবন ও মানসিকতা হালাল জীবিকার উপযোগী করে তুলতে পারে। কাজেই এ অর্থ ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সাথে সাথে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা হারাম উপার্জনের সব পথ বন্ধ করে দেয়। এ ব্যবস্থায় মানুষের মনে হারাম উপার্জনবিরোধি চেতনা বিকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। নবী করিম (সঃ) বলেছেন-"হারাম ও অপবিত্র খাদ্য পুরিপুষ্ট দেহ দোযখের আগুনই তার শ্রেষ্ঠ আবাস।[১]

৪) ইবাদত কবুলের মাধ্যমে ঃ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা মানুষকে হারাম জীবিকা গ্রহণ থেকে রক্ষা করে, কেবল মাত্র হালাল জীবিকাই মানুষের জীবনে অনাবিল সুখ-শান্তি বয়ে আনতে সক্ষম। মানুষের ইবাদত বন্দেগী এ অর্থ ব্যবস্থার অনুসরণের মাধ্যমে কবুল যোগ্য হয়ে ওঠে। কারণ এর ফলে মানুষ হারাম গ্রহণের অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন-"মানুষ দূর দূরান্ত সফর করে (কা'বায় আসে) এবং এলোমেলো চুলে, ধুলাধুসারিত অবস্থায় আকাশের দিকে দু'হাত তুলে বারবার বলতে থাকে, হে আমার রব! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোষাক হারাম এমনকি হারাম ভাবেই সে লালিত পালিত হয়েছে। এমন ব্যক্তির দোয়া কি আল্লার দরবারে কবুল হতে পারে।"[২]

১। বায়হাকি

২। সহীহ মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় মানুষের ইবাদতকে কবুল যোগ্য করে তোলে। সুতরাং এর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

৫) ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের পরিবেশ সৃষ্টি ঃ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, সমাজের মানুষের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বভাব গড়ে তোলা। সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পূর্বশর্ত হচ্ছে সামাজিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সমাজের প্রত্যেক মানুষ অপরের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজন মনে করে সর্বদা অন্যের অভাব ও প্রয়োজন মোচনে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসে ফলে সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য সৃষ্টি হয় এবং অশান্তি দূরীভূত হয়ে যায়।

৬) ভারসাম্য পূর্ণ অর্থনৈতিক জীবন গঠন ঃ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যেমন বিপুল বিত্ত ও বিলাসিতায় অপচয়ী জীবন যাপনের সুযোগ নেই, তেমনি এ ব্যবস্থায় অযৌক্তিক কৃপনতা ও নিষেধ। বরং ইসলামী অর্থব্যবস্থায় ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক জীবন গড়ে দেয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর (মুমিন তারা) যখন ব্যয় করে তখন তারা অপচয় করে না এবং কার্পন্যও করে না। বরং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে।

৭) আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠায় ঃ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা অর্থনৈতিক সুবিচার ও সমাচার প্রতিষ্ঠার অবিসংবাদিত উপায়। মানুষের আর্থিক অধিকার নিশ্চিত করার এবং সম্ভব্য ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের সর্বাধিক মানবিক পদ্ধতির প্রবক্তা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা। সে জন্য এ ব্যবস্থার গুরুত্ব সীমাহীন।

৮) দৈনন্দিন জীবনে ঃ দৈনন্দিন জীবনে মানুষকে নানা ধরণের অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। কিন্তু মানুষের সম্পদ সীমিত। এই সীমিত সম্পদ দ্বারা মানুষ কিভাবে ঐ সকল সমস্যার সমাধান করবে তা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় নির্ধারণ করা হয়েছে। এ অর্থ ব্যবস্থায় বলা হয়েছে যে, তোমরা আয় বুঝে ব্যয় কর। অপচয় কিংবা কৃপনতা কর না।

Dhaka University Institutional Repository

৯) পারিবারিক ও সমাজ জীবনে ঃ মানুষ সামাজিক জীব। তাই পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং বন্ধু-বান্ধব নিয়ে একত্রে বসবাস করতে হয়। একত্রে বসবাস করার কারণে পরস্পরের মধ্যে আর্থিক লেনদেন করতে হয়। আবার কোন কোন সময় একজনের জন্য অন্য আরেক জনের খরচাদী হয়ে থাকে। মানুষ পরস্পরে সাথে কিভাবে লেনদেন করবে, সে ব্যাপারে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-মানুষ কাউকে কিছু কর্য দিলে, তার পরিবর্তে সুদ বা ঘুষ নিবেনা। বরং যত কর্য দিবে, ঋণ গ্রহীতার কাছ থেকে তত টাকাই গ্রহণ করবে। অতিরিক্ত কিছুই গ্রহণ করবে না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন-"(হে মুহাম্মদ) তুমি বল, তোমরা যে অর্থ ব্যয় করে থাক, তা তোমরা পিতা-মাতা, নিকট আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, অনাথ, নিঃস্ব এবং পথিকের জন্য ব্যয় করবে। আর তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা অবহিত আছেন।"[১]

১০) রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ঃ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন খাত থেকে যেমন ঃ যাকাত, উশর, খারাজ, সাদকাহ্, কর ইত্যাদি থেকে আয় করে সে অর্থ সমূহ কিভাবে ব্যয় করবে তা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় বলা হয়েছে।

১১) ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের কাছে ঃ দেশের উন্নতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ। শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে এবং ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। নিজস্ব অর্থায়নে এত অর্থ বিনিযোগ অধিকাংশ সময়ই সম্ভব পর নয়। ব্যাংক ও বিভিন্ন স্থান থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ঋনের অর্থ-সম্পদ বিনিয়োগ করবে এবং গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করবে। ইসলাম ভিত্তিক ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে একদিকে যেমন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ মজবুত হয় অপর দিকে ব্যবসায়ীগণও লাভবান হয়।

১। সূরা আল-বাকারা, আয়াত নং-২১৫

Dhaka University Institutional Repository

১২) পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন ঃ দেশের সীমিত সম্পদের সুষ্ঠ ভাবে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। সঠিক ভাবে পরিকল্পনা প্রনয়ণ করে সম্পদ বন্টন ও বিনিয়োগ করলে অর্থনৈতিক প্রগতি গতিশীল হয়। যার ফলে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের জনগণের কল্যাণ সাধিত হয়। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

১৩। দারিদ্র দূরীকরণে ঃ প্রতিটি মানুষের মৌলিক চাহিদা হল অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং শিক্ষা। মানুষ তার এই মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। কখনও সফল হয় আবার কখনও হয় ব্যর্থ। যখন ব্যর্থ হয় তখন মানুষ কু-রিপু ও কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনের জন্য ধাবিত হয়। ফলে সমাজে অপরাধ প্রবনতা বৃদ্ধি পায়। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় মানুষের মৌলিক চাহিদা গুলো পূরণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ অর্থ ব্যবস্থায় নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ-যাকাত, সাদাকাহ, দান-খয়রাত, অসিয়ত পূরণ ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র-অসহায় মানুষের কল্যাণে ব্যয় করার বিধান রয়েছে। সুতরাং ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা বাস্তবায়ন হলে সমাজ থেকে দারিদ্রের উচ্ছেদ হবে। সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

১৪) কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি ঃ বর্তমান সময়ে জাতির জন্য বড় ধরণের অভিশাপ হল বেকারত্ব জীবন যাপন। বেকারত্ব একদিকে যেমন দারিদ্র ডেকে আনে অন্য দিকে সমাজে অপরাধ প্রবণতার সৃষ্টি করে। সমাজে এমন অনেক লোক রয়েছে যারা কাজ বা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আগ্রহী। কিন্তু মূলধনের অভাবে কোন কিছুই করা সম্ভব হয় না। এমন যদি কোন ব্যবস্থা থাকে যে, কর্যে হাসানা হিসেবে সাহায্য প্রদান করে বেকারদের কর্মসংস্থানে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিবে, কিন্তু পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এসবের চিন্তাও করা যায় না। তবে হ্যাঁ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মাধ্যমেই বেকারদের স্বল্প পুঁজি প্রদান করে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা সম্ভব। তাছাড়া বিভিন্ন ফান্ডের টাকা (যেমন-যাকাত, সাদাকাহ ইত্যাদি) দিয়ে শিল্প কারখানা তৈরী করে বেকারদের বেকারত্ব দূর করা যায়। ফলে বেকারদের হাত পরিণত হয় কর্মীর হাতে, ভিক্ষুকের হাত পরিণত হয় দাতার হাতে, এবং সমাজে আর্থিক স্বচ্ছলতা, শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

১৫) অর্থের মোহ দূর ঃ অর্থের মোহ মানুষকে সমাজের নিম্ন থেকে নিম্নতর স্তরে পৌছে দেয়। এক পর্যায়ে মানুষকে ইতর থেকে ইতরতর পর্যায়ে নামিয়ে দেয়। মানুষ অর্থের মোহে আকৃষ্ট হয়ে অন্ধ হয়ে যায়। তখন ন্যায়-অন্যায়, বৈধ-অবৈধ চিন্তা না করে অর্থ উপার্জনের প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে। সমাজে বিরাজ করতে থাকে অশান্তি ও অরাজগতা। কিন্তু ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা মানুষকে অর্থের প্রতি এই মোহ ও লালসা কে দূরীভূত করে দিয়েছে। অর্থ মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য নয় বরং জীবন যাপনের একটি উপায় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এজন্য কেউ যেন অর্থের পাহাড় গড়তে না পারে। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সে ব্যবস্থা রয়েছে। ফলে ইসলামী সমাজে অর্থের মোহ থাকে না, এতে সমাজে-রাষ্ট্রে শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।

১৬) সামাজিক ও নৈতিক মূল্য বোধের সাথে অর্থনৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয় ঃ ইসলামী অর্থনীতিবিদদের এখন সবচেয়ে যে বড় গুরুদায়িত্ব তা হল সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধের সাথে অর্থনৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয়ে সকল মানুষের মধ্যে সম্পদের আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে সমতা ভিত্তিক বন্টন। এখানে যে বিষয়টি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সামাজিক ও নৈতিক প্রেক্ষিত অবশ্যই প্রতিফলিত হতে হবে। এটা কেবল সম্ভব ইসলামী অর্থনীতির চর্চা, অনুশীলন এবং অর্থনীতির নীতিমালা ও ইসলামী শরীয়তের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে।

১৭) পার্থিব ও আধ্যাত্মিক জীবনের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের উপায় ঃ পুজিঁবাদ-সমাজতন্ত্র ও ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রত্যেকেই মানব কল্যানের জন্য নিবেদিত বলে দাবী করে। কিন্তু এদের কর্মপদ্ধতি, উদ্দেশ্য আদর্শ এবং বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে রয়েছে অনেক-অনেক পার্থক্য। যেহেতু নৈতিকতার প্রতি এবং পরকালে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতা পুঁজিবাদী দর্শনের ভিত্তি নয় সেহেতু পুজিঁবাদী সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মানুষ নানা কৌশলে, সাধারণত অসৎ ও অবৈধ উপায়ে আয় উপার্জনের চেষ্টা করে।

অপরদিকে সমাজতন্ত্রে ব্যক্তি মালিকানা স্বীকৃত নয় সেহেতু সমাজতান্ত্রিক দেশ সমূহে সম্পদ আয় ও বন্টন রাষ্ট্রের খেয়াল খুশীর উপর নির্ভরশীল। এ মতাদর্শ শুধুমাত্র পার্থিব জীবন বা বস্তুবাদী জীবনের উন্নয়নেই সন্তুষ্ট।

Dhaka University Institutional Repository

১৮) দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে ঃ সনাতন অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে দেশের অসাধু ব্যবসায়ীরা প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী গুদামজাত করে দেশের প্রাকৃতিক দূর্যোগময় সময়ে অথবা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে বিপুল মুনাফা অর্জন করে। এতে জনগণ সীমাহীন দুঃখ কষ্টের মধ্যে পতিত হয়। তাছাড়া জনগণকে ধোঁকা দেয়ার জন্য খারাপ পণ্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আকর্ষণীয় করে তোলে, আবার কখনো লটারী বা উপঢৌকনের প্রলোভন দেখিয়ে বা নিজের পণ্যের গুনকীর্ত্তণ এবং অপরের পণ্যের দোষ-ক্রুটি তুলে ধরে ক্রেতাদের মন রঞ্জন করার চেষ্টা করে। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে এ ধরণের প্রতারণাকে নিষিদ্ধ করে সংকটের সময়ে জনসাধারণের দুঃখ দূর্দশা লাঘবের উদ্দেশ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী যাতে কেউ চল্লিশ দিনের বেশী মজুদ রাখতে না পারে সে ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং দূর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের পরিবেশ গঠনেও আপ্রাণ চেষ্টা করে।

১৯) সরকারকে গতিশীল রাখার পরিবেশ সৃষ্টি ঃ পুঁজিবাদী সমাজে দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র খুব কমই হস্তক্ষেপ করে থাকে। আবার সমাজতান্ত্রিক সমাজে সরকারই অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে মূখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এ ব্যবস্থায় জনগণের দায়িত্ব শুধু সরকারের হুকুম পালন করা। কিন্তু ইসলামী সমাজে সরকার প্রভুর ভূমিকায়ও অবতীর্ণ হয় না আবার জনগণের হাতেই সবকিছু ছেড়েদেয় না। এ ব্যবস্থায় সরকারের ভূমিকা গুরুত্ববহ ও সক্রিয়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক এজেন্ট সমূহকে তাদের কার্যক্রম সম্পাদনের স্বাধীনতা দিলেও সরকার লক্ষ্য রাখে যে ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি সমূহের কোন ব্যতিক্রম ঘটছে কিনা। সরকার সক্রিয় কথার অর্থ হলো সরকারকে ঐ সব দায়িত্ব পালন নয়, যেমন-বৈদেশিক আক্রমন হতে দেশ রক্ষা, আভ্যান্তরীন শান্তি-শৃংঙ্খলা বজায় রাখা দরিদ্র ও অসহায়দের প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। ইসলামী অর্থনীতির চর্চা এসব বিষয়ে আরো দূরদর্শিতা লাভের সুযোগ করে দেয়। সাথে সাথে সরকারকে গতিশীল রাখার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

২০) আদর্শিক দায়বদ্ধতা পূরণ ঃ বিশ্বের সকল মুসলমানগণই পবিত্র কুরআনের এবং রাসূলে করিম (সঃ) এর আদর্শ ও নৈতিক নির্দেশ সমূহ পালন করতে দায়বদ্ধ। এর মধ্যে এমনও অনেক নির্দেশ রয়েছে সে সবের রয়েছে বিশ্বজনিন আবেদন। যেমন-দরিদ্র ও অভাব

Dhaka University Institutional Repository

গ্রস্তদের সাহায্য করা। প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার করা। আবার এমন অনেক নির্দেশ রয়েছে যা ভিন্নতর, যেমন-শুকরের মাংস, মদ না খাওয়া বা ক্রয়-বিক্রয়ে নিষিদ্ধ, যাকাত, ওশর, সাদকাহ ইত্যাদি আদায় করা। এসব ক্ষেত্রে ইসলামী অর্থনীতিবিদদেরই এগিয়ে এসে ইসলামী নীতি নির্দেশনার প্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক আর্থ-সামাজিক অনুশাসন সমূহ চিহ্নিত করতে হবে এবং একই সঙ্গে ইসলামী অর্থনীতিকে একটা বিজ্ঞান ভিত্তিক শাস্ত্র হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সেসবের ব্যবহারও করতে হবে। এ থেকেই উপলব্ধি করা যায় যে, ইসলামী অর্থনীতির চর্চা ও বিকাশ এত বেশী গুরুত্ববহ।

২১) ইসলামী অনুশাসনে অনুপ্রাণীত রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে সহযোগিতা ঃ ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম প্রয়োজনীয়তা রয়েছে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা-"হে মানব জাতি! আমি পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছি এবং গোত্র ও জাতি সৃষ্টি করেছি যেন তোমরা পরস্পর পরস্পরকে জানতে পার"।[১] এই নির্দেশের ফলে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সহযোগিতার শেষ সীমানা কোন নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডের মধ্যে সীমিত থাকেনা। বরং বিশ্বের সকল দেশের সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যেই ছড়িয়ে পরে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানব জাতির কল্যাণের স্বার্থে একে অপরের মানবীয় ও ভৌত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করবে। এজন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত প্রতিষ্ঠান তৈরী এবং তার প্রসার।

২২) ইসলামের পরিপূর্ণতা প্রমান ঃ ইসলাম আল্লাহর মনোনীত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। মানুষের জীবনের প্রতিটি বিভাগ ও বিষয়ের বিস্তারিত নির্দেশনা ও প্রয়োজনীয় বিধান ইসলামে দেয়া হয়েছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ইসলাম যে প্রামান্য, বিস্তারিত এবং সর্বাধিক মানবিক বিধান দিয়েছে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা তারই সুস্পষ্ট প্রমাণ।

২৩) পরকালীন নাজাত ঃ পরকালে আল্লাহর ভয়াবহ শাস্তি থেকে নাজাত লাভের ক্ষেত্রেও ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১। সূরা আল-হুজরাত আয়াত নং-১৩।

Dhaka University Institutional Repository

এ অর্থ ব্যবস্থায় আল্লাহর নির্দেশের অমান্য হয় এমন সব কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হারাম করা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার দেয়া ঘোষণার মূলনীতির বিরোধী সব ধরনের কাজ। সর্বপরি আখিরাতের শাস্তির কারণ হতে পারে এমন সব অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতার কোন সুযোগ এ অর্থ ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। যার ফলে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা মানুষের পরকালীন নাযাতের মাধ্যমে পরিণত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত যেমন-ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তেমনি রয়েছে মানব জীবনকে সুন্দর, উজ্জীবিত ও প্রগতিশীল করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য অর্থ ব্যবস্থার তুলনা মূলক আলোচনা

একটি জাতির বা দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতি নির্ভর করে সম্পদ আয় ও বন্টনের উপর। দেশের জনগণের কর্মসংস্থান, উৎপাদন বৃদ্ধি, বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি এবং সেই সাথে কারো হাতে যেন সম্পদ পুঞ্জিভূত হতে না পারে তা নির্ভর করে রাষ্ট্রে বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর। যেহেতু নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা এবং পরকালে আল্লাহর নিকট জবাবদীহিতা পুজিঁবাদী অর্থ ব্যবস্থার ভিত্তি নয়, সেহেতু পুঁজিবাদী সমাজ ও অর্থ ব্যবস্থায় মানুষ নানা কৌশলে সাধারণত অসৎ ও অবৈধ উপায়ে আয় উপার্জন করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের উপার্জিত ধন-সম্পদের মালিক নিজেই। তার উপার্জিত সম্পদে অন্য কারো কোন অংশ থাকবে না। তার উপর অন্য কোন অধিকার ও স্বীকৃত হবে না। তার উপার্জিত সম্পদ সে যেভাবে ইচ্ছা ভোগ-ব্যবহার করতে পারবে। যে পরিমাণ ধন-সম্পদ ও উৎপাদন উপায় তার হাতে রয়েছে তা সে কুক্ষিগত করে রাখতে এবং নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যয় করতে অস্বীকার করতে পারবে। এ ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। বস্তুতঃ প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে স্বভাবতই যে স্বার্থপরতা রয়েছে এই পুজিঁবাদী অর্থ ব্যবস্থা তা হতেই উদ্ভব হয়েছে। ইহার পূর্ণ বিকশিত রূপ খুবই মারাত্মক ও ভয়াবহ, যা মানব সমাজের কল্যাণ ও উন্নতি বিধায়ক সমস্ত মানবীয় গুন-গরিমা উহার কাছে ম্লান হয়ে যায়। আর যদি নৈতিক দৃষ্টিতে না দেখে নিছক অর্থনৈতিক দৃষ্টিতে আলোচনা করলেও সুস্পষ্ট রূপে দেখা যাবে-এই মতবাদ কোথাও কার্যকরী হলে ধন বন্টনের তারতম্য অনিবার্য রূপে বিপর্যস্ত। ধন-সম্পদ ও উৎপাদনের উপাদান ক্রমশঃ সীমাবদ্ধ হয়ে একটি ভাগ্যবান কিংবা অধিকতর সতর্ক মানব গোষ্ঠির হস্তে কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে, যার ফলে সমাজ কার্য্যতঃ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। উহার একটি হলো ভাগ্যবানদের দল-বিপুল ধন-সম্পদের মালিক, আর অপরটি হল হতভাগ্য দরিদ্রের দল-যাদের দু'বেলা পেট ভরে খাদ্যও মেলেনা।

প্রথম শ্রেণীর লোকেরা যাবতীয় ধন-সম্পদ ও উপায় উপাদান কুক্ষিগত করে কেবল নিজেদের আরাম আয়েশ ও সুখ সম্ভোগের জন্য ব্যয় করে এবং উহার পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সমাজ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থকে জলাঞ্জলী দিতেও কুন্ঠিত হয় না। আর দরিদ্র

Dhaka University Institutional Repository

হত ভাগ্যের দল ধন-সম্পদের সকল প্রকার অংশ ও সুযোগ সুবিধা হতে চিরতরে বঞ্চিত হয়। ধনীদের অপরিসীম খেদমত করে জীবন-যাপনের সামগ্রী সংগ্রহ করা ভিন্ন তাদের গতান্তর থাকে না। এ ধরণের অর্থ ব্যবস্থা একদিকে সুদখোর, মহাজন, শোষক, কারখানা মালিক, যালেম জমিদার-জায়গিরদারদের সৃষ্টি করে। অপরদিকে মজুর কৃষকদের এক সর্বহারা বুভুক্ষুদের দলে পরিনত করে। এরূপ অর্থব্যবস্থা সমাজে কার্যকরী হতে পারে না যেখানে স্বভাবতই সহানুভূতি, সহৃদয়তা, মায়া-মমতা, পারস্পরিক সাহায্য প্রভৃতি মানবীয় ভাবধারা এক বিন্দুও পাওয়া যাবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই আত্মনির্ভর হয়ে জীবন যাপনে ব্যস্ত। কেউ কারো বন্ধু বা সাহায্যকারী হয় না। অভাবগ্রস্থ ও বুভুক্ষুদের জীবন সংকীর্ণতর হয়ে যায়। সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিই জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্য অন্যান্যদের মোকাবেলায় চরম স্বার্থপর ও প্রতিহিংসামূলক ভূমিকা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। প্রত্যেকেই যথাসম্ভব আর্থিক জীবিকা লাভের জন্য চেষ্টা করে। নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য তা কুক্ষিগত করবে এবং উহার পরিমাণ বৃদ্ধি করার কাজেই উহা ব্যয় করবে। আর যারা এই অর্থ সঞ্চয় অভিযানে ব্যর্থ হবে, কিংবা উহাতে পূর্ণ অংশ গ্রহণে সামর্থ হবে না, দুনিয়ার বুকে তাদের একবিন্দু আশ্রয় লইবার স্থানও মিলিবে না। এমনকি ভিক্ষা করতে চাইলে তাও সহজলভ্য হবেনা, কারো মনে তাদের প্রতি এক বিন্দু অনুকম্পাও সৃষ্টি হবে না। কোন হস্তও তাদের সাহায্যার্থে প্রসারিত হবে না। অতঃপর হয় তাদের আত্মহত্যা করে জীবন যন্ত্রনা হতে মুক্তিলাভ করতে হবে অথবা নানাবিধ অপরাধ ও মানবতা বিরোধী কার্যকলাপের পংকিল আবর্তে ঝাপিয়ে পড়ে ক্ষুধার জ্বালা নিবৃত্ত করতে বাধ্য হবে।

পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় অর্থ সঞ্চয় এবং উহাকে মুনাফাজনক কাজে ব্যয় করার দিকেই মানুষের স্বাভাবিক ঝোক প্রবনতা সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। এর ফলে সেখানে লিমিটেড কোম্পানী সমূহ গজিয়ে উঠে। ব্যাংক কায়েম করা হয়, প্রেসিডেন্ট ফান্ট চালু করা হয়, ইন্সুউরেন্স কোম্পানী কাজ করতে শুরু করে, সমবায় সমিতিসমূহ গঠিত হয়। আর অর্থোৎপাদনের এই সমস্ত উপায় ও পন্থার পিছনে একটি মাত্র ভাবধারা কাজ করে। তা হলো আরো অধিক অর্থোৎপাদন ও ঋণ সঞ্চয়। এখন এই অর্থ সঞ্চয়ের কাজ ব্যবসামূলক লেন-দেনের মারফতেও হতে পারে, সুদী কারবারের মাধ্যমেও হতে পারে। বস্তুতঃ পুঁজিবাদী দৃষ্টিভংগিতে সুদ ও ব্যবসা সংক্রান্ত লেনদেনের মধ্যে মূলগত পার্থক্য নেই। এই জন্য

Dhaka University Institutional Repository

পুঁজিবাদী সমাজে এ দু'টি জিনিস শুধু যে পরস্পর মিশ্রিত হয়ে থাকে তাই নয় বরং সকল প্রকার কাজে কর্মে ও ব্যবসা বাণিজ্যে উহা পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে দাড়ায়। সেখানে ব্যবসার জন্য সুদ ও সুদী লেনদেনের জন্য ব্যবসা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ইহার কোন একটিও অপরটি ব্যতিরেকে উৎকর্ষ লাভ করতে পারে না। বস্তুতঃ সুদী কারবারের সুযোগ না থাকলে গোটা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই ধুলিসাৎ হয়ে পরে।

প্রাচীন পুঁজিবাদী থেকে আধুনিক পুঁজিবাদী স্বতন্ত্র কিছু নয়। উদারনৈতিক পুঁজিবাদও নয়, এখনো এগুলোতে অনেক অসুবিধা ও বিপদ নিহিত রয়েছে।

পুঁজিবাদের মৌলিক ধারণা হচ্ছে "Laissez faire laissez passcr" অর্থাৎ যত খুশি এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বস্তুগত উৎপাদন যন্ত্রের অধিকারী হবার ও মালিক থাকার ব্যাপারে ব্যক্তি সম্পূর্ণ স্বাধীন। এভাবে এ নীতি অনুসারীদের মধ্যে সর্বদাই তীব্র প্রতিযোগিতা চলে। এই কঠোর প্রতিযোগিতা স্বভাবতই তাদের মধ্যে অধিকতর অর্থসম্পদের লোভ লালসা জাগ্রত করে এবং পরিনতিতে বিত্ত-সম্পদের প্রতি তাদের আর্কষনকে বহুগুনে বাড়িয়ে দেয়। রাসূলে করিম (সাঃ) বলেছেন, "যারা কোন কিছুকে ভালবাসে শেষ পর্যন্ত তারা তারই ভৃত্যে পরিনত হয়।" সুতরাং শেষ পর্যন্ত তারা আসলে আর সম্পদের মালিক থাকে না, সম্পদই তাদের মালিক হয়ে বসে। পুঁজিবাদী সমাজে প্রচলিত সম্পদের প্রতি মানবাত্মার এই দাসত্বকে প্রায় পনের শতাধিক বছর পূর্বে ইসলামী শিক্ষায় নিন্দা করা হয়েছে এবং এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে মানব সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাবলীর মূল কারণ প্রকৃত পক্ষে সম্পদের প্রতি এই দাস সূলভ মনোভাব।

Dhaka University Institutional Repository

কমিউনিজম বা সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা

পুজিঁবাদী অর্থ ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে অর্থ ব্যবস্থা সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছে তাই কমিউনিজম বা সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা। পুঁজিবাদী সমাজের মজলুম শোষিত মানুষকে বুঝ দেয়া হয়েছে যে, ব্যক্তিগত মালিকানাই সকল প্রকার বিপর্যয়ের মূল কারণ। এর উচ্ছেদেই সকল অশান্তি ও শোষণ নির্যাতনের চির অবসান ঘটবে। ধন-সম্পদের যাবতীয় উপায়-উপাদান সমাজের ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত মালিকানা দখল করা। নিজের ইচ্ছামত তা হস্তক্ষেপ করা এবং ব্যক্তিগতভাবে এর মুনাফা গ্রহণ করার কোন অধিকার নেই। এজন্যই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রথম পদক্ষেপেই ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে এবং উৎপাদনের সকল উপায় উপাদান ও যন্ত্রপাতি Means and Instruments of production জাতীয় মালিকানা বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ফলে কমিউনিষ্ট সমাজে জাতীয় অর্থোৎপাদনের উপায় উপাদানের উপর রাষ্ট্রপরিচালক মুষ্ঠিমেয় শাসক গোষ্ঠির নিরংকুশ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে। তারা কেন্দ্রিয় পর্যায়ে বিশেষ প্লান-প্রোগাম ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল উপায়-উপাদান ব্যবহার করে থাকে, তাদেরই নির্ধারিত নীতি অবনত মস্তকে মেনে নিতে একান্তভাবে বাধ্য হয় সে সমাজের,কোটি কোটি মানুষ। আর মানুষ রাষ্ট্রের মিলিত স্বার্থের জন্য যে কোন কাজ করবে তারা এর পারিশ্রমিক পাবে মাত্র। তাদের জীবন যাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানের ব্যবস্থা রাষ্ট্রের তরফ হতে করে দেয়া হবে। আর ব্যক্তি এর বিনিময়ে সমাজের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবে।

এই মতাদর্শ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে অর্থনৈতিক সংগঠন কায়েম করে। এই সংগঠনের ব্যক্তিগত মালিকানার এক বিন্দু অবকাশ নেই। কাজেই কারো পক্ষে অর্থ সঞ্চয় করা ও ব্যক্তিগত ভাবে অর্থোৎপাদনের কাজে নিয়োগ করা সম্ভব নয়। এখানে আদর্শ ও নীতির দিক দিয়ে বিরাট পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে বলে কাজের পন্থাও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ব্যাংকিং, জীবনবীমা, জয়েন্টষ্টক কোম্পানী ইত্যাদি ধরণের প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন ব্যতিত চলতে পারেনা। কিন্তু কমিউনিজম অর্থ ব্যবস্থায় উহার অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এই সব প্রতিষ্ঠানের শুধু অবকাশই নেই তা নয়, উহার প্রয়োজনও নেই।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য শুরুতেই এক রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পথ অবলম্বন করা হয়েছিল। তাই একে চালু রাখা ও স্থায়ী করার জন্য সর্বাত্মক ডিক্টেটরী শাসনের উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করতে হয়। বস্তুতঃই এই দুটি উপায় কমিউনিষ্ট অর্থ ব্যবস্থার জন্য অপরিহার্যও বটে। ১৯১৭ সনে রাশিয়ায় এক রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এই সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তা অল্প সময়ের মধ্যেই বিশ্বের বুকে যে তিক্তফল উপস্থাপন করেছে, তা সকল দিক দিয়েই ভয়াবহ। একদিকে তা মানুষের ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হরণ করেছে। অপরদিকে সাধারণ অর্থনৈতিক স্বচ্ছন্দ ও সুখ-শান্তির উচ্ছাসিত দাবী পুঁজিবাদী দেশের মতই অপূর্ণ ও অবাস্তবই রয়ে গেছে। সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার কেন্দ্র বিন্দু স্বয়ং রাশিয়ার সরকারী সূত্র হতে জানা যায়, সে দেশের জনগণের আয়ের হারে পাঁচশত ও তিন লক্ষের পার্থক্য বিদ্যমান। অনুরূপ ভাবে এ কথাও আজ প্রমাণিত হয়েছে যে, সোভিয়েত রাশিয়ায় বর্তমানেও অসংখ্য অন্নবস্ত্রহীন মানুষ বাস করে। আমাদের দেশের যে সকল প্রতিনিধি রাশিয়া ভ্রমণ করে এসেছেন, তাদের দেয়া বিবৃতি ও রচনাবলী হতে প্রমাণিত হয় যে, সমাজতন্ত্রের যাবতীয় ভবিষ্যৎ বাণী সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও অবস্তব প্রমাণিত হয়েছে এবং জনগণকে যে বিশ্বের অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ ভূ-স্বর্গ রচনার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল, সে রঙ্গীন ও চিত্তাকর্ষক অলীক বস্তু দ্বারা জনগণকে লোভাতুর করে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল, মূলতঃ তা সবই আকাশ কুসুমে পরিনত হয়েছে। বাস্তব দুনিয়ায় এর কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায় না। উপরোন্ত কমিউনিজম ও পুজিঁবাদী উভয়ই খোদাহীনতা ধর্মহীনতা (Secularism) গর্ভ হতে উদ্ভূত বলে উভয় সমাজের মনুষত্বই মানুষ্যত্যের মহান গুন গরিমা হতে বঞ্চিত হয়েছে। তা মানুষকে নিতান্ত পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। মানুষ আকৃতি বিশিষ্ট এই পশুগণ তাই আজ পরস্পরের সহিত শ্রেণী সংগ্রাম ও জাতি সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। বর্তমান সময়ে বিশ্বের দু'টি বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়া ও চীনের পরস্পরিক দ্বন্ধ, ঝগড়া-বিবাদ, সীমান্ত সংকট ও যুদ্ধ বিগ্রহ সমাজতন্ত্রের অন্তঃসার শূণ্যতা বিশ্ববাসীর কাছে সুস্পষ্ট করে তুলেছে। বস্তুতঃ সমাজতান্ত্রিক দেশ মানুষের বাসপোযোগী নহে। সমাজতান্ত্রিকতার নামে সেখানে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সকল সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতা চিরতরে হরণ করে লওয়া হয়েছে। ব্যক্তির কোনই মূল্য সেখানে স্বীকৃত নয়। সমাজ যেখানে সবকিছুর উপর স্বার্থক সেখানে সবকিছুর উপর অস্বাভাবিক ভাবে প্রধান্য দেয়া হয়েছে, ব্যক্তিকে সমাজ ও সমষ্টিস্বার্থের বেদী মূলে বলিদান

করা হয়েছে। বস্তুতঃ কমিউনিষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ সামষ্টিক যন্ত্রের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তার নিজের প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুসারে কোন কাজ করার বিন্দু মাত্র অধিকার নেই।

সমাজের সাধারণ ব্যক্তিবর্গকে মালিকানা হতে বঞ্চিত করে সমস্ত মানুষকে কেবলমাত্র সমাজ ও সমষ্টির গোলাম বানিয়ে দেয়া শুধু মাত্র অর্থ ব্যবস্থার পক্ষেই মারাত্মক নয়-ব্যাপক ভাবে মানুষের গোটা তামাদ্দুনের পক্ষেও উহা অত্যন্ত অকল্যাণকর। কেননা এর ফলে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ও তামাদ্দুনিক সংস্থা নিস্তব্ধ হয়ে যেতে বাধ্য এবং এর আসল কর্ম প্রেরণাই নিঃশেষ হয়ে যায়। বস্তুতঃ তামাদ্দুন ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থ মানুষকে সর্বশেষ শক্তি প্রয়োগ করার চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রাম করতে উদ্বুদ্ধ করে। কেননা মানুষের প্রকৃতিই একই রূপ সর্বাত্মক সর্বগ্রাশী শাসনের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি মুহুর্তেই বিদ্রোহ করতে উদ্যত হয়। এ জন্য তাদেরকে যদি চিরন্তন স্বৈরাতন্ত্রের লৌহ পিঞ্জিরে বন্দী করে না রাখা হয়, তবে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিমিষে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে বাধ্য।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে সুস্পষ্টরূপে প্রমানিত হয় যে, পুজিঁবাদ ও কমিউনিজম কোনটিই সামঞ্জস্যপূর্ণ ন্যায় পরায়ন, উন্নত, মনুষ্যত্বের মর্যাদা স্থাপনকারী এবং সুখ ও সমৃদ্ধিপূর্ণ অর্থব্যবস্থা দান করতে সমর্থ হয় না। এই উভয় অর্থব্যবস্থার কোনটিই রাষ্ট্র বা জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে না, বরং ব্যাপারটি আরো অধিকতর জটিল করে তুলেছে। অসংখ্য পুঁঞ্জিভূত আবর্জনার অতল তলে মূল বিষয়টিকে চাপাদিয়ে মানবজাতিকে এক দুঃসহ দুঃখ ব্যাথা ও ব্যর্থতা বঞ্চনায় জর্জরিত করে তুলেছে। পৃথিবী আজ এই দুই প্রকার অর্থ ব্যবস্থার নির্মম ও সর্বগ্রাশী নিষ্পেষণে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। বিশ্বমানব আজ এই উভয় প্রকার সমাজও অর্থ ব্যবস্থা হতে পরিপূর্ণভাবে মুক্তি চায়, তৃতীয় অর্থব্যবস্থার সন্ধানে বিশ্বমানব আজ নিঃসীম ব্যকুলতায় উদ্‌গ্রীব। তাই বিশ্বমানবের সঠিক কল্যাণ করতে পারে একমাত্র ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ঃ

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা পুজিঁবাদ ও সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মত দু'টি বিপরীত ধরণের ও পরস্পর বিরোধী অর্থ ব্যবস্থার মধ্যবর্তী এক সুষ্ঠু ও সুবিচার পূর্ণ অর্থ ব্যবস্থা। এর

Dhaka University Institutional Repository

মূলনীতি হল প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অধিকার পুরোপুরিই দিতে হবে। সেই সংগে ধন বন্টনের ভারসাম্যকেও যথাযথ ভাবে রক্ষা করতে হবে। ইসলাম একদিকে ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত মালিকানা অধিকার ও নিজের ধন-সম্পদ হস্তক্ষেপ করবার অধিকার দেয়। অপরদিকে এসব অধিকার ইখতিয়ারের উপর অভ্যন্তরীণ দিক হতে কতগুলো আইনের শাসন কায়েম করে। ফলে কোন এক স্থানে সম্পদ ও উপায়-উপাদান জমাট বাঁধতে ও স্থবির হয়ে থাকতে পারে না। উহা সর্বদা আবর্তিত হতে থাকে এবং এর ফলে সমাজের প্রত্যেকটি মানুষ তা হতে প্রয়োজনীয় অংশ লাভ করার সুযোগ পায়। এজন্যই ইসলাম গোটা অর্থ ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নতুন ধরণের ও নবতর পদ্ধতিতে গড়ে তুলেছে। এর অভ্যন্তরীন ভাবধারা, রীতিনীতি ও কর্ম পদ্ধতির দিক দিয়ে পুজিঁবাদ ও কমিউনিজম উভয় অর্থ ব্যবস্থা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই অর্থ ব্যবস্থাই যথার্থ, স্বাভাবিক এবং সর্ব প্রকারের শোষণ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। সেই সংগে সার্বিক শান্তি, সমৃদ্ধি, প্রগতি ও নিরাপত্তার বিধান করা এর পক্ষেই সম্ভব। সমস্ত জুলুম ও বঞ্চনা বন্ধ করে দেয় ইসলামী অর্থনীতির বিশেষ ধন-বন্টন পদ্ধতি। তা মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণকে বন্ধ করে মানুষ কর্তৃক মানুষের নিরন্তর কল্যাণ সাধনের প্রক্রিয়াকে সক্রিয় ও জোড়দার করে তোলে। ধন সম্পদের একীভূত পুঁঞ্জিভূত হওয়া ও পারস্পরিক অসাম্য ও পুঁজিবাদের অন্যান্য অশুভ প্রতিক্রিয়ার মোকাবেলায় শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে একমাত্র এই অর্থব্যবস্থা। সেই সংগে ইসলামী অর্থব্যবস্থায় বেশী মাত্রার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সুনিশ্চিত করে সুষম, সুষ্ঠু ও সুবিচারপূর্ণ অর্থ বন্টনের মাধ্যমে।

ঠিক এ কারণে আধুনিক বিশ্বের বহু অমুসলিম অর্থনীতিবিদ প্রকাশ্যে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের দাবী জানিয়েছেন। কেননা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বঞ্চিত নিঃস্ব-সর্বস্বান্ত বিশ্ব মানবতাকে কেবল মাত্র এই অর্থব্যবস্থাই রক্ষা করতে ও বাঁচাতে পারে। বাঁচার মত বাঁচার সুযোগ করে দিতে পারে। এ মতামতের সাথে একমত পোষণকারী দ'ইজন অমুসলিম অধ্যাপকের একটি চিঠি দৈনিক Gurdian পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে তারা লিখেছিলেন ঃ The Muslim system Seems to us to have great merit. The western world should study it and perhaps adopt it in whole or in part.

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু নিজেদের মতের প্রতি অন্ধবিশ্বাসী, নাস্তিক ও সংশয়বাদী ব্যক্তিরা ইসলামী অর্থব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুই না জেনে, না বুঝে, উহা অধ্যয়ন না করে, উহার প্রতি তীব্র বিদ্বেষাত্মক ও কপটতাপূর্ণ মনোভাব পর্যন্ত পোষণ করে। এ কারণে প্রচলিত অর্থব্যবস্থার পূতিগন্ধময় ক্ষুদ্রায়াতন জলাশয় সেচে ফেলে স্বচ্ছ পানির আগমন ও প্রবাহিত হওয়ার পথ উন্মুক্ত করে দিতে তারা প্রস্তুত হতে পারছে না। বরং তারা উপহাস করে প্রশ্ন করে ঃ What is Islamic economic System? এই প্রশ্ন অবশ্য বহু সংখ্যক মুসলিম নামধারী চিন্তাবিদ ও অর্থনীতিবিদ ব্যক্তির মনেও সংশয়ের সৃষ্টি করেছে। তা এ কারণে যে তারা ইসলামী অর্থনীতি সম্পর্কে কিছুই জানেনা। অথবা ইসলামী জীবন বিধানের প্রতি তারা ঈমান হারিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থনীতির জ্ঞানের উৎস ঃ

বর্তমান বিশ্বে প্রধানতঃ তিনটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। যথা- সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা এবং ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা। তাই বিশ্বের প্রতিটি সমাজকেই এর যে কোন একটি অর্থ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু এই তিনটি অর্থ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি এবং জ্ঞানের উৎস এক নয়। কেননা সমাজতান্ত্রিক সমাজে রাষ্ট্র কর্তৃক যোগান দেওয়া জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে প্রণয়ন করা হয় সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি বা মানুষের বলার বা মতামত দেয়ার কোন অধিকার থাকে না। বস্তুতঃ রাষ্ট্রই সেখানে নির্দেশ দেয় যাবতীয় নীতিমালা প্রস্তুত করার।

পক্ষান্তরে পুজিঁবাদী অর্থ ব্যবস্থায় অনুরূপ কোন নির্ধারিত নীতিমালা নেই। সেখানে সমাজের চাহিদাই হল মূল ভিত্তি। অর্থাৎ ভোক্তার চাহিদার উপর নির্ভর করে যে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় তা হল পুঁজিবাদি অর্থনীতির ভিত্তি।

উপরোক্ত দু'টি অর্থব্যবস্থার বিপরীত হল ইসলামী অর্থব্যবস্থা। কেননা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন-"বলে দিন রূহ আমার পালন কর্তার আদেশ ঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদের সামান্য জ্ঞান দান করা হয়েছে।"[১] এ কারণে ইসলামী সমাজ রাষ্ট্র বা ব্যক্তি কারো উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করে না। কারণ ইসলামে জ্ঞানের অনির্ধারিত মূল উৎস রয়েছে। যাকে ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস বলা হয়। যথা ঃ ১। আল কুরআন, ২। হাদীস, ৩। ইজমা এবং ৪। কিয়াস। নিচে উৎস গুলোর বর্ণনা করা গেল।

১। আল কুরআন ঃ

আল কুরআন হল মানব জাতির হেদায়াতের প্রধান উৎস। তা আল্লাহর বানী, রাসূলে করীম (সঃ) এর নবুয়তী জীবনের সুদীর্ঘ ২৩ বৎসরে অবতীর্ণ হয়েছে। এই কুরআনের শুরুতেই বলা হয়েছে "এই কিতাব এমন কিতাব যাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, ইহা খোদাভীরুদের জন্য পথপ্রদর্শক"।[২]

১। সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত নং-৮৫

২। সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত নং-২

Dhaka University Institutional Repository

সূরা আল-ইমরানের ৭নং আয়াতে তিন ধরণের "ঐশী সিদ্ধান্ত" প্রদান করা হয়েছে, যেমন ঃ "তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট সেগুলো কিতাবের আসল অংশ আর অন্য গুলো রূপক"।[১]

এ আয়াতে প্রথমতঃ আল-কুরআন সুনির্দিষ্ট ভাবে সে সব কাজকে চিহ্নিত করেছে সেগুলো সৎকাজ (যেমন-সামাজিক সুচিবার, ব্যবসায়ের রীতি-নীতি, বন্টন সাম্য।)

দ্বিতীয়তঃ সেসব কাজও চিহ্নিত হয়েছে যেগুলিকে নিঃসংশয় ভাবে অসৎ বলে নিন্দা করা হয়েছে (যেমন ঃ মদ্যপান, আর্থিক লেনদেনে সুদের হার, জুয়া, অপব্যয়)।

তৃতীয়ত ঃ কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে সরাসরি কিছু বলা হয় নাই। সে গুলো সম্পর্কে ইসলামী সমাজ ও জনগণ শরীয়াহ আইন অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে (যেমন ঃ সুদ মুক্ত সমাজ বিনির্মাণের পর্যায়, সম্পত্তির মালিকানার সীমা, মৌলিক চাহিদা অনুমোদিত মিশ্রন, ব্যক্তি ও সমাজের জন্যে অনুমোদিত আরামদায়ক ও বিলাস সামগ্রী ইত্যাদি)।

ইসলামী অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে আল-কুরআনই জ্ঞানের প্রথম ও মূল উৎস হিসেবে গন্য করা হয়। অর্থনৈতিক এজেন্ট সমূহের (যেমন ঃ উৎপাদনকারী, বন্টনকারী (ভোক্তা), আচরণের মূলনীতি সমূহ আল-কুরআন হতেই আহরিত হবে। বৈধ এবং অবৈধ সামগ্রীও সেবা নির্ধারণের ক্ষেত্রেও আল-কুরআনই হবে মূল ভিত্তি। উপরোক্ত অন্য যে তিনটি উৎসের (আল-হাদিস, ইজমা, কিয়াস) বিবরণ দেয়া হয়েছে, সে সবও আল-কুরআনের নির্দেশণাকেই প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে গণ্য করে থাকে।

২. হাদীস ঃ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) তাঁর নবুয়তী জীবনে যা কিছু বলেছেন, করেছেন বা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কারো কাজের বা কথার প্রতি সমর্থন দিয়েছেন একেই হাদীস বলা হয়। আল-কুরআনের পর হাদীস হলো ইসলামী জ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। হাদীস সংকলন হতেই এ জ্ঞান পাওয়া যায়। এক অর্থে হাদীস হলো রাসূলে করীম (সঃ) কর্তৃক আল-কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই স্বভাবতই সকল মুসলমানকে তাঁর উপদেশ অনুসরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

১। সূরা আল-ইমরান-আয়াত নং-৭

আল-কুরআনে অনেক কিছুরই উল্লেখ আছে যে সব বিষয়ে রাসূলে করীম (সঃ) এর কাছ থেকে বিস্তারিত নির্দেশনা পাওয়া যায়। উদাহরনস্বরুপ আল-কুরআনে মুসলমানের উপর যাকাত ফরয করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও ব্যাখ্যা করে বলে দেওয়া হয়নি কারা যাকাত দিবে এবং কি পরিমান যাকাত দিবে। রাসূলে করীম (সঃ) যাকাতের হার নির্ধারণ করেছেন। নিসাব নির্ধারণ করেছেন এবং সমাজে তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। সুদের প্রসঙ্গেও একই কথা প্রযোজ্য। সুদের অর্থ এবং বিভিন্নরূপ সুদ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে আল-কুরআনে কোনই উল্লেখ নেই। হাদীসের দ্বারাই মাত্র সুদ সম্পর্কিত নানা ব্যাখ্যা ও প্রাসঙ্গিক নীতি নির্দেশনা জানা গেছে।

ইসলামী অর্থনীতিবিদগন হাদীস থেকে ঐ সব বিষয়ে বিপুল জ্ঞান আহরন করেছেন যার উল্লেখ সরাসরি আল-কুরআনে নেই। মালিকানার তত্ত্ব, সম্পদের তত্ত্ব উৎপাদন উপকরণ সমূহের উপাদান ও তার বিনিময়, ভোগ ও বাজার প্রক্রিয়ার সমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে জানার জন্য মহানবীর (সঃ) হাদীসের উপর বিপুল ভাবে নির্ভর করতে হয়।

৩. ইজমা ঃ

ইসলামী জ্ঞানের তৃতীয় উৎস হল ইজমা এবং সে কারনেই ইসলামী অর্থনীতি প্রনয়নের জন্য এর ব্যবহার আবশ্যক। জ্ঞানের এই উৎস প্রকৃতপক্ষে এর মূলের জন্যে আল-কুরআন ও হাদীসের কাছে ঋনী। আল-কুরআনে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন "আল্লাহপাক তাদেরকে জীবিকা প্রদান করেন যারা পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের কার্যাবলী সম্পাদন করে।[১] কার্যতঃ যে সব প্রসঙ্গে কুরআন এবং হাদীস থেকে কোন সুনির্দিষ্ট সমাধান পাওয়া সম্ভব নয় সেসব ক্ষেত্রে ইসলামী ফকীহদের ঐক্যমতের প্রতি এই ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে দরকার হয় দক্ষতা, প্রজ্ঞা ও ন্যায় শাস্ত্র সম্মত যুক্তি। দরকার হয় মত বিনিময় যৌক্তিকতা এবং ব্যক্তিগত ও অন্যান্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে এসব যাচাই। এ দৃষ্টিকোন থেকে ইসলামী অর্থনীতিতে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ইজমাকে সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়, যেমন ঃ পরামর্শ ও আলোচনার মাধ্যমে মুসলিম ফকীহগণ যদি এ ব্যাপারে ঐক্যমত্যে পৌঁছান যে, ইসলামী সমাজে সিগারেট, চুরুট, বিড়ি উৎপাদন করা যাবে না।

১। আশ্ শুরু, আয়াত নং-৩৮

Dhaka University Institutional Repository

তাহালে সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে সিগারেট, চুরুট, বিড়ি তৈরী না করা অবশ্য পালনীয় হয়ে দাড়াবে।

৪. ক্বিয়াস ঃ

ক্বিয়াস পরিবর্তনশীল বিশ্বে নতুন নতুন তথ্যের দিক নির্দেশনার জন্য এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিয়াস অংশতঃ নির্ভরশীল সমজাতীয় যুক্তি-বিচার কৌশলের উপর। সেজন্যেই উপরে উল্লেখিত জ্ঞানের তিনটি উৎসের আলোকে ব্যাখ্যার নতুন নতুন পথ খুলে যায়।

আল-কুরআন, হাদীস ও ইজমার আলোকে বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণাত্মক যুক্তিকেই বলা হয় কিয়াস। কোন বিশেষ অবস্থা যা কুরআন ও সুন্নাহর সুনির্দিষ্ট কোন আয়াত বা নির্দেশের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। এমনকি ইজমাতেও মিলে না তেমন ক্ষেত্রে অনুরূপ কোন সিদ্ধান্ত বা ফতোয়ার আলোকে মুজতাহিদগণ সিদ্ধান্ত দিতে পারেন। সুতরাং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে সকল সমস্যার সমাধানে কুরআন হাদীস এবং ইজতেহাদের সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

ইজতেহাদের প্রকৃত উদাহরণ- হযরত উমর (রাঃ) এর শাসনামল হতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় তিনি যাকাত সংগ্রহ করার পদ্ধতি পরিবর্তন করেছিলেন এবং জিহাদে অংশ গ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বিজিত এলাকার জমি বন্টনের রীতি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিই তাঁকে এই পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করেছিল। তাই আজকের আধুনিক এবং একই সঙ্গে গতিশীল যুগে ইসলামী অর্থনৈতিক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে জ্ঞানের অন্যতম উৎস হতে পারে ইজতিহাদের মাধ্যমে কিয়াস।

কিয়াসের একটা গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ-যেমনঃ পবিত্র মহা-ধর্মগ্রন্থ আল কুরআনের সূরা মায়েদায় আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন, "হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারণী শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কাজ বৈ অন্য কিছু নয়। এগুলো থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও।[১]

১। আল মায়েদা, আয়াত নং-৯০

Dhaka University Institutional Repository

এথেকে সুস্পষ্ট বুঝা যায় অন্যান্য জিনিসের মধ্যে জুয়া ইসলামী অর্থনীতিতে মানুষের জন্য ক্ষতিকর। এ থেকে যে কেউ সুস্পষ্টতঃই কিয়াস করতে পারেন যে, একটি ইসলামী সরকার সমাজে সব ধরণের ক্ষতিকর কার্যক্রম এবং অর্থনৈতিক লেনদেন নিষিদ্ধ ঘোষণা ও তা কার্যকর করবে।

সবশেষে বলা যায়- যখন কেউ উপরোক্ত চারটি উৎসকে একই সঙ্গে বিবেচনায় আনবে তখন হয়তঃ দেখা যাবে ইসলামী অর্থনীতি পাশ্চাত্য অর্থনীতি হতে খুব পৃথক নয়। আপাতঃ দৃষ্টিতে এরূপ মনে হলেও কার্যতঃ একটা মৌলিক পার্থক্য রয়েই গেছে, তা হলো ইজতেহাদের মাধ্যমে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত। অবশ্যই তা ইজমার সিদ্ধান্তের পরিপন্থি হবে না। অনুরূপ ভাবে ইজমার সিদ্ধান্ত সমূহ সহীহ হাদীসের পরিপন্থি হবে না এবং সহীহ হাদীস হতে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত আল কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশের পরিপন্থি হবে না। এই মূলনীতি হতে কোন ক্রমে বিচ্যুত হওয়া চলবে না। ইসলামী অর্থনীতি এবং সনাতন অর্থনীতির মাধ্যে গড়মিল বা মত পার্থক্যের চেয়ে মতৈক্যই হয়ত বেশী দেখা যাবে। ইসলামী অর্থনীতিতে যেহেতু প্রতিটি সমস্যাই শরীয়াহ এর আলোকে বিবেচিত হয় এবং ভিন্ন মতের মধ্যে সমঝোতা বা সমন্বয় করাও সম্ভব সেহেতু শরীয়াহ এর উপর নির্ভর করলে মতানৈক্য হ্রাস করাও সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি সমূহ ঃ

মানবজাতিকে সকল প্রকার দারিদ্র ও শোষণ পীড়নের হাত থেকে এবং জনজীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধিপূর্ণ করে গড়ে তোলার জন্য যে অর্থ ব্যবস্থা গৃহীত হবে তাতে অবশ্যই কতগুলো মূলনীতি বর্তমান থাকতে হবে। ইসলামী অর্থনীতিতে এই মূলনীতি সমূহ প্রধানতঃ আল কুরআন ও সুন্নাহ এবং ইজমা ও ক্বিয়াস হতে উৎসারিত হতে হবে। এই মূলনীতি সমূহ যে অর্থনীতিতে বর্তমান থাকবে তা মানুষের সকল প্রকার সমস্যার সমাধান দিতে সামর্থ থাকবে। আর যে অর্থনীতিতে এই মূলনীতি অবর্তমান থাকবে বা গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হবে না তা কখনই মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারেনা। নিম্নে এ মূলনীতি সমূহ আলোচনা করা গেল ঃ

১) জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূল্যমান প্রচলিত থাকবে ঃ মানবজীবন কোন অখন্ড ও অবিভাজ্য ইউনিট নয় তাই একে বিভিন্ন অংশে খন্ড-বিখন্ড করা এবং খন্ডিত জীবনের জন্য খন্ডিত বিধান গ্রহণ করা কোন ভাবেই সম্ভব নয়। মানব জীবনের এই একত্ব ও অখন্ডত্বের জন্য উহার সমগ্র-দিক ও বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় একান্তই জরুরী। অনুরূপ ভাবে মানুষের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার সহিত অর্থনীতির সর্বত্রভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া অপরিহার্য। সমাজে অর্থ ব্যবস্থার যে মূল্যমান প্রচলিত থাকবে উহার রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক জীবন-বিধানেও অনুরূপ মূল্যমান বর্তমান থাকতে হবে। তাহলে মানুষের গোটা জীবন ব্যবস্থা পরিপূর্ণ ঐক্য ও সামঞ্জস্য সহকারে মানুষের অখন্ড ও সার্বিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে এবং ক্রমবিকাশ লাভ করতে পারে।

২) আর্থ-সামাজিকতার সাথে নৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয়ের নীতি ঃ ইসলামী অর্থনীতির সাথে সনাতন অর্থনীতির সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করে এমন নীতিই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ মৌলিক অর্থনৈতিক নীতি। এই নীতি পবিত্র কুরআনে বিধৃত তাওহীদের মতবাদ হতে উদ্ভূত। তাওহীদের মর্মবালী হল-"আল্লাহ এক এবং মানুষকে তাঁর কাছেই জবাবদিহি করতে হবে"। সুতরাং অন্য কোন কিছুই মানুষের স্বাধীনতা হরণ করতে পারে না। কারণ মানুষের নৈতিক ও আত্মীক রূপই তার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যাহিক জৈবিক কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। মানবীয় আচরণের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রসঙ্গ সমূহের মধ্যে সমন্বয়ের এই প্রয়োজনীয়তাকে সনাতন অর্থনীতিবিদরাও স্বীকার করেন। কিন্তু এর ফলে উদ্ভূত জটিলতাকে এড়াবার জন্যেই তারা "অন্য সব কিছু একই রকম থাকবে" এ ধরণের সরল কথা ব্যবহার করে আসছেন। উদাহরণ স্বরূপ অন্যান্য সবকিছু একই রকম থাকলে চাহিদা নির্ভর করে আয় ও দামের উপর। এক্ষেত্রে অন্যান্য চলক-যেমন ঃ রুচি, পছন্দ, গুনাগুন ইত্যাদি স্থির ধরে নেওয়া হয় যা বাস্তবে আদৌ হয় না। তাই ইসলামী অর্থনীতিতে বস্তুগত উন্নতি এবং আত্মীক অধ্যায়কে পৃথক ভাবে বিবেচনা করা হয় না।

৩) বৈষম্যহীন অর্থ ব্যবস্থা ঃ যে সমাজে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা কার্যকর থাকবে সে সমাজে সামাজিক সুবিচার ও ন্যায় পরায়নতা পূর্ণরূপে স্থাপিত থাকতে হবে। সেখানে ব্যক্তির অধিকার এবং কর্তব্য ও দায়িত্বে কোন রূপ মতবিরোধ, পার্থক্য ও বৈষম্যের অবকাশ থাকতে পারবে না। উহার সীমা সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে। এর অভ্যন্তরে কোন রূপ পারস্পারিক দ্বন্দ্ব বা বিরোধ থাকতে পারবে না। উহা মানব সমাজে কোন রূপ শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টি করবে না। সমাজের লোক দিগকে শ্রেণী সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করবে না বা উহার কোন কারণ ও সেখানে উদ্ভূত হবে না। মোট কথা সেখানে ব্যক্তির যাবতীয় অধিকার সুরক্ষিত হবে। ব্যক্তির উপর আবর্তিত সমাজের অধিকার গুলি ও উহাতে সংরক্ষিত থাকবে এবং ব্যক্তির অর্থনৈতিক চেষ্টা সাধনা সমাজের সামগ্রিক স্বার্থের পরিপন্থী বা উহার পক্ষে ক্ষতিকর হবে না। ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পরের মধ্যে পারস্পারিক সহযোগীতা ও সহানুভূতির স্বতঃস্ফুর্ত ভাবধারার ভিত্তিতে এক অর্থনৈতিক সম্পর্ক সংস্থাপিত হবে। ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়ের স্বার্থের সংরক্ষণ, ব্যক্তিকে সমষ্টির স্বার্থে আঘাত হানার সুযোগ না দেয়া এবং সমাজও সমষ্টিকেও ব্যক্তি স্বার্থ গ্রাস করার অবকাশ না দেয়া উভয়ের স্থায়ী শান্তি ও কল্যাণের জন্য অপরিহার্য। বস্তুতঃ যে অর্থ ব্যবস্থায় ব্যক্তি ও সমষ্টির পারস্পারিক স্বার্থে এই নিরবচ্ছিন্ন ঐক্য ও সামঞ্জস্য বর্তমান রয়েছে। তাই হচ্ছে নির্ভূল ও নিখুঁত অর্থনীতি।

Dhaka University Institutional Repository

এ অর্থনীতি সমগ্র প্রাকৃতিক শক্তি ও বস্তুকে সম্পূর্ণরূপে আওতাধীন করার সুযোগ উহাকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিবে। অর্থনৈতিক চেষ্টা সাধনা ও উপার্জন প্রচেষ্টা চালাবার অধিকারের ক্ষেত্রেও পরিপূর্ণ সাম্যের প্রতিষ্ঠা করবে।

৪) সহযোগিতার নীতি ঃ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় লাগামহীন প্রতিযোগীতার পরিবর্তে পারস্পারিক সহযোগিতাকে অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-"তোমাদের মধ্যে পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ"।[১]

আল কুরআনের সূরা আর-মায়েদায় বলা হয়েছে-"সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর।"[২]

আল-কুরআনের এ সকল নির্দেশ সমূহের অর্থনৈতিক ভাবে বিশ্লেষণ করলে এর তাৎপর্য হয় অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের মধ্যে ভারসাম্য অর্জনের জন্যে সহযোগিতা মূলক শক্তির কৌশল কাজে লাগাবার উপর জোর দিতে হবে। ইসলামী শরীয়তের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অর্থাৎ সামাজিক কর্মকান্ড সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পারস্পারিক পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদানই হল সঠিক উপায়।

৫) দরিদ্র ও অসহায় লোকদের সাহায্যের নীতি ঃ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার প্রধান উৎস আল-কুরআন। তাই আল-কুরআনের ঘোষণা-"এবং তাদের ধন সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক রয়েছে।"[৩]

এ নীতির মূল তাৎপর্য হল ইসলামী অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে এমন কিছু প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে যার মাধ্যমে যাদের অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে সেই সম্পদ যাদের যৎসামান্য সম্পদ রয়েছে, যাদের কিছুই নেই তাদের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা থাকতে হবে। যাকাত, উশর ও সাদকাহ এ ক্ষেত্রে গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

১। সূরা আন-নিসা, আয়াত নং-২৯

২। সূরা মায়েদা, আয়াত নং-৩

৩। সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত নং-১৯

Dhaka University Institutional Repository

৬) ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবায়নের সাথে নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতা লাভের মূলনীতি ঃ ব্যক্তির বৈষয়িক উন্নতি লাভের সাথে সাথে নৈতিক উৎকর্ষ এবং চরিত্রের ক্রমবিকাশও পূর্ণরূপে সাধিত হবে। কারণ নৈতিক উন্নতি ব্যতিত বৈষয়িক ও অর্থনৈতিক উন্নতি কোন ভাবেই সম্ভব নয়। একথা ঐতিহাসিক ভাবেই প্রমানীত হয়েছে। এক সময় পশ্চিমা জগতের চিন্তাশীল দার্শনিকদের নৈতিক চরিত্রের নাম শুনতেই গাত্রদাহ শুরু হয়ে যেত, কিন্তু তারাও আজ এই সত্য স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

ইংল্যান্ডের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক জি.ডি. হব (G.D. Hobb) এই সত্য স্বীকার করে বলেছেন-"নৈতিক মূল্যবোধ ব্যতীত কাজ করায় যে বিপদের আশংকা থেকে যায়, আমি তা স্পষ্ট করেই বলতে চাই। বস্তুতঃ নৈতিক নিরপেক্ষতা অবলম্বনের চেষ্টা করা চরম নির্বুদ্ধিতা, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কোন ব্যক্তিই রাজনীতি বা সমাজনীতির কোন ব্যাপারেই বাস্তববাদী হতে পারে না।

জার্মান অর্থনীতিবিদগণ যথার্থ ভাবেই নৈতিক গুনের অর্থনৈতিক মূল্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বর্তমানে অর্থনীতিবিদগণদের মধ্যে এই নৈতিকতার এই গুরুত্ববোধ তীব্র হয়ে উঠেছে। যারা কস্মিন কালেও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নৈতিকতার গুরুত্ব স্বীকার করতেন না, তাঁরাও এখন খুব জোড়ে-শোরেই স্বীকার করছেন।

অতএব, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় মানুষের নৈতিক চরিত্রের বিকাশলাভে কোন রূপ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হতে পারবে না, বরং একে রীতিমত সহায়ক ও ব্যবস্থাপক হতে হবে। তা কেবল সামাজিক চাপে পাওয়া হবে না, বরং তাহবে ব্যক্তির স্বকীয় ও স্বতঃস্ফুর্ত উদ্যম-উৎসাহ (Initiative) অনুসারে। আর এরূপ হলেই মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব ও নৈতিক চরিত্রের উচ্চতম মর্যাদায় উন্নীত হতে পারে। মানব সমাজের পারস্পারিক প্রেম-ভালবাসা, সহানুভূতি ও সহৃয়তার উৎসমূখ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর প্রত্যেক ব্যক্তি সুখ ও সম্পদে সু-সমৃদ্ধ হলেও সে সমাজকে নিতান্তই দরিদ্র সমাজ বলতে হবে। হযরত ঈছা নবী এজন্যই বলেছিলেন- "Men dose not live with bread alone, but he needs some spiritual foods" "মানুষ শুধু রুটি খেয়েই বাঁচতে পারে না, তার আধ্যাত্মীক নৈতিক খাদ্যেরও

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন রয়েছে। মানুষের অন্বষণ বা অর্ধাষণই সমাজের দারিদ্রের একমাত্র প্রমাণ নয়, সমাজের লোকদের পারস্পারিক স্নেহ-ভালোবাসা, সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ব ও স্ব-হৃদয়তার নির্মল ভাব ধারায় অভাব থাকাও সমাজের দারিদ্র হওয়ার অন্যতম কারণ।

৭। নিজে উপার্জনের নীতি ঃ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় মানুষকে অলস থাকতে বা ভিক্ষা করতে নিষেধ করে কাজ করে খাদ্য অন্বেষণ করতে বলা হয়েছে। আল-কুরআনে সুস্পষ্ট ভাবে সকল মানুষকে আহবান জানানো হয়েছে প্রতিদিন ফজরের নামাজ আদায়ের পরে জমিনে ছড়িয়ে পড়তে এবং আল্লাহ অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে। যেমন ঃ সূরা জুমায় বলা হয়েছে-"সালাত সমাপ্ত হয়ে গেলে জমিনের বুকে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ রাজি অন্বষণ কর।"(১)

মহানবী (স.) বলেছেন-"কোন মানুষের নিজের চেষ্টায় উপার্জিত আয়ের চেয়ে আর কোন উপার্জনই শ্রেষ্ঠ হতে পারে না।"(২)

কাজ করে জীবিকা অর্জন করাকে ইসলামে পুণ্য এবং অলস জীবন-যাপনকে পাপ বরে গণ্য করা হয়েছে। পবিত্র কুর-আনে বলা হয়েছে-"হে রাসূল! আর তুমি বলে দাও, তোমরা কাজ করে যাও, তার পরবর্তীতে, আল্লাহ দেখবেন তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রাসূল ও মুসলমানগণ"।(৩)

ইসলামে কায়িক শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করাকে শ্রেষ্ঠ ইবাদত বলা হয়েছে। প্রিয় রাসূল (সঃ) জনৈক শ্রমিকের হাতে চুমু খেয়েছেন বলেও উল্লেখ আছে। অপর দিকে ইসলাম ধর্মে সন্নাসবাদ ও ব্রক্ষ্মচর্যাকেও নিন্দা করা হয়েছে। যারা জীবিকা অর্জনের জন্যে কোন কাজ না করে সবসময় শুধু ইবাদতে মশগুল থাকে তাদেরকে যারা খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগান দেয় তারা প্রথমক্তদের চেয়ে উত্তম বলে রাসূল (সঃ) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন।(৪)

১। সূরা জুমা, আয়াত নং-১০

২। ইবনে মাজাহ

৩। সূরা আত্-তওবাহ, আয়াত নং-১০৫

৪। Kahf-1992, Page-154

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হল জনগণকে কাজের ব্যবস্থা করে দেয়া, সাথে সাথে মানুষের দায়িত্ব হল কাজের জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া।

৮) কৃষি কাজের মাধ্যমে উপার্যনের নীতি ঃ কৃষি কাজের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জনের উপরও আল্লাহপাক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পবিত্র কুর-আনে এ সম্পর্কে অনেক ঘোষণা রয়েছে-যেমন সূরা আনআমে বলা হয়েছে-"আর তিনি সেই সত্বা যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতপরঃ আমি এর দ্বারা সর্ব প্রকার উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছি। অতঃপর আমি এ থেকে সবুজ ফসল নির্গত করেছি, যা থেকে যুগ্মবীজ উৎপন্ন করি, খেজুরের কাঁদি থেকে গুচ্ছ বের করি যা নুয়ে থাকে, এবং আঙ্গুরের বাগান, জয়তুন, আনার পরস্পর সাদৃশ্যযুক্ত এবং সাদৃশ্যহীন। বিভিন্ন গাছের প্রতি লক্ষ্য কর-যখন সেগুলো ফলন্ত হয় এবং তার পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্য কর। নিশ্চই এগুলোতে নির্দেশনা রয়েছে ঈমানদারদের জন্য।"(১)

সূরা হিজর-এ আল্লাহপাক বলেছেন-"আমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার উপর পর্বতমালা স্থাপনা করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিত ভাবে উৎপন্ন করেছি। আমি তোমাদের জন্যে তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি, এবং তাদের জন্যে যাদের অন্নদাতা তোমরা নও"।(২)

উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে সহজেই বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ পাক আল-কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ ও উৎসাহ ব্যঞ্জক বাণী প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহেই একে সহজতর করে দিয়েছেন। কেউ যদি কৃষিকাজে নিয়োজিত হয় তবে সে আরো অতিরিক্ত ফায়দা অর্জন করতে পারে। নবী করিম (সঃ) এ প্রসঙ্গে বাণী প্রদান করেছেন "যদি কোন মুসলমান একটি বৃক্ষরোপন করে অথবা কোন শস্য ফলায় এবং তা হতে কোন মানুষ কিংবা পাখি অথবা পশু ভক্ষণ করে, তবে তা তার জন্য সাদকাহ স্বরুপ গণ্য হবে।(৩)

১। সূরা আন্আম, আয়াত নং-৯৯

২। সূরা হিজর, আয়াত নং-২০

৩। বুখারী ও মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

মহানবী (সঃ) এ হাদিস দ্বারা মানুষকে শ্রমের মর্যাদা, বৃক্ষরোপন, কৃষিকাজ এবং সৃষ্টি জীবের প্রতি মানব জাতির দ্বায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে উদ্ভূদ্ব করেছেন।

৯) শিল্প ও পেশার মাধ্যমে জীবিকা অর্জনের নীতি ঃ কেবল মাত্র কৃষির মাধ্যমেই মানুষের জীবিকা অর্জনের চেষ্টা করা- ইসলামের দৃষ্টিকোন থেকে এটা মোটেই কাম্য নয়। মুসলমানগণ যাতে তাদের কার্যক্রম শুধুমাত্র পশুপালন ও কৃষি কাজের মধ্যেই সীমিত না রেখে সে ব্যাপারে রাসূলে করীম (সঃ) সতর্ক করে দিয়েছেন। কেননা তাহলে ধর্মীয় স্বাধীনতা হাড়ানোর যেমন সম্ভাবনা থাকবে তেমনি সমাজে অপমান ও পরাজয়েরও সম্ভাবনা থাকবে। হাদীসে বর্ণিত আছে "যদি তোমরা ভিন্ন নামে সুদের ব্যবসা কর, গরুর লেজ ধরে সময় কাটাও অথবা কৃষিকাজ নিয়ে সন্তুষ্ট থাক এবং জিহাদ থেকে বিরত থাক তাহলে আল্লাহ তোমাদের অসম্মানিত করবেন যতক্ষন না তোমরা পুনরায় দ্বীনের প্রতি ফিরে আস"।[১]

হযরত ইউসুফ কারাযাবীর কথায়-"কৃষিকাজ ছাড়াও মুসলমানদের এমন সব শিল্প, পেশা এবং দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে হবে যা সমাজের জন্য অপরিহার্য, একটা স্বাধীন ও শক্তিশালী জাতি গঠনের জন্যে সহায়ক এবং একটা দেশের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্যে অনুকুল। ইসলামী শরীয়াহ থেকে শুধু অপরিহার্য শিল্প ও পোশাক গ্রহনের অনুমোদনই দেয়া হয়নি বরং ইসলামের সম্মানিত মহান ইমাম ও ফকীহগন তা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্যে বাধ্যতা মূলক বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই ধরনের বাধ্যবাধকতাকে পর্যাপ্ততার বাধ্যবাধকতা বলা হয়।"[২]

উপরের ৮ ও ৯ নং নীতি দুটি বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী মনে হয়, তবুও এ ব্যাপারে কোনরূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়া উচিৎ নয় বরং এ দু'য়ের মধ্যে এভাবে সমন্বয় সাধন করা যায় যে, যেখানে খাদ্য অপ্রতুল সে ক্ষেত্রে কৃষিই সর্বাধিক অগ্রাধিকার পাবে এবং যে ক্ষেত্রে শিল্পজাত সামগ্রীর অভাব বেশি সেক্ষেত্রে শিল্পায়নের উপরই সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১। আবু দাউদ

২। Allama Yousuf Qardawi, Kitab All-Kharaj, 1960, P-131

Dhaka University Institutional Repository

উপরন্তু যে সব ক্ষেত্রে দ্রব্য সামগ্রী বা শস্য স্থানিয় সে ক্ষেত্রে বানিজ্যই পাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে তা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশের বিরাজমান অর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর।

১০) গবেষণা ও উন্নয়নের নীতি ঃ ইসলামী বিশ্বে গবেষণার দরজা পূর্বেও যেমন বন্ধ হয়নি বর্তমানে তেমনি উন্মুক্ত রয়েছে। এটি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা তথা ইসলামী অর্থব্যবস্থার বিধান রচনা ও ব্যবহারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উৎস। পবিত্র কুরআনের সূরা আল-জাজিরা এ আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন এবং আয়াত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন তোমাদের যা আছে নভোমন্ডলে এবং যা আছে ভূমন্ডলে তাঁর পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে নির্দেশনাবলী রয়েছে"[১] (৪৫ঃ১৩)। এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ The Meaning of the Glorious Quran-এ Abdullah Yousuf Ali বলেছেন-আল্লাহ তাঁর অসীম অনুগ্রহে মানুষকে প্রাকৃতিক শক্তিকে পদাসত করার এবং যুক্তি ও অর্ন্তদৃষ্টির সাহায্যে গভীর রহস্য ভেদের ক্ষমতা দিয়েছেন। এই অনুগ্রহই আর্থ সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্ব পূর্ণ কৌশল হিসাবে ইসলামী অর্থনীতিবিদদের গবেষণা ও উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণের জোর তাগিদ দেয়। ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে শিল্প ও বিজ্ঞানের কোন অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে যদি যথাযথ দক্ষ ও যোগ্য লোকের ঘাটতি দেখা দেয় তাহলে গোটা মুসলিম উম্মাহই এজন্যে নিন্দনীয় হবে। বিশেষ করে এই দায়ভার আরো বেশী তাদের যারা সমাজের নেতৃত্বে আসীন রয়েছে। ইমাম গাজ্জালী বলেন, "এই দুনিয়ার কল্যাণের জন্যে বিজ্ঞানের যে সব ক্ষেত্রের জ্ঞান অপরিহার্য তাকে ফরযে কিফায়া গণ্য করতে হবে। যেমন-ঔষধ, গণিত, কৃষি, বস্ত্রবয়ন, রাজনীতি এবং এমনকি রক্তমোক্ষন ও দর্জির কাজ। উদাহরণ স্বরূপ কোন শহরে যদি শিঙ্গা লাগাবার লোক না পাওয়া যায় তা হলে সে শহর ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পরিনামে নিশ্চিহ্ন হতে বাধ্য।[২]

১। সূরা আল-জাসিয়া, আয়াত নং-১৩

২। Allama Yousuf Qardawi, Kitab All-Kharaj, 1960. P-131.132

Dhaka University Institutional Repository

১১) ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার নীতি ঃ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হল ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা। ভবিষ্যতের ব্যাপারে অজ্ঞাত থেকেই এই নীতি গ্রহণ করতে হয়। এনীতিতে কোন নিশ্চয়তা গ্রহণ বা প্রদান করা যাবেনা। এ ব্যাপারে আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন-"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে তিনি তা জানেন। কেউ জানেনা আগামী কাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানেনা কোন দেশে সে মৃত্যু বরণ করবে। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞান"।[১] এই নীতি ইসলামী অর্থনীতিবিদদের সম্পূর্ণ ভবিষ্যত বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদানে বিরত রাখে। উদাহরণ স্বরূপ কোন ব্যক্তি কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করলে তার ফলাফল সম্বন্ধে সঠিক করে কিছুই বলা যাবে, কেননা তার পরিনাম কিংবা চুড়ান্ত ফল কি হবে কেউ ই তা সঠিক করে বলার ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ঝুকি নিতেই হবে। তাই সুদের নিদিষ্ট ও পুর্বনির্ধারিত হার অবশ্যই ইসলাম বিরোধী বলে গণ্য হবে।

১২। বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি ঃ- উপরোক্ত অর্থ-ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করা ও যথযথরূপে উহাকে চালু রাখা ব্যক্তির চিন্তা, মত প্রকাশ, চলাফেরা প্রভৃতির স্বাভাবিক স্বাধীনতা হরণকারী কোন রাষ্ট্রব্যবস্থা দ্বারা অদৌ সম্ভব নয়। বরং সে জন্য দেশে প্রকৃত গণ-অধিকার সম্পন্ন রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে। বুর্জোয়া গণতন্ত্র নয়, আল্লাহর সার্ব ভৌম-ভিত্তিক খিলাফত ব্যবস্থা স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। বিশেষ ধরণের কোন অর্থ ব্যবস্থাকে চালু রাখার জন্য কোন নিরংকুশ একনায়তন্ত্র প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হলে তা যে স্বাভাবিক ও শাশ্বত অর্থব্যবস্থা নয় তা সুস্পষ্ট। এ জন্যই উপরিউক্তরূপ অর্থ ব্যবস্থার পশ্চাতে উহার দৃঢ়তা ও স্থায়িত্বের জন্য একটি সম্পূর্ণ ও নিখুঁত গণ-অধিকারবাদী রাষ্ট্রশক্তির অস্তিত্ব বর্তমান থাকা প্রয়োজন। এই রাষ্ট্র শক্তি সমাজের লোকদের প্রাণ ধন ও সম্মানের নিরাপত্তা বাক-স্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা, চলাফেরা ও সম্মেলনের সংগঠনের স্বাধীনতা রক্ষা করবে। উহা একদিকে সমাজের অর্থ ব্যবস্থার পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা করবে এবং অপরদিকে সেই অর্থব্যবস্থা ও রাষ্ট্র শক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও সহযোগিতা স্থাপন করবে।

১। সূরা লোকমান, আয়াত নং-৩৪

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরানের আলোকে আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতের মধ্যে সম্পর্ক ঃ

পবিত্র কুরআনের আলোকে রাষ্ট্রীয় ভাবে আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাত সমূহের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই সম্পর্ক পরস্পর নির্ভরশীল এবং ধনাত্মক। যেমন ঃ

১। যাকাতঃ- যাকাত থেকে যে অর্থ আদায় করা হয় সে অর্থ পবিত্র কুরআনে যাদের জন্য ব্যয় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাদের ব্যতীত অন্য আর কারো জন্যে ব্যয়ের ক্ষমতা ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের নেই। পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবায় বলা হয়েছে যাকাত পাওয়ার অধিকার কেবল ফকীর মিসকিন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্র আকর্ষণ প্রয়োজন এবং তা দাস মুক্তীর জন্যে, ঋন গ্রস্থদের জন্যে। আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্যে ও মুসাফিরদের জন্যে। এই হল আল্লাহর নির্ধারিত খাত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।[১] এখানে দেখা যায় যে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই খাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেগুলো হলো (১) দরিদ্র (২) অভাবী (৩) যাকাত আদায়কারী (৪) নও মুসলীম (৫) বন্দী মুক্তি (৬) ঋণ গ্রস্থ (৭) আল্লাহর রাস্তায় এবং (৮) মুসাফির সুতরাং এই নির্ধারিত খাতের বাইরে যাকাত প্রদান করার ক্ষমতা রাষ্ট্র বা অন্য কারো নেই।

২। গনীমাহ বা খুমুস ঃ- পবিত্র কুরআনে গনীমাহ বা খুমুস থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। সূরা আনফালের ৪১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে- "আর একথাও জেনে রেখ যে, কোন বস্তু সামগ্রীর মধ্যে থেকে যা কিছু তোমরা গনীমাত হিসেবে পাবে তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর জন্যে, রাসূলের জন্যে তার নিকট আত্মীয় স্বজনদের জন্যে এবং ইয়াতিম অসহায় ও মুসাফিরদের জন্যে। যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপর"।[২] অতএব বাধ্যতামূলক ভাবেই যুদ্ধে প্রাপ্ত পরিত্যক্ত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ অবশ্যই সরকারী কার্যক্রমে তাদের জন্য ব্যয় করতে হবে যাদের মধ্যে রয়েছে রাসূলের আত্মীয় স্বজন, তাঁদের গোত্র সমূহ, ইয়াতীম অভাবী এবং মুসাফির। অবশিষ্ট ৪/৫ অংশ কিভাবে ব্যয়িত হবে সে ব্যাপারে আল-কুরআনে কোন সুনির্দিষ্ট বিধান নেই।

১। সূরা আত্ তাওবা, আয়াত নং-৬০

২। সূরা আনফাল, আয়াত নং-৪১

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং পূর্বে যেমন বলা হয়েছে তেমনি এই অংশ সে সব যোদ্ধাদের জন্যে ব্যয় করা হবে যারা প্রকৃতই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। কাজেই এ ব্যপারে রাষ্ট্র সরকার আল-কুরআনের ঘোষিত উক্ত বিধানের অনুস্মরন করবে, অন্য কোন পন্থা গ্রহণ করবে না।

৩। ফাই বা শত্রু সম্পত্তি ঃ- বিধর্মীদের থেকে যুদ্ধ ব্যতীতই যে সম্পদ লাভ করা হয় উহাকে বলা হয় ফাই বা শত্রু সম্পত্তি। আল্লাহ পাক আল-কুরআনের সূরা হাশরের ৬-১০ নং আয়াতে ফাই সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ কোন কোন খাতে ব্যয় করতে হবে তা সুনির্দিষ্ট ভাবে অবহিত করেছেন। এ খাতগুলো মোটামুটি যাকাতের অর্থ যে সব খাতে ব্যয় করা হবে তার অনুরূপ। মূলত ঃ ফাই সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত জনগণের কল্যাণের জন্যই ব্যয় করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামে সরকারী অর্থ ব্যবস্থার নীতিমালা ঃ

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার মূলনীতি সমূহ ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই অংশে ইসলামে সরকারী অর্থব্যবস্থার নীতিমালা কি হবে সে সম্পর্কে আলোচনা করা গেল,

আল-কুরআন ও রাসূল (সঃ)-এর সুন্নাহ্তে সরকারী অর্থব্যবস্থাকে ইসলামী প্রেক্ষিতে নির্মাণের জন্যে কি কি নির্দেশনা রয়েছে তা প্রথমেই দেখা যাক। এই নির্দেশনা গুলোকেই সরকারী অর্থব্যবস্থার ইসলামী নীতিমালা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

ক) ব্যবসায়ের অনুমতি ও সুদ নিষিদ্ধিকরণ ঃ আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন- "আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম"।[১] পবিত্র কুরআনের এই ঘোষনা ইসলামী সরকারী অর্থব্যবস্থার অন্যতম মূলনীতি। এই ঘোষনার মাধ্যমে আল্লাহপাক সমগ্র মানব জাতীকে জানিয়ে দিলেন- ব্যবসা করা প্রতিটি মানুষের জন্যই বৈধ। তবে ব্যবসার নামে সুদ গ্রহন কোন অবস্থাতেই গ্রহনযোগ্য নয়।

খ) লোকসানের দায়-দায়িত্ব গ্রহন ঃ যে ব্যক্তি ব্যবসা করবে ব্যবসার লাভ-লোকসানের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তাকেই গ্রহন করতে হবে। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিকানা হতে দায়িত্ব কর্তব্যকে কোন অবস্থাতেই পৃথক করা এবং পৃথক ভাবে দেখার কোন সুযোগ নেই।

গ) চুক্তির বাধ্যবাধকতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন ঃ ইসলামে সরকারী অর্থব্যবস্থার অন্যতম নীতি হল সকল চুক্তির বাধ্যবাধকতা লিখিত ভাবে থাকতে হবে এবং তা যথাযথ ভাবে পালন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে আল্লাহ পাক ঘোষণা করা হয়েছে-"হে মুমিনগন! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋনের আদান-প্রদান করো তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্য থেকে কোন লেখক তা ন্যায় সঙ্গত ভাবে লিখে দিবে, লেখক লেখতে অস্বীকার করবেনা"।[২] চুক্তি নামায় উভয়পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষনের জন্যে চুক্তিগুলো সুস্পষ্ট হতে হবে যাতে সহজেই সর্ব সাধারণের বোধগম্য হয়।

ঘ) অপব্যয়ের নিন্দা ঃ ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন অপব্যয় না করার বাধ্যবাধকা রয়েছে ইসলামে সরকারের প্রতিও তেমনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অপব্যয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সরকারের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

১। সূরা বাক্বারা, আয়াত নং-২৭৫

২। সূরা বাক্বারা, আয়াত নং-২৮২

Dhaka University Institutional Repository

বরং উভয়ের জন্য একই নীতি। আল-কুরআনের সূরা বনী-ইসরাইলে ঘোষনা করা হয়েছে "এবং কিছুতেই অপব্যয় করনা, নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী শয়তানের ভাই"।(১) এ কথা সবসময়ই স্মরন রাখতে হবে যে দেশের জনসাধারনের কঠোর পরিশ্রমে উপার্জিত অর্থ হেফাজতের দায়িত্ব সরকারের। সুতরাং এ অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকারকে অবশ্যই মিতব্যয়িতা অবলম্বন করতে হবে।

ঙ) দরিদ্রের জন্যে সুবিচার প্রতিষ্ঠা ঃ ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সরকারের আর একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ন বৈশিষ্ট্য হলো দরিদ্র ও অসহায় অভাবীদের জন্যে সুবিচারের প্রতিষ্ঠা। এই নীতিটি সরাসরি আল-কুরআন হতেই উৎসারিত। এ ব্যপারে পবিত্র কুরআনে সরাসরি নির্দেশ এসেছে-"তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি সামর্থ দান করলে তারা নামাজ কায়েম করে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে, প্রত্যেক কর্মের পরিনাম আল্লাহর এখতিয়ার ভূক্ত"(২)।

চ) গনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঃ ইসলামী শরিয়তের দাবী হল অর্থ আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তার অধিকার গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করবে। অর্থাৎ এমন কিছু খাত আছে যেসব খাতে অর্থব্যয় জনগণের কল্যালের সাথে সম্পৃক্ত অথচ এসব ব্যপারে কুরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই, আবার এসব খাতে ব্যয়ে শরীয়তেও বাধা নেই, সে সব বিষয়ে জনগন তথা মজলিশে শুরার সাথে পরামর্শ ক্রমেই সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনের সূরা আশ-শুরার ৩৭নং আয়াতে বলা হয়েছে-"তারা যেন পারস্পারিক পরামর্শক্রমে কাজ করে"।(৩)

ছ) অর্থ-সম্পদ জমা করে রাখা নিষিদ্ধ ঃ টাকা পয়সা বা অর্থ-সম্পদ কোন অবস্থাতেই কারো হাতে পুঁঞ্জিভূত থাকতে পারবে না। আল্লাহপাক আল-কুরআনে বর্ননা করেছেন-"ধনসম্পদ, যাতে কেবল তোমদের বিত্তশালীদের মাঝেই পুঁঞ্জিভূত হয়ে না থাকে"।(৪)

১। (সূরা বনী-ইসরাইল, আয়াত নং-২৬-২৭)।

২। সূরা হজ্জ, আয়াত নং-৪১

৩। সূরা আশ্ শুরা, আয়াত নং-৩৭

৪। সূরা হাশর, আয়াত নং-৭

Dhaka University Institutional Repository

আল-কুরআনের এই ঘোষনার অর্থ হল- যখন রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত এবং কর আদায় করবে এবং জনগনের নিকট থেকে সম্পদ সংগ্রহ করা হবে এবং সংগ্রহীত ঐ সমুদয় অর্থ নানা উদ্দেশ্যে ব্যয় করবে তখন তাকে অবশ্যই দেখতে হবে যে, ধনীদের হাতে অর্থ যেন গরীবদের কাছে যথাযথ ভাবে পৌছেঁ, ধনী ব্যক্তিরা যেন আরো ধনী এবং গরীব ব্যক্তিরা যেন আরো গরীব না হয় সে ব্যাপারে সরকারের কর্ম-কান্ডের মধ্যে পদক্ষেপ নেয়া জরুরী।

জ) সরকারী ব্যয়ের অগ্রাধিকার নিশ্চিতকরন ঃ ইসলামী অর্থব্যবস্থায় সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাপ্ত সম্পদের বন্টনের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। ফকীহগন সরকারী ব্যয়কে অগ্রাধিকার অনুসারে তিন শ্রেনিতে বিভক্ত করেছেন। যেমন-

i) অপরিহার্য
ii) প্রয়োজনীয়তা
iii) প্রশংসনীয়

প্রক্ষ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও ফকীহ্ ইমাম ক্ষতিবী অপরিহার্যকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন-

i) ধর্ম
ii) নিজ জীবন
iii) পারিবারিক
iv) সম্পদ
v) বুদ্ধিবৃত্তি বা জ্ঞান।

ইমাম গাজ্জালী ও ইমাম আমাদিসহ অনেক খ্যাতনামা ইসলামী ফকীহ্রা উক্ত পাঁচটি বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিশ্চয়তা প্রদানের ব্যাপারে একমত।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রের কার্যক্রম ঃ

আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারী আয়ের উৎস ও ব্যয়ের খাতের প্রকৃতি ও পরিধি নির্ধারিত হবে রাষ্ট্রকে কি কি কাজ সম্পন্ন করতে হবে সে সকল বিষয় নির্ধারন করে তার পরে। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকি (১৯৯২) এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের তিন ধরনের কার্যক্রমের ব্যাপারে মতামত প্রদান করেছেন। উক্ত বিষয়গুলো হলো ঃ

i) শরীয়াহ্ দ্বারা স্থায়ী ভাবে নির্ধারিত কার্যক্রম।

ii) শরীয়াহর ভিত্তিতে ইজতিহাদের মাধ্যমে নির্ধারিত বর্তমান পেক্ষাপটে রাষ্ট্রের করনীয় কার্যক্রম এবং

iii) জনগন কর্তৃক শুরার মাধ্যমে রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত যে কোন সময়ে ও যে কোন স্থানে পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য।

প্রথম প্রকারের কার্যক্রম সরাসরি আল-কুরআন ও সুন্নাহ হতে উৎসারিত। এগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের স্থায়ী দায়-দায়িত্ব। এসবের মধ্যে যেসব কার্যক্রম থাকবে তার মধ্যে প্রতিরক্ষা ও শান্তি-শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার বিষয় বিশেষ ভাবে গুরুত্ব পাবে।

দ্বিতীয় প্রকারের কাজের মধ্যে ঐ সব কাজ রয়েছে যেগুলো সরাসরি আল-কুরআন ও সুন্নাহ হতে প্রাপ্ত নয়। তবে ইজমা ও ইজতেহাদের ভিত্তিতে গৃহিত। এসব কাজ প্রথম পর্যায়ের যে সব কাজ রয়েছে সে গুলি বাস্তবায়নের স্বার্থেই জরুরী। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যক্রম সময় ও স্থানের উপর নির্ভরশীল। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ সংরক্ষনও বৈজ্ঞানিক গবেষনা ও এর আওতা ভূক্ত হতে পারে।

যে সকল কার্যক্রম উপরে বর্নিত দু'ধরণের কার্যক্রমের মধ্যে পড়েনা অথচ জনগনের কাছে এর প্রয়োজনীয়তা এবং চাহিদা রয়েছে সেসব কাজই হল তৃতীয় প্রকারের অর্ন্তভূক্ত। তবে এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শর্ত হলো এ ধরনের কার্য সম্পাদন করতে হলে তা অবশ্যই গনতান্ত্রিক উপায়ে অর্থাৎ পারস্পারিক পরামর্শের ভিত্তিতে সে সম্পর্কে গৃহীত হতে হবে। জনস্বার্থে বিদ্যুৎ সরবরাহ, খারাজ বা কর আদায় ইত্যাদি ধরনের সিদ্ধান্ত এ বিষয়ের আওতাভূক্ত হতে পারে।

আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রথম ধরনের কার্যক্রম যেহেতু সরাসরি আর-কুরআন ও সুন্নাহ হতে উদ্ভূত সেহেতু এবিষয়ে অন্য কোন

Dhaka University Institutional Repository

মতামত প্রদান করা নিঃপ্রয়োজন। এমনকি দ্বিতীয় ধরনের কার্যক্রম যা ইজমা এবং ইজতিহাদ হতে উদ্ভূত সেগুলো সম্পর্কেও কোন ধরনের মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই। তবে তৃতীয় প্রকারের কার্যক্রম এর উপর আলোচনা-সমালোচনা রয়েছে। উদাহরনস্বরূপ কা'ফের (১৯৮৩) মতে ইসলামী রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রাধিকার নির্ধারনের ক্ষেত্রে অবশ্যই অতি স্বাধীন নয়, এমনকি সরকার ব্যয়ের ক্ষেত্রে এমন ধরন বা প্রকৃতিও নির্ধারণ করতে পারে না যা ব্যক্তিকে আল্লাহ প্রদত্ত স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করা হতে বঞ্চিত করতে বা বিরত রাখতে পারে। তিনি বলেন, "রাষ্ট্র বা ব্যক্তি যে কারো কোন ধরনের আগ্রাসন হতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংরক্ষনের ক্ষেত্রে আল-কুরআন ও সুন্নাহতে পরিস্কার এবং জোরালো বক্তব্য রয়েছে।

কা'ফ আল-কুরআন ও হাদীসের নির্দেশাবলী তাঁর নিজের বুদ্ধিভিত্তিক বিশ্লেষন করেছেন। তাঁর বিচারে তিনি হয়ত সঠিক হতেই পারেন। পক্ষান্তরে সিদ্দিকী যে মতামত দিয়েছেন তার পিছনেও ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলী হতে সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে আবু ইউসুফের কিতাব আল খারাজ হতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে আবু ইউসুফ তাঁর সময়ের শাসনকর্তাকে পুরাতন খাল সংস্কার এবং ভূমি পুনরুদ্ধারের মতো সুনিদিষ্ট কিছু কর্মসূচী গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। কেননা সে সময়ের জনগণ চেয়েছিল সরকার এ সব পদক্ষেপ গ্রহণ করুক। তাতে তাদের কল্যাণ হবে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাক ইসলামী যুগের অর্থ ব্যবস্থা ঃ

ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব প্রচার ও প্রসার শুরু হয় আরব দেশ হতেই। এ কারণে ইসলামী অর্থনীতিকে ভাল ভাবে জানতে ও বুঝতে হলে আরবদেশের প্রাচীন অর্থনীতি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারনা থাকা দরকার।

প্রাচীন আরবদেশের অর্থনীতির কথা জানতে হলে প্রথমেই আসে মক্কার অর্থনৈতিক অবস্থার কথা। কারণ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আরবের এই মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। এখান থেকেই ইসলামের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

মক্কার কুরাইশ বংশের পূর্ব পুরুষ কুসাই বিন কিলাব কুরাইশ সম্প্রদায়কে একত্রিত করে মক্কায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। এ সময় থেকে তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং নেতৃত্ব দেয়ার মনোভাব গড়ে উঠে।

মক্কার অর্থনৈতিক অবস্থা

কৃষি ঃ

চাষাবাদের জন্য মক্কার জমি ছিল সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। চারিদিক ছিল ধূসর বালু প্রন্তর মাঝে মাঝে দেখা যেত কংকর পাথরের বিরাট বিরাট পাহাড়। কোন বন জঙ্গল সেখানে ছিল না, ফসল ফলানো ছিল খুবই দূরহ ব্যাপার।

শিল্প ঃ

ইসলাম ধর্ম আবির্ভাব হওয়ার পূর্বে মক্কায় তেমন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিলনা। কাচাঁমালের অভাব সব সময়ই ছিল। যে কারণে তেমন কোন শিল্প কারখানা গড়ে উঠা সম্ভব হয়নি। তবে সেখানে উট, দুম্বা, ভেড়া-বকরীর চামড়া পাওয়া যেত প্রচুর। এ কারণে দুই/একটি চামড়া তৈরীর কারখানা গড়ে উঠেছিল। মক্কার বনিকরা এ সকল চামড়া বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতো। আবার তারা বিভিন্ন দেশের রাজা-বাদশাকে এ

Dhaka University Institutional Repository

সকল শিল্প জাত দ্রব্য উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করতো। এছাড়া মক্কার দু'এক যায়গায় আরো কিছু ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠেছিল, ইতিহাসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীস গ্রন্থেও সেগুলোর উল্লেখ আছে। যেমন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর ভৃত্য রাফে বলেন- "আমি যমযম কুপের নিকটস্থ ঘরে বসে পেয়ালা তৈরী করতাম।" এছাড়া কোন কোন স্থানে তরবারি তৈরীর কারখানা তৈরী হয়েছিল। তবে তারা ভারতীয় উপমহাদেশ থেকেই বেশী তরবারি আমদানী করতো। আবার বিদেশ থেকে আমদানী করা কাপড় দিয়ে নিজেদের ব্যবহৃত পোশাক তৈরীর ব্যবস্থা নিজেরাই করতো।

ব্যবসা-বাণিজ্য ঃ

আল্লাহ তা'আলা মক্কা-কে "ক্ষেত বিহীন" উপত্যকা বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এখানে কোন চাষাবাদ হত না। তাই ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিল প্রধান আয়ের উৎস। মক্কার বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ প্রতিবছর দু'বার বাণিজ্য সফর করে প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র এবং দ্রব্যাদি নিয়ে আসতো। এ থেকে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করতো। কুরাইশ সর্দার আব্দুল হাশিম সর্ব প্রথম বছরের শীত ও গ্রীষ্ম কালে দুটি ব্যবসায়ী সফর করার প্রথা চালু করেন। সিরিয়া এবং ইয়েমেনেই ছিল তাঁদের প্রধান বাণিজ্যের স্থান। শীত মৌসুমে সিরিয়ায় অত্যাধিক ঠান্ডা পড়তো এজন্য এ সময় ইয়েমেনে সফর করতো এবং গ্রীষ্ম মৌসুমে সিরিয়া সফর করতো।

মক্কা বাসীদের অর্থনৈতিক জীবনে এ'দুটি বাণিজ্য সফর ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কুরআন শরীফে সূরা আল কুরাইশ-এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে- রিহ্লাতাস শীতায়ে ওয়াস্ সারফ শীত মৌসুমের সফর এবং গ্রীষ্ম মৌসুমের সফর। এছাড়া অন্যান্য স্থানে মক্কাবাসীরা সফর করত। যেমন বর্ণিত আছে যে, কোন এক সময় কুরাইশ সম্প্রদায়ের মধ্যে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, এ সময় হাশিম ব্যবসার উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিনে গমন করেন। সেখান থেকে তিনি প্রচুর পরিমান আটা নিয়ে আসেন। এর দ্বারা রুটি তৈরী করে এবং অনেক গুলো উট জবেহ্ করে সেগুলোর মাংস দিয়ে রুটির সমন্বয়ে খাবার তৈরী করে তাঁর সম্প্রদায়ের লোককে আহার করান। এভাবে ধীরে ধীরে মক্কায় বাণিজ্য সফরের প্রথা চালু হয়। এর ফলে কুরাইশদের অবস্থা সচ্ছল হয়ে উঠে।

Dhaka University Institutional Repository

কুরাইশ বংশের শুধু পুরুষরাই ব্যবসার সাথে জড়িত নয়, স্ত্রীলোকেরাও ব্যবসায় অংশ নিত। ইসলাম আগমনের পূর্বে হযরত খাদীজা (রাঃ) বিশিষ্ট্য ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি সরাসরি নিজে ব্যবসায় অংশ গ্রহণ করতেন না, অন্যের দ্বারা পরিচালনা করাতেন এবং সেজন্য একটা নির্দিষ্ট অংশ প্রদান করতেন। কুরাইশগন ছিলেন জাত বণিক। কুরাইশ শব্দের অর্থই হচ্ছে বণিক। গ্রীক ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ স্ট্রাবো বলেন-আরবের মানুষের পেশা ছিল দু'টি। প্রথমত ঃ ব্যবসা, দ্বিতীয়ত ঃ দালাল। মনে হয় এ কারণেই মক্কার মুহাজিররা মদিনায় আগমন করে প্রথমেই তারা জানতে চায় বাজার কোথায়। আমাদের প্রিয় নবী রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর নবুয়ত লাভের অনেক পূর্বেই সত্যবাদি ও বিশ্বস্ত ছিলেন। সকলেই তাঁর বিশ্বস্ততার কথা জানতেন। এ কারণে তিনি আল-আমিন উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। বিবি খাদিজা (রাঃ) কাণে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি হযরত রাসূলুল্লাহ (সঃ) কে তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার প্রস্তাব দেন এবং বলেন যে, আমি এতোদিন পর্যন্ত অন্য লোককে যে মুনাফা দিয়েছি, আপনাকে তার চেয়ে বেশী মুনাফা প্রদান করবো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) খাদিজার সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তাঁর পণ্য সামগ্রী নিয়ে সিরিয়ায় গমণ করেন। সেখানে উহা বিক্রি করে অন্য পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে নিয়ে আসেন। এসব বিক্রি করে প্রায় দ্বিগুন মুনাফা অর্জন করেন।

আবু জাহেলের মা সুগন্ধির ব্যবসা করতো। মোট কথা মক্কায় বাণিজ্য কাফেলা গুলো বিরাট মূল্যের বাণিজ্য সামগ্রী নিয়ে দেশ বিদেশে সফর করতো। মরুর জাহাজ খ্যাত উষ্ট্র বাহিত দ্রব্য সম্ভারের মধ্যে ছিল- সংস্কারকৃত চামড়া, বিভিন্ন ধাতু, সুগন্ধি, কাঠ, কাপড় ইত্যাদি। এ সকল সামগ্রী দীর্ঘ সময়েও পঁচে নষ্ট হয় না। ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া পশু পালন ছিল মক্কাবাসীদের সাধারণ পেশা। তারা উট, দুম্বা, ভেড়া, বকরী পালন করতো। এদ্বারা তারা লাভবান হত। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) তাঁর বাল্য জীবনে বকরী চরাতেন। হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) এবং হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) তীর নির্মাণ করতেন। আমর বিন আল আস ছিলেন কসাই। রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর নিকট যিনি কাবা ঘরের চাবি ন্যাস্ত করেছিলেন সেই উসমান বিন তালহাও দরজির কাজ করতেন। আবু সুফিয়ান বিন হরব তৈল এবং চামড়া বিক্রি করতেন। আবু জাহেলের ভাই আস বিন হিশাম ছিলেন কামার। ওয়ালিদ বিন মুগীরাও একজন কামার ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

উক্‌বা বিন আবি মুয়ীত ছিলো মদ বিক্রেতা। আবদুল্লাহ্ বিন জাদআন চতুষ্পদ জন্তু খরিদ করে পালন করতেন এবং সেগুলোর বাচ্চা বিক্রি করতেন। আমর বিন আসের পিতা আস বিন ওয়ামেল ঘোড়া এবং উটের চিকিৎসা করতেন। আব্বাস বিন আব্দুল মোত্তালিব ইয়ামেন থেকে সুগন্ধি আমদানী করে হজ্জের মৌসুমে তা মক্কায় বিক্রি করতেন।

সুতরাং দেখা যায় যে, অন্যান্য শহরের ন্যায় মক্কা শহরেও কম বেশী প্রায় সব শ্রেণীর পেশাদার লোক ছিল।

ইসলাম পূর্বযুগে মক্কাবাসীরা আরও একটি উপায়ে অর্থ উপার্জন করত তাহলো জঘন্যতম সুদী কারবার। তারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ প্রদান করত। যখন পরিশোধ করার সময় হত তখন ঋণ দাতা ঋণ গ্রহীতার নিকট মূল ঋণ এবং সুদ তলব করত। ঋণ গ্রহীতা ঋণ শোধ করতে না পারলে ঋণের পরিমাণ দ্বিগুন করা হত। বিশিষ্ট তাফসীর কারক তাবারী তাঁর তাফসীরে ইসলাম পূর্ব যুগে প্রচলীত সুদী কারবারের বিষয়টি যে ভাবে বর্ণনা করেছেন তা হল-"জাহিলিয়া যুগে সুদী ব্যবসার যে পদ্ধতি চালু ছিল তা হলো, কেউ কাউকে কিছু ঋণ দিলে যখন পরিশোধের সময় হত তখন ঋণ গ্রহীতার সামর্থ থাকলে সে ঋণ পরিশোধ করে দিতো। অন্যথায় ঋণ পরিশোধের সময়টা আরো এক বছর পিছিয়ে নিত। এমতাবস্থায় মূল ঋণের পরিমাণ এক বছরে উটনী হলে ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতার নিকট দুবছরের উটনী তলব করত। এরপরও ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে তৃতীয় বছর ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতার নিকট তিন বছরের উটনী তলব করতো। এভাবে চতুর্থ বছরে চার বছরের উটনী তলব করা হত। ঋণ আদায়ের সময় বর্ধিত করার সাথে সাথে মূল ঋণের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতে থাকত।" মুদ্রার ক্ষেত্রে একই নিয়ম প্রচলিত ছিল।

জাহিলিয়াতের যুগে মক্কার অনেক লোকই সুদী কারবার করত। তম্মধ্যে হযরত আব্বাস, হযরত উসমান এবং খালিদ বিন ওয়ালীদ ছিলেন প্রথম শ্রেণীর সুদী কারবারী। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর যখন সুদ হারাম ঘোষণা করা হয় তখন তারা এ সুদী কারবার সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করে দেন।

Dhaka University Institutional Repository

তাদের এই কারবার শুধু মক্কা নগরীতেই সীমাবদ্ধ ছিলনা বরং তা দূর-দূরান্তের অঞ্চল গুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদের কাছ থেকে তায়েফবাসীরাও সুদী ঋণ গ্রহণ করতো। ইসলামের আবির্ভাবের পরও মানুষের নিকট তাদের বিরাট পরিমাণ সুদ পাওনা ছিল। কিন্তু সেই সুদ পাওনা বাতিল হয়ে যায়।

যদিও তৎকালীন সময়ে সুদের ব্যবসা রমরমা ছিল, তার পরেও আরববাসী সুদকে সুনজরে দেখতো না। সুদের মাধ্যমে অর্জিত অর্থকে না-পাক মনে করা হত। তারীখে তাবারীতে এব্যপারে বর্ণনা পাওয়া যায়-আবু ওহাব কুরাইশদের বলেন যে, নারী ব্যবসায়ে অর্জিত অর্থ, সুদের অর্থ কিংবা জুলুমের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ নয় বরং শুধু তোমাদের বৈধ পন্থায় অর্জিত অর্থই কাবা-নির্মাণের কাজে ব্যয় কর।

মক্কাবাসীরা উপরোক্ত পন্থা ব্যতিরেকে আরো যে সকল পন্থায় আয় করত তা হলো প্রতি বছর কুরাইশদের কাছ থেকে কিছু সেবা মূলক চাঁদা, যা দ্বারা কাবাঘর তাওয়াফকারীদের জন্য খাদ্য পানীয় এবং আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হত। আবার অন্যকোন এলাকা থেকে মালামাল আমদানী করা হলে তার উপর কর ধার্য্য করা হত। আমদানী কর আদায় করার নিয়ম সাধারণত আববের অন্যান্য শহরেও প্রচলিত ছিল এবং এর পরিমাণ ছিল আমদানীকৃত মালের দশ ভাগের এক ভাগ। আবার যারা বাজারে কেনাকাটা করতে আসতো তাদের কাছ থেকেও কিছু খাজনা আদায় হত যা তৎকালীন সময়ে 'মকস' নামে পরিচিত ছিল। আরবের গোত্র সরদারদের তেমন কোন নির্দিষ্ট আয়-আমদানী ছিলনা। তবে গোত্রের লোকজনের বিভিন্ন আয় থেকে তারা একটা অংশ গ্রহণ করতো। যেমন-গনিমতের মালের একটা অংশ তারা গ্রহণ করতো।

অতএব, উপরোক্ত আলোচনা থেকে যানা যায় ইসলাম পূর্ব যুগে মক্কার অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিলনা। হাসিম কুরাইশ বংশের এবং উহার আসে-পাশের জন সাধারণের ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়।

Dhaka University Institutional Repository

মদিনার অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ

হযরত রাসূলে করিম (সঃ) যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন সেখানে কয়েকটি মহল্লা এবং দুই একটি বাজার ছিল যা অতি প্রাচীন যুগে গড়ে উঠেছিল। তখন এস্থানটি ইয়াসরিব নামে বেশ পরিচিত ছিল। এখানের আদি বাসিন্দা ছিল-বনু মাসেলা যাউরা ইত্যাদি। পরবর্তী যুগে ইয়েমেন থেকে এসে মদীনায় বসতি স্থাপন করে।

অনেক পূর্ব থেকেই মদিনা বাসীরা কৃষিকর্মে পারদর্শী ছিল। একারণেই মদীনাকে বলা হত কৃষাণদের শহর। মদীনার কৃষকরা যে সব কৃষি উৎপাদন করতো তার মধ্যে খেজুর ছিল প্রসিদ্ধ। মদীনা এবং এর আসে-পাশের এলাকায় প্রচুর পরিমাণ খেজুর উৎপাদন হত। মদীনাবাসী এখেজুর খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতো। তাছাড়া খেজুর বিক্রি করেও প্রচুর অর্থ উৎপাদন করতো। খেজুর বাগান ছাড়াও যব ও গমের ক্ষেত ও ছিল প্রচুর। এছাড়া সেখানে অন্যান্য খামারের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল আঙ্গুর বাগান। তাছাড়া আনজির, আনার সহ নানা ধরনের ফল-ফসল জন্মাত।

বিশিষ্ট ভূগোলবিদ ইয়াকুত (মৃত্যু ৬২৩ হিঃ) মদীনার নিকটবর্তী "সোরাকিয়া" অঞ্চল সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে সেখানে অনেকগুলো কৃষিক্ষেত, খেজুর বাগান এবং বাগ-বাগিচা ছিল। যেগুলোতে আনজির, আঙ্গুর, আনার প্রভৃতি ফল জন্মাত।

তবে সেখানকার খাদ্য উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল, যে কারণে অন্য দেশ থেকে খাদ্য সামগ্রী আমদানী করা হত। তখনকার সময় মদীনায় কিছু কিছু ক্ষুদ্র শিল্প ছিল। মদীনাবাসী চেষ্টা করতো তাদের প্রয়োজনীয় কাপড় নিজেরাই তৈরী করতে, তবে অত্যাধুনিক কোন বুনন শিল্প ছিলনা বলে উন্নত মানের কোন কাপড় তৈরী করা সম্ভব ছিলনা।

মদীনার অনেক স্থানেই তরবারী তৈরীর কারখানা ছিল। জীবনের নিরাপত্তার জন্য প্রায় সকল মানুষই সব সময়ই একটা তরবারী সাথে রাখতো। যে কারণে তাদের তরবারীর

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয়তা ছিল বেশী। তাই মদীনাবাসী চেষ্টা করতো নিজের খুশিমত তরবারী তৈরী করতে।

কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র তৈরী করার কাজও মদীনাবাসীরা জানতো। তৎকালীন সময়ে সেখানে ঝাউগাছ হত। এ গাছ থেকে তারা ঘরের ব্যবহারের জন্য কিছু কিছু আসবাবপত্র তৈরী করতো।

কৃষি কাজের পরে যে সকল পন্থায় মদীনাবাসীরা অর্থ উপার্জন করতো তাহলো ব্যাবসা-বাণিজ্য। মক্কা বাসীদের মত তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ততো উল্লেখযোগ্য ছিল না। ক্রয় ও বিক্রয়ের জন্য মদীনায় কায়নুকা বাজারটি ছিল সবচেয়ে বড়। বাজারেই লোকজন জিনিসপত্র বেঁচা-কেনা করতো।

আব্দুর রহমান বিন আউফ মদীনায় হিজরত করার পর জনৈক আনসারীকে জিজ্ঞেস করেছিলেন-তোমাদের বাজার কোথায়? তিনি উত্তরে তাকে কায়নুকা নামক বাজারের কথা বলেছিলেন। অতঃপর আব্দুর রহমান সে বাজারে গেলেন এবং ঘুরে ফিরে দেখলেন। তিনি বাজার থেকে কিছু পনির ও ঘি নিয়ে আসলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং নিজেও বনু কায়নুকা বাজারে গিয়েছিলেন।

ইসলাম পূর্ব যুগে মদীনাবাসী বিভিন্ন ধরণের মদ তৈরী করত। যেহেতু মদীনায় বিভিন্ন ধরণের ফলমূল ও ফসলাদি উৎপাদন হত। সে সব দিয়েই তারা মদ তৈরী করতো। আঙ্গুর, খেজুর, গম, যব, মধু এই পাঁচ প্রকারের জিনিস দিয়েই সাধারণত তারা মদ তৈরী করতো। এ সকল মদ তারা বিভিন্ন আনন্দ উৎসবে পান করতো। প্রায় সব শ্রেণীর লোকেরাই মদ পান করতো। যারা নিজেরা তৈরী করতে পারতো না তারা ক্রয় করে নিত। মদ তৈরী করে বিক্রির ব্যবসা ছিল মদীনা বাসীদের জন্য একটা রমরমা ব্যবসা। মদীনার বাইরেও তারা উহা বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতো।

Dhaka University Institutional Repository

মদীনায় "ফজীহ" নামক খেজুরী মদ ব্যাপক পরিমাণে তৈরী হত। হযরত আনাস বিন মালিক বলেন-সে সময়ে কাঁচা পাকা খেজুর দিয়েই মদ তৈরী হত। তিনি আরো বলেন-আমি একটি কবিলার কাছে দাড়িয়ে আমার চাচাদের কাঁচা-পাকা খেজুর থেকে তৈরী করা মদ খাওয়াচ্ছিলাম এবং আমিই ছিলাম সেখানে সর্ব কনিষ্ট। হঠাৎ খবর এলো মদ হারাম করা হয়েছে। তখন ওরা আমাকে বললেন, "এই মদ ফেলে দে" আমি তা ফেলে দিলাম।

অন্য এক বর্ণনায় আছে হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি আবু তালহার ঘরে ছিলাম। ঐ যুগে লোকেরা "ফরবীহ" মদ ব্যবহার করতো। রাসূলুল্লাহ (সঃ) জনৈক ঘোষণাকারীকে নির্দেশ দিলেন যে, প্রচার করে দাও-মদ অবৈধ হয়েছে। তখন আবু তালহা আমাকে বললেন-যাও, ঐ মদের পাত্রটি ফেলে দাও, আমি সেটাকে বাইরে নিয়ে ফেলে দিলাম। হযরত আনাস আরো বলেন যে, ঐ দিন মদীনার অলিগলিতে মদের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল।

মদীনায় যেহেতু বিভিন্ন ধরণের কৃষি উৎপাদন হত সেহেতু সেখানে বিভিন্ন ধরণের পশু পালন সহজ ছিল। এ সকল পশুর মধ্যে ছিল উট, বকরী, ঘোড়া, গাধা, মেষ, দুম্বা ইত্যাদি। এগুলো থেকে মদিনাবাসি বিভিন্ন ভাবে লাভবান হত। কোন কোন পশুর মাংস ভক্ষণ করতো আবার কোন কোন পশুর দুধ পান করত। কোন কোন পশু মালামাল বহন এবং নিজেদের চলাচলের জন্যও ব্যবহার করত। তবে এ সকল পশু বিক্রি করেও তারা অনেক অর্থ উপার্জন করত।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইহুদীদের আধিপত্য ছিল বেশী। হাদীস অধ্যয়নে একথা জানা যায় যে, মদীনার বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্যগুলো ইহুদীদের করায়ত্ত্বে ছিল। এমনকি, প্রয়োজন দেখা দেয়ায় খোদ রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও একবার তাঁর নিজের বর্মটি ইহুদীদের কাছে বন্ধক রেখেছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শুধু মদীনায়ই নয় বরং কোন কোন ইহুদীর ব্যবসা গোটা হিজাজ প্রদেশে বিস্তৃত ছিল। মদীনার আবু রাফে নামক জনৈক ইহুদীকে হিজাজের শ্রেষ্ঠ বণিক উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।

সিরিয়া ছিল মদীনার নিকটবর্তী অঞ্চল। তাই মদীনায় যে সকল বাণিজ্য কাফেলা আসত তার অধিকাংশ প্রায় সিরিয়া থেকেই আসত। তারা সিরিয়া থেকে লাভ জনক পণ্য সামগ্রী মদীনায় এনে বিক্রি করতো। আবার যে সকল পণ্য সামগ্রী ও ব্যবহার্য্য জিনিস পত্র মদীনায় তুলনামূলক ভাবে কম দামে পাওয়া যেত উহা তারা সিরিয়ায় নিয়ে যেত।

তৎকালীন সময়ে অন্যান্য শহরের তুলনায় মদীনা ছিল ঘনবসতি শহর। প্রায় দশ হাজার অধিবাসী সেখানে বসবাস করত। এ ধরণের বসবাস যোগ্য একটি শহরে যত ধরণের পেশার লোক থাকতে পারে, মদীনায়ও তাই ছিল । যে লোক যে পেশাকে সহজ এবং লাভ জনক মনে করত সেইলোক সে ধরণের পেশা গ্রহণ করতো। আবার কোন কোন লোক গোত্রীয় ধারা তথা বাপ-দাদার পেশাকেও গ্রহণ করত। যেহেতু মদীনায় প্রচুর পরিমাণ ও বিভিন্ন ধরনের পশু পালন হত। তাই অনেক লোকই কসাইর কাজ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত। আবার কোন কোন লোক কাঠ মিস্ত্রীর কাজ করে আয় রোজগার করত। কেহবা দরজীর কাজ করত। স্বর্ণকার, কামার প্রভৃতি পেশার লোকও তৎকালিন সময়ে মদীনায় ছিল।

ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর হাদীস গ্রন্থে তখনকার সময়ে মদীনায় যে সমস্ত পেশা ছিল সেগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বর্ণনা করেছেন যে, তখন মদীনায় কসাই, মিস্ত্রী, দরজী, স্বর্ণকার, কামার প্রভৃতি পেশার লোক ছিল।

আরও একটা ব্যবসা মদীনায় বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছির। তাহল সর্বনাসা সূদের ব্যবসা। বিশেষ করে ইহুদি পূঁজিপতিরা সেখানকার চাষীদের মধ্যে সুদী ঋণ বিতরণ করতো। ব্যবসার জন্যও কোন কোন লোক সুদের উপর ঋণ গ্রহণ করতো। হযরত সাদ বিন ওছাবা তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছিলেন যে, আমি যখন মদীনায় গেলাম তখন আব্দুল্লা বিন সালেমের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি বলেন, তোমরা এখন এমন একদেশে বসবাস করছ যেখানে সুদের বহুল প্রচলণ রয়েছে-[১]

১। সহীহ বুখারী শরীফ

Dhaka University Institutional Repository

তায়েফের অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ

ইসলাম পূর্বযুগে তায়েফবাসীদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল কৃষি। মক্কা-মদীনার চেয়েও তায়েফের জমি ফসল উৎপাদনের জন্য বেশী উর্বর ছিল। সে কারণে চাষাবাদ করণে সহজেই অনেক ফসল ফলানো সম্ভব ছিল। আঙ্গুর, খেজুর ইত্যাদি ধরনের ফল বেশী ফলত তাছাড়া যব, গম এসকল খাদ্য তায়েফবাসীরা প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করত। তবে এসকল খাদ্য সামগ্রী তায়েফের আদি বাসিন্দা বনু আমির গোত্রের লোকেরা ফলাতে পারদর্শী ছিলো না। বরং তায়েফের আশে পাশের অধিবাসী বনু সাকিব গোত্রের লোকেরাই কৃষি কাজে বেশী পারদর্শী ছিল। তায়েফবাসীরা বেশী পছন্দ করতো দুগ্ধজাত পশু পালন করা।

তায়েফবাসীরা আশেপাশের উপত্যকাগুলোতে উৎপাদিত প্রচুর ফল-ফসল বাইরে রফতানি করে অনেক অর্থ উপার্জন করত। যে সকল ফল-ফসল তারা দেশের বাইরে পাঠাতো তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল আঙ্গুর, খেজুর, গম, মনাক্কা ইত্যাদি। তায়েফের কাঠও ছিল রফতানির ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাদের জন্য রফতানির ক্ষেত্রে মক্কা ছিল বেশী পরিচিত। এখানেই তারা বেশ ফল-ফসল পাঠিয়ে বেশী অর্থ উপার্জন করত।

তৎকালিন সময়ে অন্যান্য শহরের মত তায়েফেও বেশ কিছু শিল্প কারখানা ছিল। সেখানে অনেকগুলো চামড়া সংস্কারের কারখানা (Tannery) ছিল। তবে এর ফলে সেখানকার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পড়েছিল। বিখ্যাত ভৌগোলিক আল হামদানী (মৃত্যু ৯৪৫ খৃঃ মোতাবেক হিঃ ৩৩৪) লিখেছেন, তায়েফ হচ্ছে জাহিলিয়া যুগের একটি বিখ্যাত নগরী। একে "বুলদুদ দাব্বাগ বা চামড়া সংস্কারের শহর বলা হত।" কৃষি, বাণিজ্য এবং শিল্পের পাশাপাশি অন্যান্য পেশারও অস্তিত্ব তায়েফে ছিল লৌহজাত সামগ্রী তৈরীর জন্য সেখানে বেশ কয়েজন কর্মকারের বসবাস ছিল। আবার স্বর্ণের জিনিস তৈরীর জন্য স্বর্ণকারের বসবাসও ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

তায়েফে অন্যান্য পেশাদার লোকদের সাথে চিকিৎসকেরও বসবাস ছিল। যখন নবী করীম (সঃ) নবুয়্যাত ঘোষণা করেন তখন বনু আমির গোত্রের জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেকে আরবের সর্ব শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলে দাবি করেন। তায়েফে আঙ্গুর ফলের প্রাচুর্য ছিল তাই সেখানে মদ তৈরী এবং ব্যবসা ছিল জমজমাট। সেখানে বেশ কয়েকটি মদ্যশালারও পত্তন হয়।

মক্কা মদীনার মত তায়েফবাসীরাও সূদের ব্যবসা করত। ঐতিহাসিক বালাযুরীর মতে, তায়েফের সূদী ব্যবসাই ছিল সেখানকার কোন না কোন লোকের একমাত্র পেশা। তাদের এই সূদী ব্যবসা শুধু তায়েফ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিলনা। মক্কা বাসীদেরকেও তারা সুদী ঋণ দিত। তারা মূলধনের সুদ নগদ অর্থে অথবা অন্য কোন বস্তুর বা জিনিসপত্রের মাধ্যমে আয় করতো।

তাফসীরে তাবারীতে আছে, সাকীফ সম্প্রদায়ের লোকেরা কুরাইশের একটি শাখা গোত্র বনু মুগীরাকে ঋণ দিত। ঋণ পরিশোধের সময় উপস্থিত হলে বনু মুগীরার লোকেরা বলত, আমরা সুদের পরিমাণ আরো কিছু বাড়িয়ে দেব, তোমরা আমাদের আরো কিছু সময় দাও। তায়েফের অধিবাসীরা অত্যাধিক সুদখোর ছিল বলেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের সাথে যে চুক্তি করেন তাতে সুদ গ্রহণ না করার কথাও লিপিবদ্ধ ছিল। বিত্তহীন লোকদেকে সুদখোরদের কবল থেকে রেহাই দেয়ার উদ্দেশ্যেই রাসূল (সঃ) এরূপ করেছিলেন। উক্ত চুক্তিতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) কেন এরূপ করেছিলেন সে সম্পর্কে বালাযুরী বলেন, সুদ এবং মদ্য পানের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ঐ সমস্ত লোকেরা যারপরোনাই সুদ খোর ছিল।[১]

১। ফুতুহুল বুলদান, বালাযুরী, পাতা নং-৫৬

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের প্রাথমিক যুগে রাষ্ট্রীয় আয় ঃ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে অর্থাৎ রাসূলে করীম (সঃ) এর জীবদ্দশায় রাষ্ট্রীয় আয় ছিল নিম্ন উপায়ে ঃ

১। যাকাত ঃ যাকাতই ছিল সরকারী আয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সে যুগে এই উৎস হতেই আদায় হত সরকারী কোষাগার তথা বায়তুল মাল এর সিংহভাগ অর্থ। আল কুরআনে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে সালাত কায়েম কর এবং যাকাত আদায় কর।[১] আল্লাহ তা'আলার এই নির্দেশকে পুরোপুরি মেনে নিয়েই যাকাত ব্যবস্থা কার্যকর করা হত।

২। খারাজ (ভূমিরাজস্ব) ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে সব পন্থায় রাষ্ট্রীয় ভাবে অর্থ আয় করা হত তার মধ্যে ভূমি রাজস্ব ছিল দ্বিতীয় স্থানে। তৎকালিন সময়ে এই রাজস্বের প্রেক্ষিতে জমিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল-যথা উশরী জমি ও খারাজী জমি। উশরী জমির ক্ষেত্রে করের পরিমাণ ছিল উৎপাদনের ১০% ($\frac{১}{১০}$) অংশ। আর যে জমিতে সেচের মাধ্যমে ফসল ফলানো হত সে ক্ষেত্রে এই পরিমাণ ৫%। যেসব জমিতে উশর আদায় করা হয় না কিন্তু খারাজ আদায় করা হয় সে সব জমিকে খারাজী জমি বলে। আরব দেশের বাইরের জমি যাহা মুসলমানদের যুদ্ধ করে জয় করা হয়েছিল সেসব দেশের জমিও খারাজী জমি বলে পরিচিত ছিল। এসব জমির খাজনার বা ফসলের রাজস্বের কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছিল না।

৩। জিযিয়া কর ঃ জিজিয়া হল বিশেষ ধরণের একটা কর। ইউরোপ মহাদেশের দেশ গুলোতে এধরণের করকে Poll Tax হিসাবে ধরা হয়। ইসলামের প্রাথমিক মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় যে সকল অমুসলিমরা বসবাস করত তাদের উপর যে কর নির্ধারণ করা হত। উহাকে জিযিয়া কর বলা হয়। এই করের বিণিময়ে তারা রাষ্ট্রীয় যাবতীয় সুযোগ সুবিধা এবং নিরাপত্তা ভোগ করতো।

১। সূরা ঃ আল কাক্বারাহ, আয়াত নং-৪৩

Dhaka University Institutional Repository

৪। রাসূলে করীম (সঃ) এর সময়ে রাষ্ট্রীয় আয়ের আর একটি অন্যতম উৎস হল গনীমাহ। গনীমাহ বলতে বুঝায় অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করার পর যখন মুসলিমগণ জয়ী হয় তখন অমুসলিমদের যাবতীয় মালামাল মুসলমানদের হস্তগত হয়। এই সম্পদকেই গনীমাহ বলা হয়। এই সম্পদের ৪/৫ অংশ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হয়। অবশিষ্ট ১/৫ অংশ সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয়।

৫। ফাই (শত্রুসম্পত্তি) ঃ যখন মুসলিমদের সাথে অমুসলিরা যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই ভয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে চলে যায় তখন তাদের সমুদয় মালামাল অনায়াসেই মুসলমানদের হাতে চলে আসে এই সম্পদকে ফাই বলা হয়। এই ধরণের সকল সম্পদই রাষ্ট্রীয় আয়ের অন্যতম উৎস।

৬। বাণিজ্য শুল্ক ঃ ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) এর খিলাফত কালে এই ধরণের শুল্ক প্রথমে আরোপিত হয়। ঐ সময়ে মুসলিম ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন দেশে গমন করতো। তখন কতিপয় দেশ মুসলিম ব্যবসায়ীদের উপর শুল্ক আরোপ করতো। তখন হযরত উমর (রাঃ) পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ থেকে যে অর্থ আয় হত তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হত।

৭। বিভিন্ন ধরণের খনি ও গুপ্তধনের উপর কর ঃ রাসূলে করীম (সঃ) এর সময়ে কিছু কিছু খনিজ সম্পদ এবং গুপ্তধন পাওয়া যেত। এ ধরণের সম্পদের ২০% রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হত।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতিতে হযরত ওমর (রাঃ)-এর অবদান ঃ

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা আমিরুল মু'মিননীন হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে সকল নতুন নতুন ধারা প্রবর্তন করে গেছেন তা শুধু মুসলিম বিশ্বের কাছেই নয় বরং সমগ্র বিশ্ববাসীকে কাছেই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তিনি যে সকল ধারা প্রবর্তন করে গেছেন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল-রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন, রাজস্ব আয়ের উৎস, বায়তুল মালের ব্যবস্থা, ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা, জনহীতকর কার্যাবলিতে অর্থ ব্যয়, ইসলামী মুদ্রার প্রবর্তন প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাজস্ব আয়ের উৎস ঃ

রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন ইসলামের ইতিহাসে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর নতুন কীর্তি। তিনি যুদ্ধের ঝামেলা হতে কিছুটা মুক্ত হয়ে খারাজ ও রাজস্ব ব্যবস্থার দিকে মনোযোগ দেন। এ অবস্থায় প্রথমে তাঁকে অনেক অসুবিধার মোকাবেলা করতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে সে ঝামেলা দূর করে একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে সক্ষম হন।

হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর পূর্বে রাজস্বের উৎস ছিল পাঁচ প্রকার। যথা-যাকাত, জিযিয়া, খারাজ, খুমুস, গনীমত দ্রব্যাদি এবং আল-ফে (রাষ্ট্রীয় ভূমির আয়)। খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) উপরোক্ত কর ছাড়াও কয়েকটি নতুন কর প্রবর্তন করেন।

- খারাজ ঃ রাজস্ব আয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস ছিল খারাজ। হযরত ওমর (রাঃ)-এর আমলে মুসলিম সম্রাজ্য যথেষ্ট বিস্তার লাভ করে। এ সকল বিজিত অঞ্চল হতে যে ভূমি রাজস্ব আদায় করা হয়, তাই ভূমি কর নামে পরিচিত। আর যে সকল অঞ্চল জয় করা হয়েছে সে সকল অঞ্চলের মুসলমানদেরকে ভূসম্পত্তি ক্রয় করতে নিষেধ করা হয়েছিল। কাজেই অমুসলিম কৃষকদেরকেই এ কর দিতে হত। জমির গুনগত মান, উৎপাদনের পরিমাণ, সেচের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি বিষয় যাচাই বাছাই করে ভূমিকরের পরিমাণ নির্ধারণ করা হত। আবার জমির তারতম্য অনুসারেও করের তারতম্য হত।
- যাকাত ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে উট, দুম্বা, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদির উপর যাকাত ধার্য করা হয়। যে কোন সঙ্গতি সম্পন্ন মুসলমান গণের নিকট থেকে এই যাকাত

Dhaka University Institutional Repository

আদায় করা হত। তবে নবী করীম (সঃ)-এর সময়ে ঘোড়ার উপর যাকাত ধরা হয় নাই। কারণ তখন সেখানে ঘোড়ার ব্যবসার প্রচলন ছিল না। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-র খিলাফত কালে ধীরে ধীরে ঘোড়ার ব্যবসা লাভজনক হয়ে উঠে। তাই তিনি ঘোড়ার উপরও যাকাত ধার্য করেন। এতে প্রচুর অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয়।

- জিযিয়া ঃ জিযিয়া হল এক ধরণের কর। মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অসুলিমদের নিকট হতে এ কর আদায় করা হত। এ করের প্রচলন পূর্বেও ছিল। হযরত ওমর (রাঃ)-খলিফা হওয়ার পরে সেই পূর্বের নিয়মে কিছু পরিবর্তন আনেন। রোমান ও পারসিক এর লোকজনের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল। তিনি একথা বিবেচনা করে প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির উপর চার মধ্যবিত্তের লোকদের উটুপর দুই এবং স্বল্প আয়ের লোকদের উপর এক দিরহাম করে কর ধার্য করেন।
- খুমুস ঃ গনীমতের সম্পদের এক পঞ্চমাংশ কে বলা হয় খুমুস। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের পাঁচ ভাগের চার ভাগ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হত। হযরত ওমর (রাঃ) বাকী এক ভাগের অর্থ মুসলিম সৈন্য বাহিনীর সাজ-সরঞ্জামের জন্য ব্যয় করতেন।
- বাণিজ্য শুল্ক ঃ খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) বাণিজ্য শুল্ক নামে একটি নতুন কর প্রবর্তন করেন। এটা ছিল তাঁর সম্পূর্ন রূপে নতুন ধার্য করা কর। ইসলামের প্রাথমিক যুগে বিদেশী বণিকেরা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য মুসলিম দেশে আসলে কিংবা মালামাল আনা-নেয়া করলে কোন প্রকার বাণিজ্য-শুল্ক দিত না। অথচ মুসলমান ব্যবসায়ীরা অন্য দেশে গেলে দশ ভাগ হারে বাণিজ্য শুল্ক দিতে বাধ্য থাকত। এই ব্যাপারটি খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর নিকট বলা হলে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একটি কার্যকরী পদক্ষেপ নেন। তিনি বিদেশী বণিকদের নিকট হতে আমদানী রফতানী পণ্য দ্রব্যের উপর শুল্ক কর ধার্য করেন। তাঁর প্রবর্তিত নীতিমালা হল-অমুসলমানদের (জিম্মিদের) নিকট হতে পণ্য মূল্যের শতকরা পাঁচ ভাগ, মুসলমানদের নিকট থেকে শতকরা আড়াই ভাগ এবং বিদেশীদের নিকট থেকে শতকরা দশ ভাগ শুল্ক আদায় করা হত, এধরণের নতুন কর আদায়ের ফলে রাষ্ট্রের আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

Dhaka University Institutional Repository

খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর ভূমি রাজস্ব ও সংস্কার ব্যবস্থা ঃ

ভূমি রাজস্ব ও সংস্কার ব্যবস্থার প্রবর্তন খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগান্তর সৃষ্টিকারী অবদান ইসলামের ইতিহাসে তাঁর এ অবদান উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় চির ভাস্বর হয়ে আছে। তিনি প্রাচীন শোষণমুক্ত ভূ-স্বত্ব ও জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে ভূমি সর্বাবস্থাতেই স্থানীয় কৃষকদের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) হযরত বেলাল (রাঃ) প্রমূখ সাহাবা জায়গির প্রদানের পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা হযরত ওমর (রাঃ)-এর সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। তাঁর এ বিকল্পাত্মক সংস্কারের দ্বারা কৃষকদের অবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছিল।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে দিন দিন নতুন নতুন এলাকা মুসলমানদের দখলে আসছিল। বিজিত এলাকার জমি দখল নিয়ে সেনা বাহিনী এবং নও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখাদেয়। তখন খলিফা এসকল জমি সেনাবাহিনী বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জায়গির হিসেবে না দিয়ে রাষ্ট্রীয় দখলে এনে কৃষকদের মাঝে ভাগ করেদেন এবং আইন করে দেন যে, মুসলমানগণ কোন অবস্থাতেই ঐ সকল জমির মালিক হতে পারবে না। এমনকি কেউ নগদ মূল্যে কৃষকদের নিকট হতে এ সমস্ত জমি ক্রয় করতেও পারবে না। এখানেই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। যে সমস্ত বিজয়ী মুসলমান ঐ সমস্ত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিল, হযরত ওমর (রাঃ) তাদের জন্য কৃষিকার্য নিষিদ্ধ করে দেন। তাঁর এ ভূমি ব্যবস্থার ফলে কৃষিকাজের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়েছিল। অনেক দিনের অভিজ্ঞ দেশীয় কৃষকরা তাতে দক্ষতার সাথে চাষাবাদ করতে পারত। বিশ্বের ইতিহাসে এ দিক দিয়ে হযরত ওমর (রাঃ) এক নতুন নজীর সৃষ্টি করে গেছেন।

ইসলামী মুদ্রার প্রবর্তন ঃ

খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) এর খিলাফতের পূর্বে আরবে ধনরত্নের তেমন সমাগম ছিল না। কিন্তু তিনি খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পরে আর্থনীতিতে আমুল পরিবর্তন আনেন। তাতে রাজকীয় কোষাগারও ভর্তি হতে থাকে। এতে প্রশ্ন উঠে ধন-রত্ন, টাকা-কড়ি প্রভৃতি মুদ্রাগুলোকি আজীবনই কি বিদেশীদের ছাপ বহন করতে থাকবে? একথা ভেবে-হযরত ওমর

Dhaka University Institutional Repository

(রাঃ) নির্দেশ দেন ইসলামী মুদ্রার প্রচলন করার জন্য। খলিফার এ নির্দেশ মোতাবেক ইসলামী মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। এই মুদ্রার উপর লিখিতহল আলহামদুলিল্লাহ-সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ-আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। ইসলামী মুদ্রার প্রবর্তক হিসেবে খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর নাম চিরদিনের জন্য ইসলামের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হল। পরবর্তী কালে আব্দুল মালেক বিন মারওয়ান (৬৮৫-৭০৫ খৃঃ সনে) ব্যাপকভাবে ইসলামী মুদ্রার প্রচলন করেন।

জনহিতকর কার্যাবলীতে অর্থ ব্যয় ঃ

আমিরুল মু'মিনীন খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) যেমনি ছিলেন ন্যায় বিচারক তেমনি জনহিতকর কার্যাবলী তথা প্রজা সাধারণের নানাবিধ সুবিধার জন্যও অনেক অর্থ ব্যয় করেছেন। তিনি সম্রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের জনহীতকর ও উন্নয়ন মূলক কাজের দিকেও মনোনিবেশ করেছিলেন। এসকল কাজের পিছনে প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন। তাঁর আমলে রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পাদন করার জন্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য সরকারী ভবণ নির্মাণ করেন। বহু মসজিদ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট, সেতু ইত্যাদি জনগণের সুবিধার জন্য তিনি নির্মাণ করেন। ঐতিহাসিক আল্লামা শিবলী নোমানীর বর্ণনা অনুযায়ী একমাত্র ফসতাও শহরেই ৩৬টি মসজিদ, ৮৮৮০টি সড়ক এবং ১১৭০টি স্নানাসার নির্মাণ করেন। খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) জমিতে অধিক ফসল পাওয়ার উদেশ্যে এবং জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্যে অনেকগুলো খালও নির্মাণ করেন। তিনি সবচেয়ে বেশী অর্থ ব্যয়ে যে খাল নির্মাণ করেন তাহলো ইরাকের মাকাল খাল এবং পারস্যের সাদগ খাল বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

শিক্ষাক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় ঃ

আমিরুল মু'মেনীন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) সর্বশেষ জোর দিলেন জনশিক্ষা প্রচার, প্রসার, প্রবর্তন ও প্রচলনের জন্য। তিনি অনুধাবন করলেন। এই দেশ ও জাতিকে এ সমাজও প্রাচীন সভ্যতাকে একমাত্র বাঁচাতে পারে (তাওহীদের ঝান্ডা এবং প্রিয় নবী (সঃ)-এর রিসালাত কায়েম রাখতে)। শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো। এ বিষয়ে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অতি মহৎ এবং উদ্যম ছিল অপরিসীম। তিনি তাঁর সমগ্র রাজ্যে দেশ ও

Dhaka University Institutional Repository

সকল বিজিত রাজ্যে প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জরুরি নির্দেশ দিলেন। এভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো প্রথম স্তর হতে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ স্তরে উন্নীত হয়। সমাজে যাঁরা জ্ঞানে-গুনে, আচারে-বিচারে সর্বজন শ্রদ্ধেয় ছিলেন খলিফা তাঁদের কে শিক্ষক নিযুক্ত করার নির্দেশ দিতেন। তিনি শিক্ষকদের উপহারে বেতন দিতেন। মদীনার শিক্ষকগণ মাসে পনেরো দিরহাম বেতন পেতেন। খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) শিক্ষকদের যে মান-মর্যাদা দিয়েছেন ইসলামের ইতিহাসে আজও তা প্রবাদ স্বরূপ।

Dhaka University Institutional Repository

বায়তুলমাল

বায়তুলমাল শব্দটি আরবী। ইহা সাধারনতঃ রাষ্ট্রীয় কোষাগার অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সরকারের বিভাগীয় কর্মকান্ডের মধ্যেই বায়তুলমাল সীমিত নয় বরং পূঞ্জিকৃত ধন সম্পদকে বুঝানো হয় বায়তুলমাল। ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকেরই ইহা সম্মিলিত মালিকানা সম্পদ। এই জন্য বলা হয়েছে-"বায়তুলমালের সম্পদ মুসলমানদের (ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের) সম্মিলিত সম্পদ।"

রাষ্ট্র প্রধান সরকারী কর্মচারী বা সাধারণ মানুষ। উহার উপর কাহারই একচেটিয়া বিশেষ অধিকার স্বীকৃত হইতে পারে না। বরং সবারই উহাতে সমান অধিকার। নবী করিম (সঃ) এর বাণীতেও একথা ঘোষিত হয়েছে-"আমি তোমাদেরকে দানও করিনা, নিষেধও করি না, আমিতো বন্টনকারীমাত্র। আমাকে যে রূপ আদেশ করা হয়েছে, আমি সে ভাবেই জাতীয় সম্পদ বন্টন করে থাকি।

বায়তুলমালের সূচনা ঃ

উপরোক্ত তথ্য থেকে একথা যানা যায়যে, মদীনা শহরে প্রথম যেদিন ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল-সে দিন থেকেই বায়তুলমালের সূচনা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম পর্যায়ে বায়তুলমালের কোন রূপ ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখা হত না। অবশ্য তার কোন অবকাশও ছিল না। কারণ তখন সাধারণ নাগরিক ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনের তুলনায় আয়ের অবস্থা অত্যন্ত নগন্য ছিল। তাই ধন-সম্পদ হস্তগত হবার সঙ্গে সঙ্গে নবী করীম (সঃ) অভাবী লোকদের মধ্যে তা বন্টন করে দিতেন।

খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) এর খিলাফতকালেই সর্ব প্রথম বায়তুলমাল নিযুক্ত করা হয় হযরত আবু উবাইদাহ (রাঃ)-কে। কিন্তু তখনো জাতীয় প্রয়োজনের তীব্রতা হেতু জমাকৃত সম্পদ অবিলম্বে বন্টন করে দেয়া হত। এ কারণেই হযরত আবু বকর (রাঃ) এর পরে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) দায়িত্ব গ্রহণের পর বায়তুলমালকে একেবারে শূন্য পেয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ওমর (রাঃ) খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পরে বিশিষ্ট সাহাবী ওয়ালিদ বিন হিমাসের পরামর্শে বায়তুলমাল পূর্ণগঠন করে তাকে কেন্দ্রীয় কোষাগারে পরিণত করেন এবং পরবর্তীতে প্রদেশ গুলোতেও একটি করে শাখা কোষাগার প্রতিষ্ঠিত করার হুকুম জারি করেন। সাম্রাজ্যের রাজস্ব সংগৃহীত হয়ে বায়তুলমালে জমা হত। বায়তুলমাল ছিল জনসাধারণের সম্পত্তি। এতে খলিফার কোন অধিকার ছিলনা।

এ প্রসঙ্গে হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন-"আল্লাহর নামে শপথ, এই রাষ্ট্রীয় সম্পদের উপর কেউ অপর কারো অপেক্ষা অধিক অধিকার লাভের দাবী করতে পারে না। আমি নিজেও অপর কারো অপেক্ষা অধিক অধিকারের দাবীদার নই।"

আল্লাহর শপথ, প্রত্যেক মুসলমানের জন্যই এই সম্পদে নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে। আর আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে ছায়রা পর্বতের রাখলে জিন স্থানে পশু চড়াইবার কাজে ব্যস্ত থেকেও এই মাল হতে তার নিজের ন্যায্য অংশ লাভ করতে পারবে।

বস্তুতঃ হযরত ওমর (রাঃ) প্রথমে উদ্ধৃত নবী করিম (সঃ) বানীটুকুর ভিত্তিতেই এ কথা বলেছিলেন এবং তাঁর ন্যায় চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রাঃ) ও তা হতে এই অর্থই বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনিও বলেছিলেন-"জেনে রাখ যে, উহা হতে তোমাদেরকে বাদ দিয়ে বা বঞ্চিত করে একটি পয়সাও গ্রহণ করার অধিকার আমার নেই।

বস্তুতঃ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে সঞ্চিত ধন-সম্পদের উপর প্রতিটা জনগণের সাধারণ অধিকার স্বীকৃত। রাষ্ট্রের অধীন কোন একজন নাগরিক ও যেন মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত না হয় তার ব্যবস্থা করা বায়তুলমালের দায়িত্ব। তবে একথাও কারও ভাবার সুযোগ নেই যে, বায়তুলমাল জনগণকে বেকার বসিয়ে খাওয়াবে। বরং দেশের প্রতিটি জনগণই তার সাধ্যানুযায়ী শ্রম দিয়ে উপার্জন করবে। আবার সমাজের যারা আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল তারা তাদের নিকটাত্মীয় পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে যারা দরিদ্র, অসহায় তাদের প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে আসবে। তারপরও যদি কেহ তার মৌলিক চাহিদা পূরণে অসমর্থ

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে পরে তবে তা পরিপূরনের দায়িত্ব হবে বায়তুলমালের। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় ইহাই হল নাগরিকদের জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা।

সাধারন মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব পালন মূলতঃ জনগনের সেই কল্যাণ-কামনার অন্তর্ভূক্ত যাহা ইসলামের দিকদিয়ে রাষ্ট্রনায়কের প্রধান দায়িত্ব রূপে ঘোষিত হয়েছে। যে রাষ্ট্রনায়ক এই দায়িত্ব পালন করবে না তার পরিনাম অত্যন্ত মর্মান্তিক হবে। নবী করিম (সঃ) বলেছেন-"যে লোককে আল্লাহ তা'আলা জনগণের শাসন-পরিচালক বানিয়ে দিবেন, সে যদি তাদের পুরামাত্রায় কল্যাণ সাধন না করে তবে সে জান্নাতের সুগন্ধিও লাভ করতে পারবে না।" (বুখারী)

বায়তুলমাল যদিও ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের নিয়ন্ত্রনাধীন থাকে এবং তাঁরই নির্দেশানুক্রমে পরিচালিত হয়, কিন্তু তবু ব্যক্তিগত ভাবে তার নিজস্ব কোন কর্তৃত্বই উহার উপর স্বীকৃত বা কার্যকর হতে পারে না।

একটি সাধারণ রাষ্ট্রের জাতীয় কোষাগারের উপর একজন বাদশাহ বা ডিক্টেটরের যে স্বেচ্ছাচার মূলক কর্তৃত্ব স্থাপিত থাকে এবং তারা যেভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদ ভোগ ব্যবহার করে ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান বায়তুলমালের উপর অনুরূপ কর্তৃত্ব স্থাপিত করতে বা অনুরূপ ভাবে ভোগ-ব্যবহার করতে পারে না। রাজতন্ত্র ও ডিক্টেটরবাদ এবং ইসলামের মধ্যে এখানে মূলত নীতিগত পার্থক্য সুস্পষ্ট।

ইসলামী অর্থনীতি একদিকে সুদ-সুদী কারবার ও সকল প্রকার সুদ ভিত্তিক লেনদেন চিরতরে হারাম করে দিয়েছে। অপরদিকে নাগরিকদের প্রয়োজন অনুযায়ী বিনাসুদে ঋণদানের চূড়ান্ত ও স্থায়ী ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাহাবাগণ এমনকি স্বয়ং নবী করিম (সঃ) ও লোকদের নিকট হতে প্রয়োজন অনুপাতে ঋণ গ্রহণ করেছেন। কুরআন মজিদে এজন্য বিশেষ উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে-"যে ব্যক্তি আল্লাহকে সদভাবে ঋণ দিবে আল্লাহ তাকে উহার কয়েক গুন বেশী প্রত্যার্পন করিবেন।" সূরা বাকারা, আয়াত নং-২৪৫। এখানে বলাদরকার-আল্লাহকে সদভাবে ঋণ দেয়ার অর্থ অভাবগ্রস্থ ও দরিদ্র পীড়িত

Dhaka University Institutional Repository

লোকদেরকে বিনা সুদে ঋণ দান করা। হযরত ওমর (রাঃ) এর খিলাফতকালে বিনাসূদে ঋণ দেয়ার কাজ ব্যাপকভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। সরকারী কর্মচারীগণ নিজেদের চাকুরীর জামানতে বায়তুলমাল হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারতো। মূলতঃ ঋণদান সমিতির ইতিহাসে ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান।

জনগণকে নিজ নিজ প্রয়োজন পূর্ণ করিবার জন্য যেমন বিনাসূদে ঋন দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, অনুরূপভাবে উৎপাদনী কার্যে বিনিয়োগের জন্যও ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল হতে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। এ ব্যাপারে স্ত্রী-পুরুষ, মুসলিম-অমুসলিম হিসেবে কোনরূপ পার্থক্য করা বা কারো প্রতি কোনরূপ বিন্দুমাত্র পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে হিন্দ বিন্‌তে উৎবা হযরত ওমর (রাঃ) এর নিকট থেকে ব্যবসায়ে বিনিয়োগের জন্য চার হাজার মুদ্রা জামিনে গ্রহণ করেছিলেন। বস্‌রার শাসনকর্তা আবু মুছা আশয়ারী (রাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর ও উবাদাহ ইবনে ওমরকে ব্যবসা করার জন্য প্রচুর অর্থ ঋণ বাবদ দিয়েছিলেন।

অনুরূপভাবে কৃষকদিগকেও কৃষি কার্যের উন্নতি বিধান, হালের গরু, কলের লাঙ্গল, বীজ সংগ্রহ, সার ক্রয়সহ অন্যান্য খরচ যোগানের জন্য বিনা সুদে ঋণ দেয়া ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালের কর্তব্য।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয় ঃ

প্রতিটি মানুষের জীবন সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে পরিচালনার জন্য যেরূপ অর্থ সম্পদের প্রয়োজন হয় প্রতিটি রাষ্ট্র সরকারের যাবতীয় কার্যাদী পরিচালনা ও দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরূপভাবে অর্থ সম্পদের অবশ্যকতা অনস্বীকার্য। মানুষ যেখানে নিজের বুদ্ধিমত্তা ও কৌশলের সাহায্যে সম্পদ আহরণ করে, রাষ্ট্র-সরকার সেখানে বিভিন্ন ধরণের কর ও রাজস্বের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে থাকে।

অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংঙ্খলা বজায় রাখা, দেশকে বহিঃ শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করা, দেশের জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা, সরকারী কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান সহ নানাবিদ কার্য পরিচালনা করতে সরকারের বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অর্থ যোগান দিতে সরকারকে বিভিন্ন ধরণের কর ও রাজস্ব নির্ধারণ করতে হয়। এক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশের সরকার যে পন্থায় সম্পদ আয় করে তাহলো-আয়কর, সম্পদকর, দান কর, আমাদানী-রফতানী শুল্ক, ভ্যাট, আবগারী শুল্ক, রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প-প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানের সুদ ও আয়। নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রিকরণ, বন বিভাগ, সামুদ্রিক সম্পদ, মৎস সম্পদ, খাস জমি লিছ প্রদান, তার ও টেলিফোন, সার চার্জ, জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, বেসামরিক প্রশাসন, মুদ্রা ও টাকশাল, প্রমোদকর, ভ্রমণ কর, বিদ্যুৎ বিতরণ, খনিজ সম্পদ, অর্থ দন্ড ইত্যাদি।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় রাজস্ব সংগ্রহ ও ব্যয় করার ব্যাপারে মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে উহা ধার্য করার ব্যাপারে যেমন অন্যায় ও শোষণের প্রশ্রয় দেয়া যাবে না, তেমনি ভাবে সংগ্রহীত রাজস্বের একটি ক্রান্তি পর্যন্ত ও অন্যায় পথে, যথেচ্ছভাবে ব্যয় করার অধিকার কারো নেই। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় উহার রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকেও ইসলামী রাষ্ট্রের আয় এবং ব্যয়কে ও স্থায়ী নৈতিক নিয়মের বাঁধনে বেঁধে দেয়া হয়েছে এবং তা লংঘন করার অধিকার কারো থাকতে পারে না।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালের আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে কেন্দ্রিয় অর্থনীতির যে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রন স্বীকৃত হয়, দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ)-এর ভাষায় তা নিম্নরূপ ঃ

"তিনটি হালাল পন্থা ভিন্ন অন্য কোন ভাবে রাষ্ট্রীয় সম্পদে হস্তক্ষেপ করার আমার কোনই অধিকার নেই। প্রথম ঃ সত্য ও ন্যায় পরায়নতার সহিত তা গ্রহণ করা হবে। দ্বিতীয়ঃ ন্যায় পথেই উহা ব্যয় করা হবে এবং তৃতীয় এই যে, উহাকে সকল প্রকার অন্যায় নীতির উর্ধ্বে রাখতে হবে। [১]

অন্য কথায়, ইসলামী রাষ্ট্র কেবল সরকারী ব্যয় বহনের জন্যই রাজস্ব আদায় করবে না, দেশের গরীব দুঃখী ও অভাবী মানুষের জন্য স্থায়ী কল্যাণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করার উদ্দেশ্যে এবং পথিক, বেকার ও ঋণী লোকদের সাহায্য করার জন্যও রাজস্ব আদায় করবে।

১। ইউছুফ আল কারযাভী কিতাবুল খারাজ- পাতা নং-১১৫

Dhaka University Institutional Repository

কর প্রসঙ্গ

প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কর ঃ

সরকারী রাজস্বের উৎস হিসেবে আধুনিক অর্থনীতিতে কর খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশের কর একক ভাবে মোট রাজস্ব আয়ের চার পঞ্চমাংশ (৮০%) জুড়ে আছে। অধিকাংশ মুসলিম দেশের জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশই কর। কিন্তু সম্পদ সমাবেশের উপায় হিসেবে ইসলামী অর্থনীতিতে করের ভূমিকা এবং প্রকৃতি ও পরিধি খুব পরিস্কার। আধুনিক অর্থনীতি থেকে এর উদ্দেশ্য ও গঠন সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ইসলামী রাষ্ট্রে আয়ের বিভিন্ন উপায়ের আলোচনার পূর্বে কর সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। অর্থনীতিবিদগণ করের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। আয়ারল্যান্ডের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক বেষিবেল করের সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নরূপ ঃ

"কর বলতে কোন ব্যক্তি বা দলের সেই অর্থ বুঝায়, যা সরকারী কার্যসম্পাদনের উদ্দেশ্যে তার নিকট থেকে বাধ্যতামূলক ভাবে আদায় করা হয়।"[১]

বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ডাল্টন রাজস্বের সংজ্ঞায় বলেন ঃ "রাজস্ব হল সরকারের পক্ষ হতে অপরিহার্যরূপে ধার্যকৃত একটি দাবী বিশেষ।[২]

উপরোক্ত সংজ্ঞা থেকে কর সম্পর্কে বুঝা যায় যে, সরকার কর্তৃক কোন ধরণের সুবিধা প্রদান ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর ধার্যকৃত কর যা জনসাধারণের সাধারণ স্বার্থে ব্যয় করা হয়। যদিও কর, সরকারী ঋণ ইত্যাদি প্রচলিত অর্থনীতিতে গ্রহণ করা হচ্ছে কিন্তু এতে কোন নৈতিক দায়িত্ব বা সীমা রক্ষা করার ভাবধারা আদৌ খুজে পাওয়া যায় না।

১। পাবলিক ফিনান্স, তৃতীয় খন্ড, প্রথম অধ্যায়, পাতা নং-২৬১

২। প্রিন্সিপ্যালস অব পাবলিক ফিনান্স, তৃতীয় অধ্যায়, পাতা নং-২৬

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনীতির ভাষায় কর সাধারণত দু'প্রকার। যথা ঃ

ক) প্রত্যক্ষ কর ঃ যে রাজস্ব নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি কিংবা অবস্থার লোকদের উপর আইনতঃ ধার্য করা হয়, উহাকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়।

খ) অপ্রত্যক্ষ (পরোক্ষ) কর ঃ যে কর ধার্য করা হয় একজনের উপর, কিন্তু মূলতঃ উহার সমগ্রটি কিংবা আংশিক আদায় করতে হয় অপর একজন কে, একেই বলা হয় অপ্রত্যক্ষ কর (পরোক্ষ) কর।[১]

দেশবাসীর উপর প্রত্যক্ষ কর ধার্য করা উচিত না পরোক্ষ কর ধার্য করা উচিত, অর্থনীতিবিদদের মধ্যে এ সম্পর্কে বিশেষ মতভেদ রয়েছে। হেনরী জর্জ বলেন যে, একমাত্র ভূমি করই দেশবাসীর উপর ধার্য হওয়া উচিত কেননা ভূমি থেকে উৎপন্ন ফসলই মানবজীবনের অপরিহার্য প্রয়োজনের পরিপূরক বলে প্রত্যেকেই তা ব্যবহার করতে বাধ্য। ফলে দেশের সকল মানুষের উপরই এরূপ রাজস্বের প্রভাব অপ্রত্যক্ষ ভাবে পড়ে থাকে। কিন্তু এই রাজস্ব নীতির মূলে একটি সুস্পষ্ট ভুল বিদ্যমান। রাজস্বের এই নীতি গৃহীত হলে নগদ সম্পদশালী লোকদের ঐশ্বর্যের উপর এর কোন প্রভাব পড়বে না। বরং কেবল গরীব দুঃখীদের উপরই রাজস্বের দূস্বহ বোঝা চাপিয়ে দেয়া হবে।[২]

পরোক্ষ রাজস্ব নীতিতে মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে কর আদায় করা হয়। জনগণ জানতেও পারে না যে, তাদের উপর কর ধার্য করা হয়েছে এবং তাদেরকে তা যথারীতি আদায় করতে হচ্ছে। কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজস্বনীতিতে জনগণের নিকট হতে সরাসরি কর আদায় করা হয় বলে তাতে কোনরূপ অতিশয্য দেখতে পেলে জনগণ সঙ্গে সঙ্গেই উহার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ফলে এই রাজস্ব ধার্য এবং উহা আদায় করণের ব্যাপারে কোনরূপ জুলুম হওয়ার অবকাশ ও সম্ভবনা থাকতে পারে না।

১। অধ্যাপক ডালটন, পাবলিক ফিনান্স, ৫ম অধ্যায়, পাতা নং-৩৩

২। প্রিন্সিপ্যাল এন্ড মেথড অবটেকশন, পাতা নং-২৪

Dhaka University Institutional Repository

অপর পক্ষে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম এবং রাষ্ট্রের যাবতীয় সামষ্টিক দায়িত্ব পালনের প্রতি জাগ্রত জনগণের আন্তরিক সমর্থন থাকে বলে প্রকৃত প্রয়োজন পরিমাণ রাজস্ব আদায় কার্য ব্যহত হয় না। ফলে জনমতের গুরুত্ব, গনধিকারের মৌলিক ভাবধারা ও সামগ্রিক প্রয়োজন পূর্ণ করণ পভৃতি সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হতে ও বিকাশ লাভ করতে পারে।

কিন্তু বর্তমান কূটনৈতিক ও যড়যন্ত্রকারী দুনিয়ার রাষ্ট্র-সরকারের অর্থমন্ত্রীগণ সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নভাবে ও জনগণের অজ্ঞাতে কর আদায় করার অধিকতর প্রচেষ্টা করে থাকে। কোলবিয়ার নামক একজন ফরাসী মন্ত্রী বলেছেন ঃ হাঁসের পালক এমন ভাবে উৎপাটন কর, যেন উহা চিৎকার করারও সময় না পায়। বস্তুতঃ বর্তমান দুনিয়ার প্রায় সকল রাষ্ট্রই রাজস্ব আদায় ও অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে এই নীতিই অনুসৃত হচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎসসমূহ ঃ

ইসলামী রাষ্ট্রের বিরাট জাতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য বিপুল অর্থ সম্পদের প্রয়োজন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে যে সকল আয়ের উৎস ছিল, বর্তমান সময়েও ঐ সকল উৎস সমভাবেই প্রযোজ্য। কিন্তু বর্তমান সময়ে সরকারের কাজের পরিধি যে হারে বেড়েছে সে জন্য প্রাপ্ত অর্থ পর্যাপ্ত নাও হতে পারে। উপরন্তু আজকের যুগে এ সব খাতের সবগুলো উৎস ব্যবহারের সুযোগ হ্রাস পেয়েছে।

উদাহরণত ঃ গনীমাহ, খুমুশ, জিযিয়া, ফাই ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। অপর দিকে বর্তমান যুগে সরকারের আয়ের উৎস হিসেবে যেসব খাত ব্যবহৃত হচ্ছে তার সবগুলো শরীয়ত সম্মতকিনা তাও সন্দেহ আছে। এজন্যেই আধুনিক রাষ্ট্রের আয়ের উৎসসমূহ ইসলামী দৃষ্টিকোন হতে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় অর্থ আয়ের উৎসের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে নিম্নলিখিত উপায় সমূহ নির্ধারিত আছে। যেমন-

১) সর্ব প্রকারের যাকাত, সাদাকাহ, উশর, খনিজসম্পদের রয়ালিটি।

২) ভিন্ন জাতির নিকট থেকে বিনাযুদ্ধে প্রাপ্ত ধন-সম্পদ, জিযিয়া, গনিমতের মাল, খারাজ ইত্যাদি।

৩) দেশের সমষ্টিগত প্রয়োজন পরিপূরণের জন্য নাগরিকদের নিকট হতে আদায়কৃত চাঁদা বাবদ লব্ধ অর্থ।

নবী করীম (সঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন নিম্নলিখিত বিষয়গুরোকেও ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস হিসেবে গণ্য করেছেন।

১। ভূ-গর্ভে প্রাপ্ত সম্পদের এক পঞ্চমাংশ। (২) রয়ালটি (৩) ইজারার খাজনা, (৪) আমদানী ও রফতানী শুল্ক, (৫) নদী-সমুদ্র হতে প্রাপ্ত সম্পদ, (৬) মালিক বিহীন ধন-সম্পত্তি, (৭) মুদ্রা শিল্প এবং রাষ্ট্রের মালিকানা ও কর্তৃত্বাধীন পরিচালিত জমি, বন ও শিল্প-ব্যবসায় লব্ধ মুনাফা।

Dhaka University Institutional Repository

আয়ের উল্লেখিত উপায়গুলোকে পরিমানের দিক দিয়ে চারভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

(ক) ভূমি রাজস্ব–উশর, উশরের অর্ধেক।

(খ) খুমুস–যেসব রাজস্ব মূল সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। যথা- গনীমতের মাল, ব্যক্তি মালিকানার খনিজ সম্পদ, সামুদ্রিক সম্পদ ইত্যাদি।

(গ) যাকাত, সাদাকাহ এবং নাগরিকদের নিকট থেকে লব্দ টাকা। জিযিয়াও ইহারই অন্তর্ভূক্ত হবে। (জিযিয়া, খারাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে নাগরিকদের নিকট থেকে যা আয় করা হবে, উহার হার ও পরিমাণ নির্ধারণ ইসলামী রাষ্ট্রের পার্লামেন্টের কাজ।) যাকাত বিভিন্ন জিনিস থেকে বিভিন্ন হারে আদায় করার নির্দেশ রয়েছে।

(ঘ) মালিকানাবিহীন ধন-সম্পত্তি, ইহার সম্পূর্ণ ও সমগ্রটাই রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে জমা হবে।

উল্লেখিত আয় সমূহকে অন্য ভাবে আবার দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১) যেসব আয়ের ব্যয়ের খাত সমূহ পবিত্র কুরআনে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে।

২) এবং যেসব আয়ের ব্যয় ক্ষেত্র নির্ধারণ ও পরিকল্পনা গ্রহণের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকদের (পার্লামেন্টের) উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। (অবশ্য তাও কুরআন হাদীসের মূলভাবধারা অনুযায়ী জনগণের কল্যাণের দৃষ্টিতেই নির্ধারণ করতে হবে।

ভূমি রাজস্ব ঃ

সাধারণ অর্থে ভূমি থেকে যে কর আদায় করা হয় তাকে ভূমি রাজস্ব বলা হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রে বসবাসরত সকল জনগণ সকল প্রকার ভূমির ভোগ-ব্যবহার, সুযোগ/সুবিধা গ্রহণের বিনিময়ে সরকারকে যে কর প্রদান করে থাকে একেই বলা হয় ভূমি-রাজস্ব। ইসলামী রাষ্ট্রে ভূমিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়-(ক) উশরী জমি ও (খ) খারাজী জমি। নিম্নে উহার বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করা গেল।

ক) উশর ঃ

উশর আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দশ ভাগের এক ভাগ বা এক দশমাংশ। যে জমির মালিক মুসলমান, মুসলমানই যে জমি সর্ব প্রথম আবাদ ও চাষোপযোগী করে তুলেছে, মুসলমানগণ যথারীতি অস্ত্র-প্রয়োগ করে যে সব জমি দখল করেছে এবং যে জমির

Dhaka University Institutional Repository

মালিকানা ইসলামী রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে অথবা রাষ্ট্র সরকার যে জমি নাগরিককে চাষাবাদের জন্য দান করেছে তা সবই উশরি জমি নামে অভিহীত।

ইসলামী চিন্তাবিদগণ উশরী জমির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে-

ক) যে সব জমি যুদ্ধ করে জয় করা হয়েছে এবং সঙ্গতভাবে মুসলমানদের জমিতে পরিণত হয়েছে বিধায় মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছে, সে সব জমিই উশরী জমি।

খ) বসতবাড়ী সংলগ্ন বাগ-বাগিচাকে প্রকৃত মালিক যদি করোপযোগী কোন ফসল (যা শুকিয়ে বা না শুকিয়ে সংরক্ষণ করা যায়) উৎপাদনকারী জমিনে পরিণত করেন তা হলে তা উশরী জমিন বলে গণ্য হবে।

ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) এর মতে উশর ফরজ হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াত দুটির দ্বারা। যেমন-

১) ফসল পেঁকে গেলে তা খাও। ফসল কাটার দিন উহা থেকে আল্লাহর "হক" (উশর) আদায় কর এবং এব্যাপারে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘন কর না। কেননা আল্লাহ সীমা লংঘনকারীদের ভালবাসেন না।[১]

এখানে "হক" অর্থ জমির ফসল ভোগ করার বিণিময়। ইহা আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট হয়েছে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে ইহা জমা করতে হবে।

২) " হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিজেদের উপার্জিত ধন-সম্পদ এবং ভূমির উৎপন্ন ফসল হতে উত্তম ও উৎকৃষ্ট অংশ (আল্লাহর পথে) ব্যয় কর।"[২]

এই আয়াতের প্রথমাংশ থেকে যাবতীয় নগদ ধন-সম্পদ, টাকা পয়সার যাকাত ফরজ হয় এবং শেষাংশ থেকে উশর দেয়ার আদেশ প্রমাণিত হয়।

মহানবী (সঃ) আল্লাহ তা'আলার উল্লেখিত নির্দেশ অনুযায়ী এবং তাঁর অনুমতিক্রমে মুসলমানদের ভোগাধিকৃত ভূমির রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন-"যে জমির সেচ কাজ বৃষ্টি, ঝর্নাধারা, নদী, খাল, কিংবা যা স্বতই সিক্ত থাকে তার ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করতে হবে। আর জমিতে যে কোন ধরণের পানি সিঞ্চনে কৃত্রিম ভাবে সিক্ত করে ফসল ফলানো হয় উহার বিশ ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করতে হবে।

১। সূরা আন্ আম, আয়াত নং-১৪১

২। সূরা বাক্বারা, আয়াত নং-১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বিভিন্ন এলাকার শাসন কর্তা ও ভারপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের প্রতি এই পর্যায়ে যে ফরমান জারী করেছিলেন তা থেকেও মুসলমানদের ভূমি রাজস্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধান লাভ করা যায়।

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) কে ইয়ামেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে নবী করীম (সঃ) যে নিয়োগ পত্র দিয়েছিলেন তাতে লিখিত ছিল-মুসলমানগন জমি থেকে এক দশমাংশ রাজস্ব বাবদ উশর আদায় করবে, ঐ সকল জমি হতে যে জমি বৃষ্টি অথবা ঝর্নার পানিতে সিক্ত হয়, কিন্তু যে সব জমিতে স্বতন্ত্রভাবে পানি দিতে হয় তা থেকে এক দশমাংশর অর্ধেক বিশ ভাগের এক ভাগ রাজস্ব হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

অনুরূপভাবে জেমিয়ার রাজন্যবর্গের নিকট প্রেরিত ফরমানেও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য স্বীকার কর, নামাজ পড়, যাকাত দাও, এতদ্ব্যতীত জমির রাজস্বও দিতে থাক। যে জমি বৃষ্টি বা ঝর্নার পানিতে বিনা পরিশ্রমে ও অতিরিক্ত ব্যয় ব্যতিত সিক্ত হয়, তার এক দশমাংশ ফসল এবং সেচ্ ব্যবস্থার সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে সিক্ত জমির বিশ ভাগের এক ভাগ ফসল ভূমি রাজস্ব বাবদ আদায় করতে হবে।

আমর ইবনে হায্মের (রাঃ) নিয়োগপত্রে নাজরানের জমিনের উৎপাদিত ফসলের উপর যাকাত নির্ধারণ করা হয় নিম্নরূপে, ঝর্না বা বৃষ্টির পানি দ্বারা উৎপাদিত ফল-ফসলের উপর ১০% এবং বালতি দ্বারা বহন করে সেচ্ দিয়ে উৎপাদিত ফসলের উপর ৫%। আবু দাউদ শরীফে উল্লেখিত নদী-নালা থেকে সেচ্কৃত বলতে বিনা খরচে নদীর পানিকে বুঝানো হয়েছে। বর্তমানে নদী-নালার পানি সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের ৫% উশর দিতে হবে।

সুতরাং প্রাকৃতিক ভাবে পানি দ্বারা সিক্ত হয়ে উৎপাদিত ফসলের যাকাত হবে ১০% এবং সেচ্ যন্ত্রের মাধ্যমে সিক্ত হয়ে উৎপাদিত ফসলের যাকাত হবে ৫%। তবে জমিটি

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্যই উশরী হতে হবে। কোন মুসলমানের জমিতে একই সাথে উশর ও খাজনা (খারাজ) একত্রে আরোপিত হতে পারে না।[১]

ইমাম মালিক, ইমাম গায্যালী, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম শাফেয়ী (রঃ) প্রমুখের মতে উশরের নিসাব ৫ ওয়াসাক। এর কম উৎপাদিত ফসলের উশর দিতে হবে না। তাঁদের দলীল নবী করিম (সঃ) এর হাদীস "পাঁচ ওয়াসাকের কমের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব নয়"। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (রঃ), ইব্রাহীম নখয়ী এবং ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) এর মতে উশরের কোন নিসাব নেই। তাঁদের দলীল নবী করিম (সঃ) এর হাদীস, "ভূমি যা উৎপন্ন করে, তাতে উশর ওয়াজিব হবে; এতে কোন শর্ত আরোপ করা হয় নি। তবে বাঁশ, জ্বালানী কাঠ ও ঘাসসহ পঁচনশীল দ্রব্য এর অন্তর্ভূক্ত হবে না।

উৎপাদিত ফসলের উশর ফসলের পরিবর্তে নগদ অর্থেও পরিশোধ করা যেতে পারে। কোন মুসলিম ব্যক্তির যে জমি সম্পর্কে নিশ্চিত রূপে জানা যায় না যে, পূর্বে উহা খারাজী জমি ছিল না উশরী জমি, সেক্ষেত্রে ঐ জমি উশরী জমি বলে গণ্য হবে। উশরী জমি বংশ পরম্পরায় উশরীই গণ্য হয়ে থাকে।

মোট কথা সকল প্রকার ভূমিজাত ফসল হতেই জমির উল্লেখিত রূপ পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে এক দশমাংশ অথবা এর অর্ধেক পরিমাণ ফসল রাজস্ব বাবদ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল-এ জমা রাখতে হবে। বাগান ও শষ্য ক্ষেত্র এতদুভয়ের মধ্যে রাজস্ব ধার্য হওয়া না হওয়ার দিক দিয়ে কোনরূপ পার্থক্য করা চলে না এবং কোন প্রকার উৎপাদনশীল জমিকে রাজস্ব আদায়ের বাধ্য-বাধকতা হতে নিস্কৃতি দেয়া যেতে পারে না।

১। {আল-হাদীস, বাদাই ২য় খন্ড, ৫৭ পৃঃ, গৃহীত মুহম্মদ মুছা (সম্পা) ১৯৯৬}

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত বর্তমানে সব সরকারই সব কৃষি জমির ভূমিকর ধার্য করে থাকে, সেখানে জমি খারাজী না উশরী তা চিন্তা করা হয় না। ফলে সব জমিই এখন অভিন্ন পর্যায়ে এসে গেছে। এজন্য মুসলমানদের মালিকানাভূক্ত সব জমির উপর উশর অথবা অর্ধ উশর ধার্য করতে হবে। আর ধার্যকৃত জমির কর মালিককেই দিতে হবে। যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ সরকার থেকে জমি ভোগ দখলের অধিকার লাভ করে মাত্র, সম্পূর্ণ মালিকানা লাভ করে না এবং এদেশের সরকার হল মুসলমান। সুতরাং বাংলাদেশের সব জমিই উশরী জমি।

(ওয়াসাক=৬০ সা'তে ১ ওয়াসাক, ৫.৫ রতল বা ৮ রতল (ইরাকী) এক সাঃ আল্লামা ইউসুফ আল কারযাবীর মতে, পাঁচ ওয়াসাক সমান ১৮মন =৬৫০ কেজি এবং পাকিস্তানী আলেমদের মতে ৯৪৮ কেজি)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে সম্ভব্য উশরের পরিমান ঃ

বাংলাদেশের যেসব কৃষি জমির মালিকের নিসাব পরিমান ফসল হয় তাদের মধ্যে উজ্জল ব্যতিক্রম ছাড়া অন্যান্যরা ফসলের উশর আদায় করে না। এদেশের ভূমি মালিকানার দিকে তাকালে দেখা যাবে সমগ্র উত্তর অঞ্চল তো বটেই, দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলেও চাষাধীন জমির বৃহৎ অংশের মালিক মোট কৃষকের ১৭%-২০%। অথচ এরা ফসলের উশর আদায় করে না। এদেশের সাহেবে নিসাব পরিমাণ ফসলের অধিকারী জমির মালিক নিজ উদ্যোগেই যদি উশর আদায় করতো তাহলে এর পরিমাণ কম হলেও ১,০০০ কোটি টাকার বেশী হত।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি আমরা আরও স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করতে পারি। যেমন ঃ বাংলাদেশে গত ২০০০-২০০৩ অর্থ বছরে গড়ে ২ কোটি ৬৬ লক্ষ্য একর জমিতে ধান চাষ হচ্ছে এর মধ্যে সেচ্ প্রকল্পের মাধ্যমে ফসল ফলানো হয় ৯৪ লক্ষ একর জমিতে যা চাষকৃত জমির ৩৫.৩০%। বিগত ২০০০-২০০৩ সালে এ দেশে ধান উৎপাদনের গড় পরিমাণ ছিল ২ কোটি ৪৯ মেঃ টন। এথেকে সেচকৃত জমির অংশ বাদ দিলে উৎপাদনের পরিমাণ দারায় ১ কোটি ২৯ লক্ষ মেঃটন। এর মধ্য থেকে ক্ষুদে ও প্রান্তিক মালিক চাষীর ৪০% এবং মাঝারি চাষীদের অর্ধেককেও (২০%) যদি বাদ দেয়া যায় তাহলে অন্যদের (৪০) নিকট থেকে উশর আদায় যোগ্য ফসলের পরিমাণ দাড়াবে ৫১ লক্ষ ৫৫ হাজার মেঃটন।

প্রতি মেঃটন চালের গড় দাম টাকা ১৫,০০০% ধরলে এ থেকে উশর আদায় হবে ৭৭২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা (মূল্যের ১০% হারে)। এ ভাবে সেচকৃত জমির উৎপাদন হতে পূর্বে উল্লেখিত শ্রেণীর কৃষকদের অংশ বাদ দেয়া হলে উশর যোগ্য ফসলের জমির পরিমাণ দাড়াবে ৪৭ লক্ষ ৮৮ হাজার মেঃটন। পূর্বে উল্লেখিত মূল্যে এক্ষেত্রে উশরের পরিমাণ (মূল্যের ৫%) দাড়াবে ৩৫৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। ফলে সেচ্ বিহীন ও সেচ্কৃত জমির ধানের আদায়যোগ্য উশরের পরিমাণ দাড়াবে সর্বমোট = ১,১৩১ কোটি টাকা। এছাড়া গম, আলু, আখ প্রভৃতি ফসলের উশর আদায় করলে এর পরিমাণ টাকায় আরো অনেক বেড়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

খারাজ ঃ

খারাজ ফার্সী শব্দ, আবরী ভাষায় বলা হয় তাস্‌ক। কিতাবুল আমওয়াল গ্রন্থে বলা হয়েছে-"তাদের (অমুসলিমদের) ভূমির উপর ট্যাক্স ধার্য হবে"। এই আরবী তাস্‌ককেই ইংরেজীতে Task কিংবা Tax বলা হয়। ইসলামী বিশ্ব কোষে বলা হয়েছে এই শব্দটি মূলে আরবী ভাষায় CHOREGIA শব্দ থেকে গ্রহীত। ইহার অর্থ রাজস্ব।

খারাজী জমি ঃ

নিম্ন বর্ণিত অবস্থা এবং প্রকৃতির জমি খারাজী জমি হিসেবে গণ্য হবে।

ক) মুসলিম রাষ্ট্র কর্তৃক কোন এলাকা দখলের পর সেখানের জমি খাজনা প্রদানের শর্তে স্থানীয় অমুসলিমদের মধ্যে বন্টন করা হলে।

খ) কোন অমুসলিমকে যুদ্ধে সাহায্যের প্রতিদানে জমি প্রদান করলে।

গ) কোন অনাবাদী জমি কোন অমুসলিম কর্তৃক সরকারের অনুমতি নিয়ে আবাদ করলে।

ঘ) কোন এলাকার অমুসলিমরা মুসলিম সরকারের সাথে খাজনা প্রদানের শর্তে চুক্তিবদ্ধ হলে তথাকার জমি।

ঙ) অমুসলিম নাগরিক থেকে ক্রয় কৃত জমি।

চ) অমুসলিম কর্তৃক মুসলিমের ক্রয়কৃত জমি এবং

ছ) খারাজী জমির পানি সিক্ত উশরী জমি।

ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক খারাজী জমি উপর যে কর ধার্য করা হয় একে বলা হয় খারাজ।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন- আল্লাহর কসম! যার হাতে আমার জীবন, পরবর্তী যুগের লোকদের জন্য আমরা যদি কিছুই অবশিষ্ট না রাখি তাহলে তাদের জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আমাদের অধিকারে যাই কিছু আসতো সব কিছু খয়বরের বণ্ঠিত সম্পদ ও ভূ-সম্পত্তির ন্যায় ভোগ বন্টন হয়ে যেত। সে জন্য আমরা পরবর্তি যুগের লোকদের জন্য তা খাজনা আকারে রেখে দিলাম যেন তারা তা ভোগ-বন্টন করে নিতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

অন্য এক ঘোষণায় তিনি আরো বলেছেন-"সরকারী কর্মচারীদিগকে জনগণের উপর জুলুম, অত্যাচার নিষ্পেষণ চালাবার জন্য কিংবা খাজনা ও বিবিধ প্রকার কর বাবদ তাদের ধন-সম্পদ লুটে নেয়ার জন্য কখনই প্রেরণ করা হয় না। তাহাদের প্রেরণ করা হয় দ্বীন-ইসলামের শিক্ষা প্রচারের জন্য, জনগণের জীবনকে সকল দিক দিয়ে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য। ইসলামের পতন যুগেও এদিকে যথেষ্ট লক্ষ্য আরোপ করা হত। ইতিহাস হতে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

হাজ্জাহ বিন ইউসুফ তাঁর শাসন এলাকায় রাজস্বের পরিমান বৃদ্ধি করার জন্য তদানীন্তন বাদশাহ আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের নিকট অনুমতি চেয়েছিলেন। উত্তরে বাদশাহ বলেছিলেন, সাধারণ ভাবে যা পাওয়া যায় তাকেই যথেষ্ট মনে কর, যা সহজ লভ্য নয়, যা গ্রহণ করতে জবরদস্তি করতে হয়, তার লালসা করো না। চাষী ও ভূমি মালিকদের জন্য এমন পরিমাণ সম্পদ থাকতে দাও যা দ্বারা তারা স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে সামর্থ হবে।"

- 425567

খারাজের পরিমাণ নির্ধারণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। ইসলামী রাষ্ট্রকে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা বিশেষ সতর্কতার সহিত জমির জরিপ ও গুনাগুন নির্ণয় করে এ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) ইরাক, সিরিয়া ও মিসরের বিশাল বিস্তীত উর্বর ও শস্য-শ্যামল ভূমি মুজাহীদদের মধ্যে বন্টন না করে উহার উপর মুসলমানদের রাষ্ট্রিয় সামষ্টিক মালিকানা স্থাপিত করেছিরেন। এর চাষাবাদ সম্পর্কে তথাকার প্রাচীন কৃষকদের সহিত বন্দোবস্ত করেছিলেন এবং উহার খারাজ নির্দিষ্ট করেছিলেন। তবে খারাজ নির্ধারণের পূর্বেই তিনি উসমান বিন হানিফ (রাঃ) কে এই সকল জমির জরিপ সংক্রান্ত যাবতীয় জরুরী কার্য সম্পন্ন করার জন্য প্রেরণ করেছিরেন। কেননা উসমান ভূমি রাজস্ব বিশেষত্বঃ খারাজ ধার্য করণ সম্পর্কে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ফলে তিনি দ্বীভাজ কাপড় পরিমাপ করার ন্যায় ঐ সকল জমির জরিপ করেছিলেন।

খারাজ নির্ধারণের ব্যাপারে জমির গুনাগুন, উর্বরতার পার্থক্য, প্রয়োজন পরিমাণ চাষের পার্থক্য, পানি সেচের আবশ্যকতা ও অনাবশ্যকতার পার্থক্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য

Dhaka University Institutional Repository

রাখতে হবে, যেন জমির প্রকৃত গুন অনুপাতেই রাজস্ব ধার্য হতে পারে। অন্যথায় ভূমি মালিকের উপর অবিচার হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। আবার প্রকৃত পরিমাণ অপেক্ষা রাজস্ব কম ধার্য হলেও তাতে সমষ্টির উপর আধিকার ক্ষুন্ন হবে।

খারাজ ও উশরের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে সে সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায় যে, খারাজ জমি হতে আদায় করা হয় এবং উশর আদায় করা হয় জমি হতে উৎপন্ন ফসল হতে। একাধিক সহোদরের কোন এজমালি জমি থাকলে এবং তাদের কেহ ইসলাম ধর্মের অনুসারী, আর অন্যান্যরা অন্য ধর্মের অনুসারী হলে সে ক্ষেত্রে ভূমি রাজস্বও অনুরূপ ভাবে আদায় করতে হবে। অর্থাৎ যে মুসলমান তার জমি থেকে উশর এবং যারা অন্য ধর্মের অনুসারী তাদের থেকে খারাজ আদায় করতে হবে। তবে উশর ও খারাজ আদায় করার ব্যাপারে কোনরূপ জোর-জুলুম, অবিচার কিংবা হিংসা বিদ্বেষের প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম নাগরিকগণই প্রকৃতপক্ষে সকল প্রকার সর্বজনীন দায়িত্বের ভারপ্রাপ্ত হয়ে থাকে এবং সেজন্য তাদেরকে অন্যান্য দায়িত্ব ছাড়া রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পরিপূরণের উদ্দেশ্যেও বিপুল পরিমাণে অমুসলিম অপেক্ষাও অনেক বেশী অর্থ দানের দায়িত্ব পালন করতে হয়। কাজেই জমির রাজস্বের দিক দিয়ে সামান্য পার্থক্য হলেও মোটামুটি ভাবে মুসলমানদেরকেই অধিক পরিমাণে অর্থদান করতে হয়।

প্রয়োজন হলে এবং উপযুক্ত কারণ থাকলে খারাজের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা এমনকি অবস্থা বিশেষে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেয়ার অধিকারও রাষ্ট্র প্রধানের সম্পূর্ণ ইখতিয়া আছে। উশর একাধিকবার আদায় করা হলেও খারাজ আদায় করা হয় বৎসরে মাত্র একবারই।

খারাজ দু'ধরণের। যথা ঃ (১) খারাজের ওয়াজিফাঃ- যাহা জমির পরিমাণের ভিত্তিতে নগদ অর্থ ধার্য করা হয়। (২) খারাজে মুকাসামা-যাহা জমিতে উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। এখানে খারাজ কিভাবে নির্ধারণ করবে তা ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রাঃ) প্রতি একর জমিতে ১/৪ দিরহাম খারাজ আদায় করতেন।[১]

খারাজ মূলতঃ প্রাক ইসলামী যুগের একটি পদ্ধতি যা ইসলামে চালু রাখা হয়েছে। রাসূলে করীম (সঃ) থেকে শুরু করে আব্বাসীয় শাষক আল মাহদীর সূচনা পর্যন্ত খারাজে ওয়াজিফা প্রচলিত ছিল। আল মাহদী এটা পরিবর্তন করে খারাজে মুকাসামা নির্ধারণ করেন জমির শ্রেণী ভেদে ১/২ বা ১/৪ হারে। পরে জনগণের অনুরোধে ইমাম আবু ইউসুফ বিভিন্ন উপাদানের উপর ভিত্তি করে এ নীতির পূর্নবিন্যাস করেন এবং ২/৫, ১/৫, ১/১০, ১/৩ এবং ১/৪ অংশ খারাজ ধার্য করেন।

হানাফী মাযহার মতে একই ব্যক্তির উপর খারাজ ও উশর ধার্য করা যাবে না। কিন্তু শাফেয়ী ও মালিকী মাযহাব মতে পরিস্থিতি ভেদে তা করা যায়। খারাজ হিসেবে যে রাজস্ব আদায় হবে তা রাষ্ট্রীয় কোষাগার তথা বায়তুলমালে জমা হবে, এবং দেশের সার্বিক প্রয়োজন পূরণ ও সার্বজনীন কল্যাণ ও উৎকর্য সাধনের কাজে ব্যয় করা হবে। প্রসিদ্ধ ইসলামী অর্থনীতিবিদ কাজী আবু ইউসুফ (১৩২০ হিঃ) কিতাবুল খারাজ গ্রন্থে বলেছেন-" খারাজ সমগ্র মুসালমানদের ইসলামী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের সমিম্মিলিত সম্পদ"।

১। (আধুনিক বাংলা অভিধান, ঢাকা ঃ ইফাবা ৪১৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ১ দিরহাম = বাংলাদেশী ৭ টাকা)।

Dhaka University Institutional Repository

জিযিয়া ঃ

জিযিয়া আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ "বিনিময়" ইসলামের অর্থনৈতিক পরিভাষায় ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার করে অমুসলিমগণ যদি নিজেদের জান-মান, ইজ্জত রক্ষার শর্তে বার্ষিক কিছু কর প্রদান করে তবে উহাকে জিযিয়া বলা হয়। রাষ্ট্র প্রজা সাধারনের রক্ষনা-বেক্ষনের যে দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাদেরকে যে নিরাপত্তা দান করে রাষ্ট্র তারই বিনিময়ে প্রয়োজন পরিমানে কর আদায় করার অধিকার লাভ করে থাকে। এটা বিশেষ ধরনের কর যা ইউরোপের Poll Tax এর সমতুল্য।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে এই জিযিয়া করের সমর্থন রয়েছে। যেমন, পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবায় আল্লাহ পাক ঘোষনা করেছেন-"যারা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাস করে না, আর আল্লাহ ও রাসূল (সঃ) যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষেধ করে না এবং যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যারা সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ স্বহস্তে জিযিয়া দেয়।"[১]

ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন অমুসলিম প্রজাদের প্রধানতঃ দুটি কর্তব্য রয়েছে। প্রথমতঃ রাষ্ট্রের প্রতি পূন্য আনুগত্য ও বশতী স্বীকার করা এবং দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনায় আর্থিক প্রয়োজন পূরণের জন্য সাধ্যানুসারে অর্থ দান করা। জিযিয়া সম্পর্কে উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে-"রাসূলে করীম (সঃ) ইয়েমেন বাসীদের কাছে এ মর্মে পত্র লিখেন যে, ইয়াহুদী নারী বা খৃষ্টান নারীর উপর যা ধার্য হয় তজ্জন্যে পুরুষকে বিপদে ফেলা যাবে না। তাদের উপর জিযিয়া কর ধার্য করা হবে। নর হোক বা নারী হোক, দাস হোক বা দাসী হোক প্রতিজন বয়প্রাপ্তের উপর পূর্ণ এক দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) বা তৎপরিমাণ মূল্যের মা'আফির জাতীয় কাপড় ধার্য হবে। যে ব্যক্তি তা পরিশোধ করবে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সঃ) এর দায়িত্ব ভূক্ত হবে। আর কেউ তা অস্বীকার করলে সে আল্লাহও তাঁর রাসূলের (সঃ) এবং মুমীনদের শত্রু বলে বিবেচ্য হবে।

১। সূরা তাওবা, আয়াত নং-৩০।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ্য, ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদেরকে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধানের সকল দায়িত্ব থেকে অব্যহতি প্রদান করে তাদের জান-মালের সার্বিক নিরাপত্তা বিধানের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। এরই প্রেক্ষিতে তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করা হয়, তবে অভ্যন্তরীন নিরাপত্তা ও বহিঃশক্তির হাত থেকে নিরাপত্তা ব্যয় হিসেবে জিযিয়া নিলেও এক্ষেত্রে অত্যাচার ও নির্যাতন মূলক কোন ব্যবহার না করে অত্যন্ত কোমল ও সদয় ব্যবহার করতে হবে।

জিযিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যৌক্তিকতা এবং মূল্য অপরিসিম কারণ-

প্রথমতঃ রাষ্ট্র সরকার দেশের সর্বাপেক্ষা সুসংগঠিত ও বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান। সমগ্র দেশের রক্ষণা-বেক্ষণ, জীবিকা পরিবেশণ ও নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব একমাত্র এই প্রতিষ্ঠানেরই উপর অর্পিত হয়ে থাকে। সুতরাং ইহার আর্থিক প্রয়োজন সর্বাধিক, তীব্রতর ও অপরিহার্য।

দ্বিতীয়তঃ ইসলামী রাষ্ট্র একটি আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র হওয়ার কারণে দেশ রক্ষা ও যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজের নীতিগত ও মূলগত রাষ্ট্রীয় আদর্শে বিশ্বাসী মুসলিম নাগরিকদের উপর ন্যাস্ত হয়, অমুসলিমদের উপর নয়। তাই রাষ্ট্রের উপর কোনরূপ বহিরাক্রমন হলে দেশরক্ষা কাজের জন্য সর্বতোভাবে ঝাপিয়ে পরা দেশের সকল মুসলিমদের ধর্মীয় উপর ফরয বিশেষ। কিন্তু অমুসলিমদের অবস্থা অনুরূপ নহে। এজন্য ইসলামী রাষ্ট্র তাদের নিকট থেকে দেশরক্ষা খাতে একটি বিশেষ কর আদায় করার নীতি অবলম্বন করেছে। এ হিসেবে এই ব্যবস্থাকে "সুবিচার পূর্ন কর্ম বন্টন" বলা যেতে পারে। কারণ এর ফলে দেশ রক্ষার ব্যাপারে মুসলিমগন জনশক্তি (Manpower) সরবরাহ করবে। আর দেশের অমুসলিমগন আর্থিক প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করবে। বস্তুতঃ ইসলামী রাষ্ট্রের দেশরক্ষা সংক্রান্ত কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার মৌলিক দায়িত্ব ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসীদের উপর ন্যস্ত করা এবং সে জন্য আর্থিক প্রয়োজন পূরণের প্রধান দায়িত্ব আদর্শে অবিশ্বাসীদের উপর অর্পন করার মূলে কোন পক্ষপাত মূলক বা বৈষম্য মূলক ভূমিকা বর্তমান নেই।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, এরূপ করার নাম "জিযিয়াই" রাখতে হবে, ইসলামী অর্থনীতিতে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অমুসলিমগন ইচ্ছা করলে জিযিয়া

Dhaka University Institutional Repository

প্রদানকারী মুসলমানদের ন্যায় যাকাত দেয়ার প্রথাও চালু করতে পারে। জিযিয়া কিংবা অনুরূপ অর্থ কেবল সেসব লোকের নিকট হতে আদায় করা হবে সাধারনতঃ যাদের যুদ্ধ করার ক্ষমতা আছে এবং সেই সংগে এরূপ অর্থদানের সামর্থও রয়েছে। পক্ষান্তরে যাদের অনুরূপ ক্ষমতা নেই-যেমন স্ত্রীলোক, শিশু, অক্ষম বৃদ্ধ, পাগল, অন্ধ ও পংগু লোক কিংবা যারা নীতিগত ভাবে যুদ্ধ বিমুখ বা যুদ্ধ বিরোধী যথা পাদ্রী, পুজারী, ঠাকুর, গৃহত্যাগী বৈষ্ণব, বৈরাগী প্রভৃতি তাদের উপর এ ধরণের কোন করই ধার্য হবে না।

যেখানে সকল প্রকার ধনী মুসলমানের উপরই যাকাত আদায় করা ফরয সেখানে অমুসলিমদের উপর একমাত্র "জিযিয়া" কর আদায়ের নীতি প্রয়োগে তাদের প্রতি যে কোনরূপ অবিচার করা হয় না তা অতিসহজেই বোধগম্য হয়।

জিযিয়ার পরিমাণ নির্ধারণের কাজ রাষ্ট্র-সরকার ও মুসলিম সংখ্যা লঘুদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন করাই হল ইসলামী অর্থব্যবস্থার সঠিক পন্থা। সকল ধনাট্য উপার্জনশীল ব্যক্তির আর্থিক সামর্থ ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন এই উভয় দিকে লক্ষ্য রেখে এবং দাতা-গ্রহীতা কারো প্রতি যেন বিন্দুমাত্র অবিচার না হয় সে দিকে উভয়ের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

জিযিয়া কর সাধারনতঃ টাকায় আদায় করা হবে। তবে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে বিশেষ কোন শিল্প পন্যের আকারেও তা আদায় করা অসংগত হবে না। নবী করিম (সঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদিন বিভিন্ন শিল্পোৎপাদনকারীদের নিকট হতে জিযিয়া বাবদ শিল্প পন্য গ্রহণ করেছেন বলে আল-আহকামুস সুলতানিয়া, কিতাবুল আমওয়াস এবং কিতাবুল খারাজসহ অনেক কিতাবে বর্ণিত আছে।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবু ইউসুফ বলেছেন-"জিযিয়া কেবল মাত্র সক্ষম পুরুষদের উপরই ধার্য হবে। স্ত্রী ও শিশু-বালক ইত্যাদি অক্ষম ও সামর্থহীনদের উপর উহা ধার্য হবে না।" তিনি আরো বলেছেন-দান গ্রহণ যোগ্য গরীব-মিসকীন, আয়-উপার্জনহীন অন্ধ ও ভিক্ষাবৃত্তি নির্ভর অমুসলিমের উপর জিযিয়া ধার্য হবে না।[১]

জিযিয়া বৎসরে মাত্র এক বারই আদায় করা হবে, তার অধিক নয়। এ ব্যাপারে নবী করীম (সঃ) এর চূড়ান্ত ঘোষণা হল-"যে ব্যক্তি কোন 'চুক্তিবদ্ধ জাতির' (অমুসলিম সংখ্যা লঘুর) প্রতি জুলুম করবে কিংবা তাদের সামর্থ্যের অধিক কোন কাজের বোঝা তাদের প্রতি চাপিয়ে দিবে (কিয়ামতের দিন) আমি তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করব এবং প্রতিবাদী হব।"

হযরত ওমর (রাঃ) এর ইন্তেকালের পূর্ব মূহুর্তে এরই ভিত্তিতে বলেছেন-"আমার পরে যিনি খলিফা পদে নির্বাচিত হবেন তাঁকে আমি অসিয়ত করতেছি যে, তিনি যেন রাসূলে করীম (সঃ)-এর গৃহীত দায়িত্বপূর্ণ মাত্রায় পালন করেন। যিম্মিদের সাথে করা সব ওয়াদা যথাযথ ভাবে পূরণ করেন। তাদের পক্ষ হতে প্রয়োজন হলে যেন যুদ্ধ করেন এবং তাদের শক্তি ও সমর্থের অধিক কোন কাজের দায়িত্ব যেন তাদের উপর চাপিয়ে না দেন।[২]

জিযিয়া কর হিসেবে যে রাজস্ব আদায় হবে উহা রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তথা বায়তুলমালে জমা হবে। এই জমাকৃত অর্থ রাষ্ট্রের সকল জনগনের সার্বিক কল্যানে এবং উৎকর্ষ সাধনে ব্যয় করা হবে। এখান থেকে অমুসলিমদেরও কল্যাণে অর্থ ব্যয় এমন কি ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যও অর্থ ব্যয় করা হবে।"

১। ইমাম আবু ইউছুফ, কিতাবুল খারাজ, পাতা নং-১১২

২। ইমাম আবু ইউছুফ, কিতাবুল খারাজ, পাতা নং-১২৫

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত

যাকাত ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম একটি। নামাজ রোজার মতই যাকাত ফরয। আল কুরআন -এ বারংবার সালাত কায়েমের পাশাপাশি যাকাত প্রদানের হুকুম রয়েছে। বলা হয়েছে সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।[১] সমাজে ধন-সম্পদের আবর্তন ও বিস্তার সাধনের উদ্দেশ্যেই ধনীদের উপর যাকাত ফরয করা হয়েছে। দরিদ্র ও অভাবগ্রস্থ লোকদের মধ্যে ইহা বন্টন করতে হয়। দেশের অর্থনৈতিক ও সমাজিক উন্নয়নে ইহা সবচেয়ে বেশী কার্যকরী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

যাকাত আরবী শব্দ। আভিধানিক অর্থ পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়া, প্রবৃদ্ধি লাভ, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতা, সুসংবদ্ধতা ইত্যাদি ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় যদি কোন মুসলমানের নিজের এবং পরিবার পরিজনের প্রয়োজনীয় বাৎসরিক ব্যয় মেটানোর পর অতিরিক্ত সম্পদ নিসাব পরিমান অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা সোনা অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা উহার সমপরিমাণ অর্থ-সম্পদ থাকে এবং তা পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয়, তবে উক্ত সম্পদের শতকরা আড়াই ভাগ শরীয়তের নির্ধারিত আটটি খাতে প্রদান করাকে যাকাত বলা হয়।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইন (রঃ) এর মতে ব্যক্তিমালিকানাধীন সম্পদের নিসাব পূর্তির পর যেকোন মুসলিম দরিদ্রকে শরীয়তের নির্ধারণ অনুযায়ী সেখান থেকে ধন সম্পদ দেয়াই যাকাত।

আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী (১৯৮৪, ইসলামে যাকাত বিধান, প্রথম খন্ড, ঢাকা ইঃ ফাঃ বাঃ পৃঃ ৪২, এ উল্লেখ করেছেন) এর মতে কোন ব্যক্তি কর্তৃক যাকাত পাবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে তার কোন নির্দিষ্ট মালের (নিসাব পরিমাণ মাল অথবা তার বেশী) নির্ধারিত অংশের মালিকানা অর্পন করাকে ইসলামী পরিভাষায় যাকাত বলে।[২]

ইসলামের দৃষ্টিকোন থেকে যাকাত সম্পদ পরিশুদ্ধ করার জন্যই ব্যবহৃত হয়। যেমন সূরা আত্ তাওবা এর ১০৩নং আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেছেন, "তাদের অর্থ সম্পদ থেকে যাকাত উসূল করো যা তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।" আল কুরআনের দৃষ্টিতে সালাত যেমন একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত,তদ্রুপ যাকাতকে উৎপত্তির দিক থেকে স্বর্গীয়, আদেশের দিক থেকে ধর্মীয়, প্রকৃতিগত দিক থেকে নৈতিক এবং আওতায় ও প্রয়োগের দিক থেকে সামাজিক বলে আখ্যায়িত করা যায়।

১। সূরা আল-বাক্বারা, আয়াত নং- ৪৩

২। আল্লামা ইউসফ কারযাবী, ইসলামের যাকাত বিধান, ১ম খন্ড, ইঃফাঃবাঃ ঢাকা, ১৯৮৪, পৃঃ নং- ৪২

Dhaka University Institutional Repository

সূরা বাক্বারার ৮৩, ১১০ এবং ২৭৭ নং আয়াতে নামাজ কায়েম করার পাশাপাশি যাকাত আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। সূরা আন-নিসা এর ৭৭ ও ১৬২ আয়াতে, সূরা আন্-নূরের ৫৬নং আয়াতে, সূরা আল-আহযাবের -৩৩ নং আয়াতে, সূরা মুজাম্মিলের ২০ নং আয়াতে নামাজ কায়েম করার এবং যাকাত আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। এভাবে কুরআনের ২৬ জায়গায় নামাজের সাথে যাকাত আদায় করার জন্য নির্দেশ রয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরও বলেন –

"মুশরিকদের জন্যে রয়েছে ধ্বংস, যারা যাকাত দেয়না।"(১)

"আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমরা যে যাকাত দাও মূলতঃ তা যাকাত দান কারীরই সম্পদ বৃদ্ধি করে।"(২)

প্রিয় নবী (সঃ) বলেছেন– যাকাত মুসলিম সমাজের ধনীদের নিকট হতে আদায় করা হবে এবং সেই সমাজেরই গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে।(৩)

যাকাত ফরজ করে আল্লাহপাক প্রত্যেকটি মানুষকে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছাক্রমেই প্রয়োজনতিরিক্ত ধনমাল হতে আল্লাহর নির্দিষ্ট হিস্যা আদায় করে এবং আল্লাহর বান্দাহদের যথাসাধ্য সাহায্য করে, বস্তুতঃ সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাজ করার উপযুক্ত, ঈমানদারদের মধ্যে গণ্য হওয়ার যোগ্যতা তারই রয়েছে। পক্ষান্তরে যার অন্তর এতদূর সংকীর্ণ যে, আল্লাহর জন্য এতটুকু কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়না, তার দ্বারা আল্লাহর কোন কাজই সাধিত হতে পারে না, প্রকৃত পক্ষে সে মানবদেহের একটি পঁচা অংগ যা যত শীঘ্র কেটে বিচ্ছিন্ন করা যায় শরীরের অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পক্ষে ততই মংগল। অন্যথায় সমগ্র দেহেই পচঁন শুরু হবে। এজন্যই হযরত রাসূলে করীম (সঃ) এর ইন্তেকালের পর যখন আরবের কোন এক গোত্রের লোক যাকাত আদায় করতে অস্বীকার করেছিল তখন প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা ঘোষণা করেছিলেন, অথচ তারা নামাজ পড়তো, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের প্রতি তাদের ঈমান ছিল। এতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, যাকাত আদায় না করলে নামাজ রোযা সহ তার কোন ইবাদত আল্লাহর কাছে গৃহীত হতে পারে না, এরূপ ব্যক্তি ঈমানদার হবার কোন দাবী করতে পারেনা।

১। সূরা হামীম, ৬ – ৭ আয়াত
২। সূরা আররুম, আয়াত নং- ৩৯
৩। বুখারী কিতাবুজ যাকাত, পাতা নং-১৮৭)

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববর্তী নবী রাসূলদের জামানায় যাকাত

যাকাতের বিধি নিষেধ শুধু উম্মতে মুহাম্মাদীর উপরই নাযিল হয়নি, অতীতকালে অন্যান্য নবীদের উম্মতের উপরেও আল্লাহর পক্ষ হতে এই হুকুম ছিল। কুরআনমজীদ থেকে নিঃসন্দেহে জানতে পারা যায়, প্রাচীনকাল থেকে প্রত্যেক নবীর উম্মতের প্রতিই সমানভাবে নামাজ ও যাকাত আদায় করার কঠোর আদেশ করা হয়েছিল। দ্বীন ইসলামের কোন অধ্যয়েই,কোন নবীর সময়ে, কোন মুসলমানকেই নামাজ ও যাকাত থেকে রেহাই দেয়া হয়নি। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং তাঁর বংশের নবীদের কথা আলোচনা করার পর কুরআন পাকে বলা হয়েছেঃ-

"আমরা তাদেরকে মানুষের নেতা বানিয়েছি, তারা আমাদেরই বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করে, পথ প্রদর্শন করে। আমরা ওহীর সাহায্যে তাদেরকে ভাল কাজ করার, নামাজ কায়েম করার এবং যাকাত আদায় করার আদেশ করেছি; তারা সঠিকভাবে আমার ইবাদত করতো হুকুম পালন করতো।"(১)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক হযরত ইসমাইল (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন "তিনি তাঁর লোকদেরকে "নামাজ" এবং "যাকাত" আদায় করার আদেশ করতেন এবং আল্লাহর দরবারে তিনি অনেক মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন।"(২)

হযরত মুসা (আঃ) যখন তাঁর নিজের সম্পর্কে দোয়া করেছিলেন – "হে আল্লাহ! এ দুনিয়ায় আমাদের মঙ্গল দাও, পরকালেও কল্যাণ দান কর।" এর উত্তরে আল্লাহ বলেছিলেন –

"যাকে ইচ্ছা হবে, তাকে আমার আযাবে নিক্ষেপ করবো, যদিও আমার রহমত সকল কিছুর উপরই পরিব্যাপ্ত আছে' কিন্তু তা কেবল সেই লোকদের জন্যই নির্দিষ্ট করবো যারা আমাকে ভয় করবে এবং যাকাত আদায় করবে,আর যারা আমার বানীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে।"(৩)

হযরত রাসূলে করীম (সঃ)-এর পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ)- ই সর্বশেষ নবী ছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকেও একই সাথে নামাজ এবং যাকাতের হুকুম দিয়েছিলেন, যেমন বলা হয়েছে –

"আল্লাহ আমাকে মহান করেছেন যেখানেই আমি থাকি এবং যতদিন আমি জীবিত থাকবো ততদিন নামাজ পড়া ও যাকাত আদায় করার জন্য আমাকে নির্দেশ করেছেন।"(৪)

এ থেকে নিঃসন্দেহে জানতে পারা যায় যে, দ্বীন ইসলাম প্রত্যেক নবীর সময়েই নামায ও যাকাত এ দুটি স্তম্ভের উপর দাড়িয়ে ছিল।

১। সূরা আম্বিয়াঃ ৭৩ আয়াত

২। সূরা, মরিয়মঃ ৫৫ আয়াত)

৩। সূরা আল আরাফঃ আয়াত নং- ১৫৬

৪। সূরা, মরিয়ম, আয়াত নং- ৩১

Dhaka University Institutional Repository

যাকাতের নিসাব

নিসাব হল শরীয়াহ নির্ধরিত সম্পদের নিম্নতম পরিমান। এই পরিমান নির্ধারণের জন্য একজন মুসলমানের প্রতি চন্দ্র বছরের প্রথম ও শেষে তার সম্পদের হিসাব করে যে পরিমাণ সম্পদ পাওয়া যায় তা থেকে তার নিজের স্ত্রীর, ছেলে, মেয়ে এবং অনন্যা নির্ভরশীল ব্যাক্তিদের দায় - দেনাবাদ দিয়ে এভাবে হিসাব করে যে ব্যালেন্স পাওয়া যায় তা যদি সাধারণ ভাবে ৫২.৫ তোলা রূপা অথবা ৭.৫ তোলা সোনার সমতুল্য হয় তাহলে সেই পরিমান কে শরীয়তের পরিভাষায় নিসাব বলে এই নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলেই তাকে যাকাত দিতে হয়।

সকল প্রকার বর্ধিষ্ণু অথবা পরিবর্ধণযোগ্য সম্পদের উপরই যাকাত ধার্য হবে। ইহার লক্ষ্য হচ্ছে যুগপৎভাবে ধনীর হৃদয় ও তার ধন-মালের পরিশুদ্ধি। আর যাকাত সঠিকভাবে আদায় করলে যে উদ্দেশ্য পুরাপুরিভাবেই বাস্তবায়িত হতে পারে, তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

যাকাত ধার্যযোগ্য সম্পদ প্রধানতঃ দু'প্রকার, প্রথমমতঃ সাধারণ প্রকাশ্য সম্পদঃ যথা– গরু, ছাগল, উট, প্রভৃতি গৃহপালিত পশু।

দ্বিতীয়ত্ব; অপ্রকাশ্য সম্পদ। যথা – স্বর্ণ, রূপা, টাকা-পয়সা, ব্যবসায় পণ্য ইত্যাদি।

বংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পালিত পশুর উপর যাকাত ফরজ হবে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা পর্যন্ত পৌছলে, যেমন- বিশটি গরুর মধ্যে একটি যাকাত বাবদ আদায় করতে হবে। ব্যবসার জন্য পালিত হলে ব্যবসার পণ্য হিসেবে মোট মূল্যের শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে। এই উভয়বিধ দ্রব্য সম্পদের যাকাতা আদায় করার জন্য পণ্য এক বছর অতিবাহিত হতে হবে। কেননা এ প্রসঙ্গে নবী করিম (সঃ) বলেছেন–

মালিকের মালিকানাধীন কোন সম্পদের পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হবার পূর্বে তার উপর কখনও যাকাত ধার্য হবেনা।

Dhaka University Institutional Repository

স্বর্ণ, রৌপ্য, নগদ টাকা, ব্যবসায় পণ্য ও কারখনায় উৎপন্ন দ্রব্যের উপর যাকাত ফরয হওয়ার নিম্নতম পরিমাণ সাড়ে বায়ান্ন তোলা। অলংকারে ব্যবহৃত স্বর্ণ অথবা রৌপ্যে উক্ত হিসেব অনুসারে যাকাত ফরয হবে। নবী করীম (সঃ) বলেছেন –

রৌপ্য শতকরা আড়াই টাকা যাকাত ধার্য হয়। এর কম পরিমাণ হলে তাতে কোন যাকাত নেই। ব্যবসায় পণ্যের উপর যাকাত ফরয হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত হাদীসখানা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সামুরা বিন্ জুন্দুব কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে – তিনি বলেছেন যে, হযরত রাসূলে করীম (সঃ) আমাদেরকে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুতকৃত দ্রব্যাদি হতে যাকাত আদায় করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১]

ফকীহ আল-কাসানী- লিখেছেন –

ব্যবসায় পণ্যে যাকাতযোগ্য পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে উহার আর্থিক মূল্যে অনুযায়ী টাকার ভিত্তিতে। তাই যার মূল্য দুইশত বিশ মিসকাল স্বর্ণ পরিমাণ হবেনা, তাতে যাকাত ধার্য হবে না। তবে ঐ পরিমাণ হলে তাতে অবশ্য যাকাত ধার্য হবে। আলেমগণও এই মতই পোষণ করেন।

অন্য এক প্রসঙ্গে নবী করীম (সঃ) বলেছেন – মুসলিম নারীদেরকে তাদের অলংকারের যাকাত আদায় করার নির্দেশ দাও।

ধাতব মুদ্রা ও কাগজের নোট উভয়ের উপর যাকাত ফরয হবে। কারণ এই উভয় প্রকার মুদ্রায়ই সমান পরিমাণ ক্রয় ক্ষমতা বিদ্যমান, ব্যাংকে গচ্ছিত টাকায়ও এক বৎসরান্তে যাকাত ফরয হবে। অন্যান্য রেজিস্ট্রি গচ্ছিত টাকারও অনুরূপভাবে যাকাত ফরয হবে। বৈদেশিক মুদ্রাকে দেশীয় মুদ্রায় পরিবর্তন করা হলে তা নিঃসন্দেহে নগদ টাকার সমতুল্য। অতএব, তা হতেও যাকাত আদায় করতে হবে, কিংবা তাতে যাকাত ফরয হবার পরিমাণের স্বর্ণ, রৌপ্য থাকলে তার উপরও যাকাত ধার্য হবে।

নিম্নে যাকাতের বিভিন্ন নিসাব ও হার সম্বলিত একটি টেবিল প্রদত্ত হল, যা থেকে একটা সু-স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

১। আবু দাউদ শরীফ; কিতাবুয জাকাত

Dhaka University Institutional Repository

নং	উপাদান	নিসাব (সর্বনিম্ন পরিমাণ যা থাকতে হবে)	যাকাতের হার
০১	নগদ বা ব্যাংক রক্ষিত অর্থ এবং ব্যবসায়িক সম্পদ	৫২.৫ তোলা রৌপ্যের মূল্যমান	অর্থ ও দ্রব্য মূল্যের ২.৫%
০২	সোনা, রূপা, সোনা/রূপার গহণ	সোনা ৭.৫ তোলা এবং রূপা ৫২.৫ তোলা	মূল্য বা দ্রব্যের ২.৫%
০৩	কৃষি পন্য/কৃষি হাত ফল-ফসল	তিনটি মত ◈ যেকোন পরিমাণ (ইমাম আবু হানিফা) ◈ ৫ ওয়াসাক (অন্যান্য ইমাম) ◈ ৯৪৮ কেজি (ইসলামিক ইকোনমিক্য রিসার্স ব্যুরো)	ক) বৃষ্টি, বর্ণনার পানি সিক্ত বা প্রকৃতিগতভাবে উৎপাদিত ফসলের ১০% খ) সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের ৫%
০৪	খনিজ সম্পদ	যেকোন পরিমাণ	উত্তোলিত দ্রব্যের ২০% বা মূল্যমান
০৫	ছাগল/ভেড়া	(৪০)টি ---------- ৪০-১২০টি ---------- ১২১-২০০টি ---------- ২০০ তদুর্ধ----------	একটি ছাগল/ভেড়া ২টি ছাগল/ভেড়া ৩টি ছাগল/ভেড়া অথবা, প্রতি শ'বা তার প্রতি অংশের জন্য ১টি করে বৃদ্ধি
০৬	গরু/মহিষ	(৩০)---------- ৩০-৩৯ ---------- ৩০-৩৯ ---------- ৪০-৪৯ ---------- ৫০টি	১টি ১ বছরের বাছুর ১টি ২ বছরের বাছুর ১টি ২০ বছরের বাছুর প্রতি ১০টিতে ২ বছরের এক বছরের $^{১}/_{৪}$ বছরের মূল্যমান
০৭	উট	(৫) ---------- ৫-৯ ---------- ১০-১৪টি ---------- ১৫-১৯টি ---------- ২০-২৪টি ---------- ২৫-৩৫টি ---------- ৩৬-৪৫টি ---------- ৪৬-৬০টি ---------- ৬১-৭৫টি ----------	১টি ছাগল/ভেড়া ঐ ১ বছরের ২টি বকরি ১ বছরের ৩টি বকরি ১ বছরের ৪টি বকরি ১ বছরের ১টি মাদি উট ২ বছরের ১টি মাদি উট ৪ বছরের ১টি মাদি উট ৫ বছরের ১টি মাদি উট

Dhaka University Institutional Repository

		৭৬-৯০টি---------- ৯০-১২০টি---------- ১২০ এর প্রতি ৫০টির জন্যে/বা তদুর্ধ	২ বছরের ২টি মাদি উট ৪ বছরের ২টি মাদি উট
০৮	ঘোড়া	-	তিনটি মত ◈ কোন যাকাত নাই ◈ মূল্যমানের ২.৫% ◈ প্রতিটিতে ১দিনার
০৯	শেয়ার, ষ্টক ইত্যাদি	৫২.৫ তোলা রূপার মূল্যমান	মূল্যমানের ২.৫% তবে কোম্পানী যাকাত প্রদান করলে ব্রক্তিগতভাবে আর যাকাত প্রদান করতে হয়না।
১০	শরিকানা বা মুদারাবা ব্যবসায়	৫২.৫ তোলা রূপার মূল্যমান	প্রথমে সম্পদের মূল্যের উপর যাকাত ২.৫% দিয়ে লভ্যাংশে বন্টন করা হবে। তারপর ব্যক্তিগত আয়ের যাকাত দিতে হবে। মুদারাবায় ২ ভাগ দিবে সাহিব-আল- মাল ও ১ ভাগ দিবে মুদারিব।

উৎসঃ[১]

যাকাত প্রদানের জন্য ফল-ফসলাদি, খনিজ সম্পদ, গুপ্তধন, মধু এবং বাণিজ্যিক খামারের মাছের ক্ষেত্রে বছর পূর্ণ হওয়ার শর্ত প্রযোজ্য নয়। বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে উট ও ঘোড়া পোষলে তার যাকাত আদায় করতে হবে। খনিজ সম্পদের উপর ২০% যাকাত প্রদানের বিধান থাকলেও বর্তমানে সকল দেশেই খনিজ সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় রয়েছে।

১। হেদায়া এবং হটস্ অন্ ইসলামিক ইকোনোমিক্স (১৯৮০) (সম্পা) ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্স ব্যুরো, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

যে সকল সম্পদের যাকাত হয়না

যে সকল সামগ্রীর, সম্পদের যাকাত দিতে হয় না সে গুলো হলো ঃ-

১) নিসাব অপেক্ষা কম পরিমাণ অর্থ সম্পদ।

২) নিসাব বছরের মধ্যেই অর্জিত ও ব্যয়িত সম্পদ।

৩) ঘর-বাড়ী, দালান কোঠা যেখানে বসবাস করা হয়, দোকান পাট ও কলকারখানা হিসেবে যা ব্যবহৃত হচ্ছে।

৪) ব্যবহার্য সামগ্রী কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র, গৃহস্থলীর তৈজসপত্র, বই পত্র।

৫) যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম।

৬) শিক্ষার সমুদয় উপকরণ।

৭) ব্যবহার্য যানবাহন।

৮) পোষা পাখী ও হাঁস মুরগী।

৯) ব্যবহারের পশু ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, উট ও যানবাহন।

১০) ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি।

১১) দাখিলা পত্র।

১২) অস্ত্রপাতি।

১৩) পঁচনশীল কৃষি-দ্রব্য।

১৪) বীজ বোপনযোগ্য।

১৫) বছরের মাঝে গৃহীত ও ব্যয়িত সম্পদ।

১৬) দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সম্পদ যা কোন দাতব্য সংস্থার অধীন।

১৭) সরকর কর্তৃক সাহায্যকৃত অর্থ-সম্পদ।

১৮) কৃষিকাজে ব্যবহৃত জন্তু।

১৯) ডেয়ারী ফার্মের পশু।

২০) পুকুরের মাছ (ব্যবসার উদ্দেশ্যবিহীন ইত্যাদি।)

Dhaka University Institutional Repository

যাদের জন্য যাকাত নয়

যারা যাকাত পাবেনা এধরণের লোকদের সম্পর্কেও একটা ধারণা থাকা দরকার যেমনঃ

(১) ফকীহ্ গণের মতে "সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ যাকাতের অর্থ পাবেনা। তবে তারা যদি যাকাত আদায়কারী অথবা নওমুসলিম, মুজাহিদ অথবা মুসাফির হয় তবে তারাও যাকাত পেতে পারে।

(২) যেসকল লোক কাজকর্ম করার ক্ষমতা রাখে তারা যাকাতের হকদার নয়। কারণ তারা নিষ্কর্ম থেকে অন্যের উপর নির্ভরশীল হবে শরীয়াহ্ তা অনুমতি দেয়নি। তবে তারা যদি কাজ না পায় অথবা যে আয় হয় তা দিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে সাংসারিক ব্যয় ভার সম্ভব নয় এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির যাকাতের অর্থ গ্রহণ করতে পারে।

(৩) মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যাঃ ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী, পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী এবং নাতি-নাতীদের যাকাত দেওয়া যাবে না। এর কারণ এদের প্রতি যে দায়-দায়িত্ব রয়েছে তা নিজের সম্পদ হতেই পূরণ করতে হবে। যাকাতের অর্থ দিয়ে নয়, তবে নিজের ভাই-বোন যদি অসহায় হয়ে থাকে অথবা আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে যদি কেহ অভাবগ্রস্থ থাকে তবে তাকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে।

(৪) মহানবী (সঃ) এর পরিবার পরিজনঃ প্রিয় নবী (সঃ) এর পরিবারের সদস্য, কখনো যাকাতের অর্থ গ্রহণ করেননি, বরং গণিমতের মাল হতে একটা অংশ গ্রহণ করেছেন। বনু হাশিম ও বনু আব্দুল মোত্তালিব মহানবীর পরিবার হিসেবে গণ্য হয়। শরীয়াহ অনুসারে এই পরিবারের সদস্যরাও যাকাত গ্রহণ করতে পারবেনা।

(৫) কাফির মুশরিকঃ শরীয়াহ বিশেষজ্ঞরা একমত যে যারা ইসলামের অনুসারী নয় তাদের যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবেনা। যদি কাফির অথবা মুশরিক তথা অমুসলিমদের যাকাতের অর্থ দিয়ে সাহায্য করা হয তবে তারা আরও শক্তিশালী হবে। অথচ যাকাতের উদ্দেশ্যে হত দরিদ্র ও অভাবী মুসলিমদের কল্যাণের জন্য চেষ্টা করা, তাদের প্রয়োজন পূরণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত ফরয হওয়ার শর্তাবলী

১) যাকাত দাতাকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে। কোন অমুসলমানের উপর যাকাত ফরয নয়।

২) যাকাত দাতাকে অবশ্যই প্রাপ্ত বয়স্ক (বালিগ) হতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কের উপর মালিকানা স্বত্ত্বেও তার যত ধন- সম্পদই থাকুক না কেন তার কোন যাকাত দিতে হয় না। (হেদায়া)

৩) যাকাত দাতাকে স্থীর মস্তিষ্কের অধিকারী হতে হবে। বিকৃত মস্তিষ্কের লোকের উপর যাকাত ফরয নয়।

৪) অর্থ-সম্পদের পূর্ণ মালিকানা থাকতে হবে। যার ধন-সম্পদ আছে, কিন্তু সে তার মালিক নয়, এ অবস্থায় তাকে যাকাত দিতে হবেনা।

৫) যাকাত দাতাকে স্বাধীন হতে হবে। কোন কৃতদাসের উপর যাকাত ফরয নয়।

৬) ধন-সম্পদ নিসাব পরিমাণ থাকতে হবে। নিসাবের কম হলে যাকাত ফরয নয়।

৭) ধন-সম্পদ প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে। কারণ জীবন ধারণের জন্যে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যেমন – বাসগৃহ, আসবাবপত্র সহ নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর উপর যাকাত দিতে হয়না।

৮) ধন-সম্পদ পূর্ণ এক বৎসর অধিকারে থাকতে হবে। এরকম সময় হলে তাতে যাকাত দিতে হবেনা।

৯) ঋণমুক্ত থাকাঃ যদি কোন ব্যক্তির নিকট নিসাব পরিমাণ ধন সম্পদ থাকে অথচ উক্ত ব্যক্তি এমন পরিমাণ ঋণ আছে যা শোধ করলে তার নিসাব পূর্ণ হয় না এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তিকে যাকাত দিতে হয়না।

১০) ধন-সম্পদ বর্ধিষ্ণু হতে হবে, যদি বর্ধিষ্ণু না হয় তবে উহার যাকাত দিতে হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহে যাকাত

বর্তমানে বিশ্বের যে কয়টি মুসলিম দেশ আছে তার মধ্যে মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশে রাষ্ট্রীয় নির্দেশে প্রশাসনিকভাবে যাকাত আদায় করা হয়ে থাকে। অধিকাংশ দেশেই রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় হয়না। যেসব দেশে রাষ্ট্রীয়ভবে যাকাত আদায় হয় সেগুলো হল সৌদি আরব, পাকিস্তান, ইরান, মালয়েশিয়া, লিবিয়া, জর্দান, বাহরাইন, সুদান, কুয়েত, ও ইয়েমেন। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেই বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত আদায়ের জন্যে সৌদীআরবে ১৯৫১ সালে, লিবিয়ায় ১৯৭১ সালে, জর্দান ১৯৭৮ সালে, বাহরাইনে ১৯৭৯ সালে, কুয়েতে ১৯৮২ সালে এবং লেবাননে ১৯৮৪ সালে যাকাত আদায়ের ব্যাপারে আইন প্রনীত হয়। ইসলামী গবেষকদের মতে রাসূলে করীম (সঃ) কর্তৃক রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় শুরু হবার পর থেকে আজও কেবলমাত্র ইয়েমেনে সেই বিধানই চালু রয়েছে।

ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, বাংলাদেশ, ওমান, কাতার প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে কিছু উদ্যোগ পরিলক্ষিত হলেও তা বাধ্যতামূলকভাবে করা হয় নাই। যে কারণে যাকাত দাতাদের কাছে তেমন গুরুত্ব বয়ে আনতে পারে নাই। বাংলাদেশে যাকাত বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮২ সালে। এই বোর্ডের তহবিলে যাকাতের অর্থ জমা দেয়া সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। তাই এ পর্যন্ত এর গড় বার্ষিক আদায় কুড়ি লক্ষ টাকার বেশী নয়। সে তুলনায় চট্টগ্রামের বায়তুস শরফ কমপ্লেক্সের গড় বার্ষিক যাকাত সংগ্রহের পরিমাণ ছয় লক্ষ টাকার উপর এবং হাট হাজারী মুইনুল ইসলাম মাদ্রাসার বার্ষিক যাকাত প্রাপ্তির পরিমাণ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বেশী।

আমাদের প্রতিবেশী অমুসলিম দেশ ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত বহু এলাকায় রাজনৈতিক দল ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমূহ পরিকল্পিতভাবে যাকাত আদায় ও বন্টন করে থাকে। দাঙ্গা উপদ্রুত এলাকার মুসলমানদের জন্যে এই অর্থের সিংহভাগ ব্যয় হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সৌদীআরবে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান যাকাত দিতে অস্বিকার করলে জরিমানাসহ বিভিন্ন ধরণের আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। শুধু যাকাত প্রদান করলেই শেষ নয়, সৌদি ও কুয়েতে যাকাত প্রদানের রশিদ গেথে না দিলে কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স মঞ্জুর নবায়ন করা হয়না। মালয়েশিয়াতে রাজ্য সমুহে State Council of Relegion-এর নির্দেশে প্রশাসনিকভাবে যাকাত আদায়ের বিধি রয়েছে। এটি চালু হয় ১৯৮০ সাল হতে। তবে এ ব্যাপারে ফেডারেল সরকারের কোন আইন নেই। বিধি অনুসারে মোট যাকাতের দুই তৃতীয়াংশ সরকারী তহবিলে জমা দিতে হয়। বাকী এক-তৃতীয়াংশ নিজ ইচ্ছানুসারে দান করা যায়। ১৯৮৮ সালে অর্থনৈতিক এক রিপোর্টে জানানো হয় সরকারী হিসাব অনুসারে মালয়েশিয়ায় ঐ বৎসরে যাকাতের প্রক্কালিত পরিমাণ ছিল ৪৭৫.১৫ কোটি টাকা। পক্ষান্তরে রাজ্য সমূহের তহবিলে এ যাকাতের মোট জমার পরিমাণ ছিল মাত্র ৩৯.৩০ কোটি টাকা। তাই সম্প্রতি সে দেশে যাকাত বিধি লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

সুদানে যাকাত তহবিলের আইন পাশ হয় ১৯৮০ সালের আগষ্ট মাসে, কিন্তু তখনও যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলকভাবে করা হয়নি। পরবর্তীকালে ১৯৮৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রনীত আইনে সাহেবে নিসাব সকল মুসলমানের জন্যে যাকাত প্রদান বাধ্যতামূলকভাবে করা হয়।

ইরাকে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খমেনীর সফল ইসলামী বিপ্লবের (১৯৭৯) অব্যবহিত পরেই যাকাত প্রদান বাধ্যতমূলকভাবে করা এবং এর বন্টন ও ব্যবহারের জন্যে সরকারী দপ্তর খোলা হয়।

পাকিস্তানে সার্বিক যাকাত আদায়ের অধ্যাদেশ কার্যকর হয় ১৯৮০ সনের জুন মাসের ২৩ তারিখ হতে। উল্লেখ্য, ইরান ও পাকিস্তানের ব্যাংক সমুহ হতে উৎসমূলেই যাকাত আদায় করে নেয়া হচ্ছে। হিজরী ১৪০৯ সনে যাকাত তহবিলে পাকিস্তানের আয় ছিল ২৬৮.৬০ কোটি টাকা। এই আইনের বিধানে স্থানীয় যাকাত কমিটি প্রশাসনিক কাজে মোট আদায়কৃত অর্থের ১০% এর বেশী ব্যয় করতে পারবেনা। পক্ষান্তরে পূর্ণবাসন ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচীর জন্যে ব্যয় করতে হবে কমপক্ষে ৪৫%, এর জীবন ধারণের ও প্রয়োজন পূরণের জন্য ৪৫% এর বেশী ব্যয় না করার বিধি রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে আদায়যোগ্য যাকাতের পরিমাণ

আমাদের বাংলাদেশের মতো গরীব দারিদ্র দেশে যে পরিমাণ যাকাত আদায় হতে পারে তার একটি বেসরকারী হিসেব নিম্নে প্রদান করা গেলঃ

ক) একটি বেসরকারী হিসেব মতে আমাদের রাজধানী শহর ঢাকা হতে শুরু করে গঞ্জ/বাণিজ্যিক এলাকাতে যেসব কোটি প্রতি বাস করে তাদের সংখ্যা ১০,০০০/- ছড়িয়ে যাবে। এদের মধ্যে অন্ততঃ ১০০ জন ১০০ কোটি টাকা, অথবা তারও বেশী অর্থের মালিক। এরা সকলেই তাদের সঞ্চিত সম্পদ, মজুত অর্থ ও বিভিন্ন ধরণের কারবারের সঠিকভাবে যাকাত হিসেব করলে এবং প্রতিজন গড়ে ন্যুনতম টাকা ২.৫০ লক্ষ হিসেবে যাকাত আদায় করলে বার্ষিক ২৫০ কোটি টাকা যাকাত আদায় হতে পারে।

খ) এদেশের ব্যাংকিং সেক্টর হতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ যাকাত হিসেবে আদায হতে পারে তা কখনও খতিয়ে দেখা হয়নি। উদাহরণ স্বরূপঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ২০০৩ সালে যাকাত আদায় করেছে ৪.৯৬ টাকা কোটিরও বেশী। দেশে চালু অর্থ হতে সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থায় যে নগদ টাকা জমা হয় এবং ব্যাংকগুলো তা অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ব্যবহার করে তার মধ্যে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ এর অংশ মাত্র ০.৪% (অর্থাৎ প্রতি টাকা ১,০০০/- এ টাকা ৪/- মাত্র)। এই ০.৪% অর্থ কাজে লাগিয়েই যদি ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ ৪.৯৬ কোটি যাকাত আদায় করতে পারে তাহলে সমগ্র ব্যাংকিং সেক্টর হতে হিসেব মতো ৯২৪০ কোটি টাকা যাকাত আদায় হবার কথা। এখানে উল্লেখ্য যে বীমা কোম্পানীগুলোকে এই হিসেবের আওতায় ধরা হয়নি।

গ) যেসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা সরকারকে আয়কর দিয়ে থাকে শরীয়া মোতাবেক তাদের সকলেরই যাকাত আদায় করা প্রয়োজন। এরা সঠিকভবে যাকাত আদায় করলে এর পরিমাণ ১,০০০/- কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

ঘ) যারা আয়কর দিয়ে থাকে তারা সকলেই সাহেবে নিসাব। এদের একটা অংশ ব্যক্তিগতভাবে যাকাত আদায় করে থাকে। কিন্তু সকলেই সঠিকভাবে হিসেব অনুযায়ী যাকাত আদায় করলে তার পরিমাণও শত কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

ঙ) যেসব কোম্পানী (ঔষধ, রসায়ন, জ্বালানী প্রকৌশল, খাদ্য, বস্ত্র, গার্মেন্টস, সিরামিক সিমেন্ট নির্মাণ ইত্যাদি) সরকারকে আয়কর দেয় তাদের যাকাত দেয়া উচিত। দেশের বিদ্যমান আইনে এই বাধ্যবাধকতা নেই। এরা যাকাত আদায় করলে তার পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে বলে অধিক মহলের হিসাব।

চ) যেসব মহিলা ব্যাংকের লকারে স্বর্ণ অলংকার রাখে তারা শরীয়াহ আনুযায়ী যাকাত দিতে বাধ্য কিন্তু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ব্যতিত এদের অনেকেই যাকাত আদায় করেন না।

ছ) শহরতলী ও মফাঃস্বল এলাকার ছোট ব্যবসায়ী, আড়ৎদার, হোটেল মালিক, ঠিকাদার অনেকের মধ্যে যাকাত দেয়ার কোন উদ্যোগ দেখা যায়না, অথচ সেসব ব্যক্তির অনেকেই সাহেবে নিসাব, এছাড়া পরিবহন ব্যবসা, ইটের ভাটা, হিমাগার, কনসালটিং ফার্ম, ক্লিনিক বিভিন্ন সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানও যাকাতের আওতাভূক্ত। এদের যাকাতের পরিমাণ বার্ষিক শতকোটি টাকা হওয়া মোটেই অসম্ভব নয়।

জ) যারা সরকারের বিভিন্ন ধরণের মেয়াদী সঞ্চয়পত্র ক্রয় করে রেখেছেন, যারা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিটে টাকা জমা রেখেছেন এবং বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে রেখেছেন, যারা পোষ্টাল সেভিংস একাউন্টে মেয়াদী আমানত রেখেছেন অথবা যারা আইসিবির ইউলিট ফান্ডও মিউচ্যুয়াল ফান্ডের সার্টিফিকেট ক্রয় করেছেন তারাও শরীয়াহ্ অনুসারে যাকাত আদায়ে বাধ্য। এখাত হতে বৎসরে ৩,০০০/- কোটি টাকা যাকাত আদায় হতে পারে।

এক্ষেত্রে একটি তথ্য বিশেষভাবে লক্ষনীয় বাংলাদেশ সরকারের তথ্য অনুযায়ী দেশের ব্যাংক সমূহ ২০০২-২০০৩ সনে মেয়াদী আমানতের পরিমাণ ছিল ৮৭,২৫১ কোটি টাকা[১] মেয়াদী আমানত যেহেতু এক বছরের বেশী সময়ের জন্যে হয়ে থাকে এবং আমানতকারী স্বেচ্ছায় সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যেই জমা রাখে সেহেতু এর যাকাতা আদায় করা ফরয এই অর্থের ২.৫% হারে যাকাতের পরিমাণ দাঁড়াবে ২.১৮১ কোটি টাকার বেশী।[২]

১। বাংলদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৪, পৃঃ ২১৯
২। উপরের সব তথ্য বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৪ হতে গৃহীত

Dhaka University Institutional Repository

উপরে উপস্থাপিত তথ্য হতে দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশে সব ধরণের উৎস মিলিয়ে প্রতি বছর চার হাজার কোটি টাকার মত যাকাত আদায় হওয়া খুবই সম্ভব। তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত হল রাষ্ট্রের পক্ষ থেকেই তা আদায়ের যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে। এজন্যে শরীয়তের বিধান সমূহ জন সাধারণের সামনে বিভিন্ন মাধ্যমে বেশী বেশী করে তুলে ধরতে হবে। একই সঙ্গে অন্যান্য কর আদায়ে সরকার যেমন কঠোর ও আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করে থকে এ ক্ষেত্রেও তা হুবহু অনুসরণ করতে হবে।

যদিও যাকাত এবং তা বন্টনের শরীয়াহ হুকুম সম্পর্কে এদেশের ইসলাম প্রিয় জনগণের মধ্যে কিছুটা হলেও ধারণ রয়েছে। কিন্তু উশর সম্পর্কে তুলনামুলক ধারণা খুবই কম। অথচ উশর ও আর্ধ উশর আদায় ও তা হকদারের মধ্যে সুচারুভাবে বণ্ঠিত হলে গ্রামাঞ্চলে বিদ্যমান নিদারুন দারিদ্র ও চরম বৈষম্যতা বিদ্যমান থাকার কথা নয়। এক্ষেত্রে নির্মম সত্য হলো উশর আদায়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা আসবে বিত্তশালী, জোতদার ও গ্রামীণ মহাজনদের কাছ থেকেই। ইতিহাস সাক্ষ্যদেয় উপমহাদেশের অন্যতম মুজাদ্দিদ ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালার শহীদ সৈয়দ আহমদ বেরেলবীর উদ্দেশ্যে তাঁর হত্যাকারীর নিষ্ঠুর মন্তব্য ছিল – "এখন তোমার উশর বুঝে পেয়েছতো মৌলনা?" এ থেকে বুঝা যায় তার উশর আদায়ের আন্দোলনকে সে সময়ের ধনী জমিদার ও জোতদার মুসলমানরা কিভাবে গ্রহণ করেছিল।

আমাদের দেশে যাকাত খাত হতে প্রাপ্তব্য এই বিপুল অর্থ দিয়ে বিভিন্ন ধরণের ত্রান ও পূণঃবাসনমূলক এবং প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব। অবশ্য এটা একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ের **Action Plan.** প্রয়োজনে এর পরিবর্তন হবে এবং আরো উন্নত থেকে উন্নতমানের কর্মসূচী উদ্ভাবিত হবে। আশা করা যায় এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে আগামী দশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ হতে দারিদ্র দূরীভূত হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

এখানে মনে রাখা দরকার বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন ও মানব সম্পদ উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিৎ পল্লী। তাই প্রস্তাবিত কর্মসূচীগুলো অবশ্যই শহর এলাকার বস্তির পরিবর্তে, পল্লীকেন্দ্রিক হবে। যাকাত ভিত্তিক কর্মকান্ডের মূল উদ্দেশ্যই হবে মানব কল্যাণ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন।

Dhaka University Institutional Repository

সাদাকাহ

সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক সাহায্য দেয়ার জন্য ইসলাম উৎসাহ প্রদান করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এ সাহায্যকে ওয়াজিব বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। এ ধরণের সাহায্য সহযোগিতার নামই হচ্ছে "সাদাক্বাহ।"

আরবীতে 'সাদাক্বাহ' শব্দের বহুবচন সাদাকাত ব্যবহার করা হয়। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে সাদক্বাহ এর প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে। এটাকে ইসলামের একটা বিশেষ নিদর্শন হিসেবে অভিহিত করা হযেছে। যেমন আল্লাহপাক বলেন -

"আল্লাহর রাজ্যে ব্যয় কর এবং স্বহস্তে তোমরা ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করনা।[১]

সাদাক্বাহ্ দেয়ার পদ্ধতি দুই ধরণের, একটি হল ব্যক্তিগত, আর অপরটি হল সামাজিক। ব্যক্তিগত পদ্ধতিতে সাদাক্বাহদানকারী নিজ হাতে তা বন্টন করে দিবে, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যারা গরীব আছে তাদের মধ্যে এবং পারা প্রতিবেশীদের মধ্যে যদি কোন গরীব অভাবী লোক থাকে তাদের মধ্যে। সামাজিক পদ্ধতিতে সাদকাহ দানকারী তার সাদাকার সম্পদ তাঁর মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে হস্তান্তর করবে। তিনি তা বায়তুলমালে জমা করবেন এবং পাওয়ার অধিকারীদের মধ্যে ব্যয় করবেন। সকল সাদাকাহই ব্যক্তিগতভাবেও দান করা যায়। কিন্তু বাধ্যতামূলক সাদাকাহ অবশ্যই বায়তুলমালে জমা করতে হবে।

ওয়াজিব সাদাকাহ এর মধ্যে সাদাকাতুল ফিতর, অথবা রমজান মাসের শেষে ঈদের দিন প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি গরীবদের মধ্যে যে শস্য কিংবা উহার মূল্য রোযার ফিতরা বাবদ বন্টন করে উহার নাম সাদাকায়ে ফিতর। এই সাদাকাহ প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি তার পরিবারের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে আদায় করতে বাধ্য। এ ব্যাপারে রাসূলে করীম (সঃ) বলেছেন - প্রত্যেক স্বাধীন, ছোট-বড়, দাস-দাসীর পক্ষ থেকে অর্ধসাগম অথবা এক সা-যব আদায় কর।[২] যাকাত ও ফিত্‌রার নেসাব সমান, তবে ফিতরার ক্ষেত্রে এক বছর পূর্ণ হওয়া শর্ত নয়।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এর মতে ফিতরার পরিমাণ হল অর্ধসাগম, আটা ছাতু, কিসমিস অথবা এক সা খেজুর, যব।

১। সূরা বাক্বারা, আয়াত নং- ২৫৪
২। আল হেদায়া

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এর মতে উল্লেখিত সব কয়টি জিনিসের ক্ষেত্রেই এক সা-ওয়াজিব হবে। ফিতরা মাথাপিছু (আমাদের দেশীয় হিসাব মতে) একসের সাড়ে তের ছটাক (১৬৫০ গ্রাম) গম। ইহা কোন সাহেবে নেসাব ব্যক্তি নিজের ও তার নাবালক সন্তানের পক্ষ থেকে দিতে হবে। তবে কোন কারণে যদি ঈদের দিন দেয়া সম্ভব না হয় তাহলে পরবর্তীতে তা আদায় করতে হবে।

মুস্তাহাব সাদাক্বাহ হল দান খয়রাত। আল্লাহ বলেছেন, হে মুমিনগন তোমাদের উপার্জিত বস্তুর মধ্যে থেকে তোমরা ব্যয় কর, এভাবে আল। আল্লাহপাক আরো অনেক আয়াতে সকল সাদাকাহর ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। আনসারদের সার্বক্ষনিক মেহমানদারী ছাড়াও নিয়মিত এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সময়মত দানই ছিল মুসলিম সমাজের আয়ের আর্থিক উৎস এবং মদীনার কষ্টের সময়েই নয়, ইসলামী রাষ্ট্র যখন শীর্ষ মর্যাদায় আসীন হয় তখনও এই আর্থিক প্রথা প্রচালিত ছিল। তাবুক যুদ্ধের ঘটনা এর অন্যান্য উদাহরণ। বাধ্যতামূলক সাদাকাহ অবশ্যই বায়তুলমালে জমা করতে হয়, তবে সকল সাদাকাহ ব্যক্তিগতভাবে বন্টন করা বৈধ, ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে উপরোক্ত সব ধরণের সাদাকাহ-ই রাষ্ট্রীয় আয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ইমাম বুখারী (রঃ) লিখেছেন – ইসলামী খিলাফতের যুগে এই সাদাকাও বায়তুলমালে জমা করা হত এবং তথা হতে নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুযায়ী এলাকার গরীবদের মধ্যে উহা বন্টন করা হত।

Dhaka University Institutional Repository

কেরাউল আরদ/রাষ্ট্রীয় ভূ-সম্পত্তির ভাড়া

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান যেসব সরকারী জমি বার্ষিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে চাষাবাদ করার জন্য প্রদান করেন সেসব থেকে আদায়কৃত কর অথবা ভাড়াকে কিরাউল আরদ বলা হয়। এ ধরণের জমি উশরী নয়, আবার খরাজীও নয়, এটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে চাষাবাদ করতে দেয়া হয়। ইসলামী পরিভাষায় ইহাকে আরদুল মুসলিফা (খাস জমি), অথবা আরদুল হাউজাহ (দখলীকৃত জমি) বলা হয়। এ ধরণের জমি দু'প্রকারের হয়ে থাকে। এক ধরণের যার কোন উত্তরাধিকার না থাকার কারণে উহা সরকারের হাতে চলে আসে। এর যাবতীয় আয় – বায়তুলমালে জমা হয়, আর অন্য প্রকার হল সামরিক অভিযানে বিজয়ের ফলে যা মুসলমানদের দখলে আসে। এই জমি মুসলমানদের জন্য ওয়াকফে হিসেবে নির্ধারিত ভাড়ায় চাষাবাদ করতে দেয়া হয়। এসব জমির ভাড়া খারাজভূক্ত জমির খাজনার মত। অর্থাৎ রাষ্ট্র প্রধান পরিমাণ হিসেবে, অথবা ফসল হিসেবে প্রয়োজন মত উহার হার নির্ধারণ করবেন। এ ধরণের জমি থেকেও যা আয় হবে তা বায়তুলমালে জমা হবে।

এধরণের জমিতে ইসলামী রাষ্ট্র ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে কাউকে বিশেষ কোন ব্যবসা অথবা মিল কলকারখানা তৈরী করার জন্য একচেটিয়া অধিকার দান করার প্রয়োজনীয়তা মনে করলে তা কার্যকর করতে পারবে। ইসলামী অর্থনীতির দৃষ্টিতে ইহা বৈধ। তবে উহাতে যদি জনগণের কোনরূপ অসুবিধার সৃষ্টি হয় তবে এক চেটিয়া অধিকার দেয়া সঙ্গত হবে না।

হযরত নবী করীম (সঃ) তায়েফসহ অনেক এলাকা কোন কোন লোককে মৌমাছি পালন ও মধু উৎপাদন শিল্পের জন্য একচেটিয়া অধিকার দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এজন্য তিনি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির জন্য এক একটি উপত্যকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এ সব উপত্যকায় অন্য কারো কিছু করার অধিকার ছিলনা। সংশ্লিষ্ট শিল্প মালিকগণ উৎপন্ন পন্যের এক দশমাংশ রাজস্ব বাবদ বায়তুলমালে জমা করতো। কারণ নবী করীম (সঃ) বলেছেন মধুতেও উশর এক দশমাংশ ধার্য হবে।

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর খিলাফতকালে এসব একচেটিয়া শিল্প পূর্ণঃবিবেচনা করা হয়। তখন আমিরুল মোমেনীন এক ফরমানে বলেছিলেন তারা নবী করিম (সঃ) এর জীবদ্দশায় রাজস্ব বাবদ যা দিত আজও তাই আদায় করে। তবে সংশ্লিষ্ট উপত্যকা তাদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। অন্যথায় সংশ্লিষ্ট উপত্যকা ফেরৎ নেওয়া হবে। কেননা মধু মৌমাছির ফসল। যার ইচ্ছা উহা খাবে।

অনেক চিন্তাবিদদের মনে প্রশ্ন উঠে যে, এরূপ একচেটিয়া শিল্প ব্যবসার সুযোগ ইসলামী সমাজে ধন-বন্টনের ক্ষেত্রে বড় ধরণের বৈষম্যের সৃষ্টি হতে পারে কিনা? এ সম্পর্কে অধ্যাপক বেন্‌হাম-এর নিম্নিলিখিত উক্তিটি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন – একচেটিয়া শিল্প ব্যবসায় ধন-বন্টনে অসমতা ও বৈষম্য সৃষ্টি করে বলে সাধারণতঃ মনে হয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই আশংকা অনেক সময় বাস্তব নাও হতে পারে।[১]

বস্তুতঃ বাহ্যদৃষ্টিতে মনোপলি ব্যবসায়ে পুঁজিবাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও তা কেবল অনৈসলামিক সমাজেই থাকতে পারে। ইসলামী সমাজে মনপলি ব্যবসায়ে পুঁজিবাদ সৃষ্টির সম্ভবনা নেই।

তার কারণ এই যে, প্রথমতঃ এরূপ ব্যবসায়ের উৎপন্ন দ্রব্যের এক দশমাংশ রাজস্ব বাবদ রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে বাধ্যতামূলকভাবে জমা করতে হবে। এতে পুঁজিবাদের মেরুদন্ড চূর্ণ হয়ে যাবে। এতদসত্বেও কারো নিকট অধিক পরিমাণ পুঁজি জমা হলে তার যাকাত, সাদাকা ইত্যাদি আদায় করা অপরিহর্য কর্তব্য হবে। ফলে একজনের চেষ্টা, শ্রম ও তত্ত্বাবধানে সঞ্চিত পুঁজি অনেকজনের জন্যে, অন্যকথায় সমগ্র দেশের জন সমষ্টির সাধারণ কল্যাণে ব্যয়িত হবে।

সুতরাং এই সু-নিয়ন্ত্রিত পুঁজির সমাবেশের কারনেই আপত্তি হতে পারেনা। কারণ ধন-সম্পদের এরূপ সমাবেশকে রাজবাড়ীর রিজার্ভ ট্যাংকের সহিত নয়, পর্বত নির্ঝরের নিরন্তর পানি নিষ্কাশনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

১। বেনহাম কৃত ইকনোমিক পৃঃ নং- ২২৫

Dhaka University Institutional Repository

ফাই

ফাই ঐ সম্পদকে বলা হয় যা শত্রুপক্ষ মুসলিম সৈন্যদের ভয়ে যুদ্ধ না করেই যাবতীয় মালামাল ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তখন এই সম্পদ মুসলমানদের হাতে চলে আসে এ ধরনের সকল সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগার তথা বায়তুলমালে জমা হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইহারও ছিল সরকারী রাজস্বের অন্যতম উৎস। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

"আল্লাহ তা'আলা যা কিছু (ধন সম্পদ) তাঁর রাসূলকে তাদের কাছ থেকে দিয়েছেন সে জন্য তোমরা আর ঘোড়া দৌড়াওনি, আর না উট হাঁকিয়েছ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার রাসূলদের মধ্যে যাঁর উপরে ইচ্ছা প্রধান্য দান করেন, এবং আল্লাহতাআলা প্রতিটি বস্তুর উপর ক্ষমতাবান।[১]

সুতরাং এ সম্পদ গণিমতের সম্পদের মত মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করা যাবে না, কেননা এসব বিনা যুদ্ধে লাভ করা হয়েছে। ইহা সবই বায়তুল মালে জমা হবে।

১। সূরা হাশর, আয়াত নং- ৬

Dhaka University Institutional Repository

খুমুস

খুমুস শব্দের অর্থ এ পঞ্চমাংশ, পাঁচ ভাগের এক ভাগ। যে সকল সম্পদের এক পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয় তাকে বলা হয় খুমুস।

এসকল সম্পদের মধ্যে রয়েছে মালে গনীমাহ, খনিজ সম্পদ, মৃত্তিকায় প্রোথিত সম্পদ ইত্যাদি। কাফিরদের সহিত যুদ্ধ করে ইসলামী মুজাহিদগণ যে ধন সম্পদ ও আসবাবপত্র লাভ করে থাকে ইসলামী পরিভাষায় তাকেই বলা হয় গণীমতের মাল।

গণিমত সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন – হে নবী মুসলমান সৈনিকেরা আপনার কাছে গণিমতের মাল বন্টনের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি তাদের বলে দিন মালে গণিমত তো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যে।[১] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে আর যেনে রেখো যে সম্পদ তোমরা হস্তগত কর তার এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ) এর জন্যে তাঁর নিকটাত্মীয় এবং ইয়াতিমদের জন্য, আর মুখাপেক্ষী ভিক্ষুক ও দুঃস্থ মুসাফিরের জন্য।[২]

সূরা আনফালের ৬৯নং আয়াতে আরো বলা হয়েছে গণিমতের যে সব মাল তোমাদের হস্তগত হয়, সেগুলো হালাল এবং তা পবিত্র জ্ঞানে ভক্ষণ কর, আর আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।

কাফির ও মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয় লাভ করার পরে যুদ্ধের ময়দানে শত্রুপক্ষের যেসব ধন-সম্পদ, অস্ত্র শস্ত্র, যানবাহন ও খাদ্য সামগ্রী মুসলমানদের হস্তগত হবে, তার পাঁচভাগের চার ভাগ বিজয়ী মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করা হবে। আর অবশিষ্ট এক পঞ্চমাংশ ইয়াতীম, মিসকীন, অভাবী ও নিঃসম্বল পথিকদের মধ্যে বিতরণের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালে জমা করা হবে।

খনিজ সম্পদ ও প্রোথিত সম্পদ সম্পর্কে তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হয় যথাঃ কানয, মদান এবং রিকায। কান্য হল মানুষের প্রোথিত সম্পদ, মদান হল ভূ-গর্ভে আল্লাহ যে সম্পদ সৃষ্টি করেছেন এবং রিকায শব্দটি উভয়টির জন্যই ব্যবহৃত হয়।

১। সূরা আনফাল আয়াত নং-১

২। সূরা আলফাল আয়াত নং- ৪০

Dhaka University Institutional Repository

আরবী ভাষায় আভিধানিক অর্থে রিকায বলা হয় প্রোথিত বস্তুকে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) নবী করীম (সঃ) এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন' ইয়া রাসূলুল্লাহ! রিকায কি বস্তু? তিনি বললেন: আল্লাহ তা'আলা যেসব সোনা-রূপা সৃষ্টি করে মাটির নিচে রেখে দিয়েছেন অর্থাৎ খনি।

খনিজ সম্পদের রয়ালটি বাবদ এর পাঁচ ভাগের এক ভাগ বায়তুল মালে জমা হবে। কোন কোন ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মতে এর শতকরা চল্লিশ ভাগ বায়তুলমালে জমা হবে। এ মতের সমর্থনে বলা যেতে পারে যে, হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রাঃ) খনিজ সম্পদের শতকরা চল্লিশভাগ রাষ্ট্রীয় বায়তুলমালে গ্রহণ করেছিলেন।[১]

কিন্তু আমাদের মতে রয়ালটির পরিমাণ সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যাপার। যেহেতু সকল অবস্থা একই রূপ নহে। সেহেতু সকলটির উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণও কখনো সমান হয় না। এতদ্ব্যতীত উৎপন্ন খনিজ দ্রব্যের রকম ভেদের দরুন মূল্যের দিক দিয়েও যথেষ্ট পার্থক্য হয়ে থাকে। তাছাড়া খনিজ দ্রব্য উৎপাদনের ব্যয়ও সকল খনিতে সমান নয়। কাজেই প্রত্যেকটি খনির রয়ালটির কোন স্থায়ী পরিমাণ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বরং উহার পরিমাণ নির্ধারণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের উপরই ন্যস্ত হওয়া বাঞ্চনীয়। উপরন্ত খনিজ সম্পদ হতে গৃহীত পরিমাণকে যাকাত মনে করা হবে না গণিমত মনে করা হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে ইসলামী রাষ্ট্র।

ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মতে খনিজ রয়লটি কৃষিজাত দ্রব্যের ন্যায় উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই আদায় করা বাঞ্চনীয়, এ জন্য বৎসর অতিবাহিত হওয়া জরুরী নয়। এখানে উল্লেখ্য যে রয়ালটি বাবদ খনিজ দ্রব্য, রয়ালটির পরিমাণের মূল্য উভয়ের যে কোন একটি আদায় করা যেতে পারে, বলা বাহুল্য প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমালকে এই খনিজ সম্পদই বিপুলভাবে সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যশালী। করে তুলেছিল।

ইমাম আবু ইউসুফ লিখেছেন – এইভাবে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ ও সীসা-দস্তা প্রভৃতির যাবতীয় খনিজ সম্পদ হতে (এক পঞ্চমাংশ) রাজস্ব আদায় করতে হবে। (কিতাবুল খারাজ)

আমাদের হানাফী দলিল, রাসূল (সঃ) বলেছেন – ভূ-গর্ভস্থ সম্পদের উপর এক পঞ্চমাংশ ওয়াজিব, তবে গ্রহণযোগ্য মত হল যদি সোনা, রূপার খনি অথবা ভূগর্ভ থেকে উত্তোলিত সোনা/রূপা সরকারী নিয়ন্ত্রণে (অন্যকারো নির্দিষ্ট মালিকানায়) থাকে তাহলে ২.৫% যাকাত দিতে হবে। আর যদি কারো নিয়ন্ত্রণে না থাকে অথবা বেসরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন খনি হয় তাহলে তার $^{১}/_{৫}$ অংশ বায়তুলমালে জমা দিতে হবে, বাকীটা ঐ এলাকার মুসলমানরা ও আবিষ্কারগণ সমভাবে গ্রহণ করবে। তবে পাথরের ক্ষেত্রে খুমুছ ($^{১}/_{৫}$) ওয়াজিব হবে।

১। কিতাবুল আমওয়াল, আবু উবাইদা, ৩৩৯ পৃঃ

Dhaka University Institutional Repository

ওয়াক্বফ

যেসকল স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পদ ব্যক্তি মালিকানা ত্যাগ করে আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেয়া হয় তাকে ইসলামী পরিভাষায় ওয়াক্বফ বলা হয়। ওয়াক্বফ খাতের সকল আয় বায়তুলমালের সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়। ইসলামের ইতিহাসে অস্থাবর সম্পদের প্রথম দানকারী হলেন হযরত ওমর (রাঃ) আর স্থাবর সম্পদ প্রথম দান করেন হযরত তালহা আর স্থাবর সম্পদ প্রথম দান করেন হযরত তালহা (রাঃ)। যখন পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল হয় যে, "কে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহকে উত্তম ধার দিবে, এরপর তিনি তার জন্যে তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন এবং তার জন্যে রয়েছে সম্মিলিত পুরুষ্কার"[১] এবং "তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা, যদি তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় না কর আর আল্লাহ তা জানেন তোমরা যা কিছু ব্যয় কর।"[২] তখন তালহা (রাঃ) নবী করিম (সঃ) এর খেদমতে আরজ করলেন। হে আল্লাহর রাসূল (সঃ) আমার অমুক বাগানটি যা আমার নিকট অত্যন্ত প্রিয় আমি আল্লাহর রাস্তায় দান করছি, তখন রাসূল (সঃ) বললেন, তুমি এটা তোমার জাতীর অভাবীদের জন্য ওয়াক্বফ করে দাও।[৩]

১। সূরা হাদীছ, আয়াত নং- ১১
২। সূরা আল ইমরান. আয়াতঃ ৯২
৩। বুখারীর টিকা, কিতাবুল আমওয়াল, পৃঃ ৫৬১

Dhaka University Institutional Repository

আমওয়ালে ফাযেলাহ্

রাসূলে করীম (সঃ) এর জামানায় যে সকল উপায়ে বায়তুলমালে সম্পদ জমা হত তার মধ্যে বিশেষ একটি উৎস হল আমওয়ালে ফায়েলাহ্ তথা মালিকানাবিহীন সম্পদ। ইসলামী রাষ্ট্র সমগ্র দেশের প্রতিনিধি স্থানীয় আল্লাহ্ এবং রাজ্যের জনগণের খলিফা। সুতরাং যেসব ধন সম্পদের বস্তুতই কোন মালিক অথবা উত্তরাধিকারী থাকবে না তার মালিক ইসলামী রাষ্ট্র, বায়তুলমালেই তা জমা করতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেই তা ব্যয় করতে হবে।

হযরত উমর ফারুক (রাঃ) মিশরের শাসনকর্তার এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন – মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী থাকলে রেখে যাওয়া সম্পত্তি তাদের মধ্যেই বন্টন করতে হবে। আর যে মৃত্যু ব্যক্তির কোন ওয়ারিশ নেই তার যাবতীয় ধন সম্পত্তি বায়তুলমালে জমা হবে। নবী করীম (সঃ) এ সম্পর্কে বলেছেন – যার কোন উত্তরাধিকারী নেই, তার উত্তরাধিকারী আমি। আমি তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি পাব এবং তার তরফ হতে দায়িত্ব পালন করবো।[১] অনুরূপভাবে যদি কোন জিম্মীর মৃত্যু হয় এবং তার কোন উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহলে মৃত্যু ব্যক্তির সকল সম্পদ বায়তুলমালে জমা হবে। আবার যদি কোন জিম্মি বিদ্রোহী হয় কিংবা আল্লাহ না করুক কোন মুসলমান যদি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় অথবা বিধর্মী রাষ্ট্রে পালিয়ে যায় তবে তার সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে এবং সে সব বায়তুলমালের মালিকানায় চলে যাবে।[২]

আর যদি পড়ে থাকা মালামাল পাওয়া যায়, আর তার মালিক খুজে পাওয়া না যায় তবে তাও বায়তুলমালের সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে।

১। কিতাবুল আমওয়াল, পাতা ২২১
২। কিতাবুল শিয়ার, পৃঃ ১৩৬

Dhaka University Institutional Repository

আশুর

বর্তমানে প্রচলিত আমদানী রপ্তানী শুল্কের মত প্রাক ইসলামী যুগেও এক দেশের পণ্য অন্য দেশে আনা নেয়ার সময় শুল্ক আদায় করা হত। এ ধরণের শুল্ককে আশুর বা বাণিজ্যিক শুল্ক বলা হয়।

প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজ দেশের শিল্প-বাণিজ্যির উৎকর্ষ সাধন এবং বৈদেশিক শিল্প পণ্যের আমদানীর প্রতিরোধ করতে বাধ্য। ইসলামী রাষ্ট্রকে এজন্য সর্বপ্রথম বৈদেশিক পণ্য আমদানী নিয়ন্ত্রণ করতে এবং তার উপর শুল্ক ধার্য করতে হবে। অনুরূপভাবে বৈদেশিক রাষ্ট্রের যেসব নাগরিক ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন থেকে ব্যবসাবাণিজ্য করবে তাদের উপরও এই শুল্ক ধার্য হবে। কারণ তাদের জান মাল, স্বাধীনতাসহ যাবতীয় কিছুর রক্ষার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের উপর আরোপিত এবং এই দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে অথবা এই কাজের নিরাপত্তা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের জন্য তাকে অবশ্যই শুল্ক আদায় করতে হবে। ইসলামের ইতিহাসে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর সময়ই এই শুল্ক সর্বপ্রথম ধার্য করা হয়েছিল। বস্তুতঃ এ শুল্ক প্রদান করেই বিদেশী নাগরিকগণ ইসলামী রাষ্ট্রে ব্যবসাবাণিজ্য ও জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করতে পারে।

বলা বাহুল্য ব্যবসায়ী তার ব্যবসায় পণ্যের যে শুল্ক আদায় করে, তা কখনো নিজ পকেট হতে আদায় করেনা বরং আদায় করে ক্রেতার থেকেই। কারণ তা পণ্যের আসল মূল্যের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, আর ক্রেতাই তা মূল্যের সাথে শোধ করে থাকে। এভাবে বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের নিকট হতে এই শুল্ক আদায় করা হলে আর দেশীয় মুসলিম অমুসলিম ব্যবসায়ীদের শিল্পপণ্য হতে আদায় না করলে তাদের পণ্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হবে। ফলে তাদের পণ্য অবিলম্বে বিক্রয় হয়ে যাবে। কিন্তু বৈদেশিক পণ্যের মূল্য বেশি হবার কারণে সহজে বিক্রি হবে না, তখন তাকে বাধ্য হয়ে পণ্যমূল্য হ্রাস করে দেশীয় শিল্পের সমান্তরালে মূল্য ধার্য করতে হবে। অন্যথায় ঐ পণ্য অবিক্রিতই থেকে যাবে। এই জন্য যে, একই প্রকার পণ্যের মূল্যে একই বাজারে বেশী পার্থক্য থাকতে পারেনা।

বৈদেশিক পণ্যের শুল্ক মূল্য পণ্য মূল্যের $^{১}/_{১০}$ (এক দশমাংশ) অংশ ধার্য করা যেতে পারে। আর কোন কারণবশতঃ যদি দেশী পণ্যের উপরও শুল্ক ধার্য করতে হয়, তবে দেশের অমুসলিমদের পণ্যে $^{১}/_{১০}$ এর অর্ধেক ধার্য করতে হবে। কারণ তাদের উপর জিজিয়া নামক আর একটি কর ধার্য হয়ে আছে। মুসলমানদের পণ্যের $^{১}/_{৪০}$ অংশ শুল্ক বাবদ আদায় করা যেতে পারে। যেহেতু নগদ টাকার ও পালিত জন্তুর যাকাত তাদেরকে অনিবার্যরূপে প্রদান করতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু দুইশত মুদ্রার কম পুঁজির ব্যবসায়ের উপর এই শুল্ক ধার্য হতে পারেনা। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর একাধিক নির্দেশনা থেকে উল্লেখিত পরিমাণটি জানতে পারা যায়। বর্তমান সময়ে সেই পরিমাণই যে বজায় থাকবে এমন কোন কথা নয়, বরং আধুনিক প্রয়োজন, পরিবেশ ও আন্ত-র্জাতিক ব্যবসায়ের পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও পরিপূর্ণ হৃদয়তার সহিত এই শুল্কের পরিমাণ ধার্য করতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যেসব পণ্য দ্রব্য একস্থান থেকে অন্যস্থানে আমদানী রফতানী করা হয় তার উপর কোনরূপ শুল্ক ধার্য হতে পারেনা। এমনকি ইজতেহাদের সাহায্যেও এতে কোনরূপ রদবদল করার সুযোগ নেই। যেসব ফল অল্প সময়ের মধ্যে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে তার উপর শুল্ক ধার্য না হওয়াই বাঞ্চনীয়। বিদেশ থেকে যেসব পণ্য আমদানী করা হয় উহার তার একবারই শুল্ক ধার্য হওয়া উচিত।

শুল্ক আদায়ের ব্যাপারে মোহাদ্দীস এবং ফকীহদের যে মতামত পাওয়া যায় উহা নিম্নরূপঃ-

ক) দুইশত দেরহামের কম মূল্যের দ্রব্যে কোন শুল্ক নেই;

খ) এক বছর অতিক্রান্ত না হলে পুনরায় কোন দ্রব্যের শুল্ক ধার্য করা যাবে না;

গ) ব্যবসা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে পণ্য আনলে তাতে কোন শুল্ক ধার্য করা যাবে না;

ঘ) বছরে মাত্র একবারই শুল্ক আদায় করা যাবে;

ঙ) দারুল হরবের সরকার শুল্ক না নিলে তাদের থেকেও শুল্ক নেয়া হবে না।

চ) দারুল হরবের সরকার জুলুম করে শুল্ক আদায় করলেও তাদের উপর জুলুম করা যাবে না।

ছ) ঋন গ্রস্থ ব্যবসায়ীর ঋন শোধ করলে এবং পণ্যমূল্য ২০০ দিরহামের কম হলে শুল্ক আদায় করা ঠিক হবে না।

জ) যদি কেউ বলে, আমার মাল ব্যবসার মাল নয় তাহলে তার নিকট থেকে শুল্ক আদায় করা ঠিক হবে না।

সব শেষে বলা যায় যে, ইসলামী অর্থনীতি মূলত; স্বাধীন ব্যবসায়ের পক্ষপাতি। সকল দেশের সকল পণ্যের উপরই যে শুল্ক ধার্য করতে হবে এজন্য কোন বাধ্যবাধকতা নেই। এ ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত শুল্ক গ্রহণ না করার ব্যাপারে চুক্তি সম্পাদন করতে পারে। কিন্তু যখন কোন বৈদেশিক রাষ্ট্র ইসলামী রাষ্ট্রের পণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করবে তখন ইসলামী রাষ্ট্র সকল প্রকার বৈদেশিক শিল্প পণ্যের উপর অনুরূপ হারে শুল্ক ধার্য করবে।

Dhaka University Institutional Repository

বনজ সম্পদ থেকে আয়

আমাদের বাংলাদেশের জমি খুবই উর্বর যা গাছ-পালা জন্মানোর জন্য উপযোগী, যে কোন ধরণের গাছই রোপন করলে অতি সহজেই তা বেড়ে উঠে। প্রাকৃতিক ভাবেও অনেক গাছের বাগান আমাদের দেশে রয়েছে, এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য "সুন্দর বন" যার পরিচিতি সমগ্র বিশ্বেই আছে এ সুন্দর বনে দামীদামী প্রচুর কাঠ আছে। এ গাছ বিক্রিকরে অনেক অর্থআয় হয় যা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয়। শুধু প্রাকৃতিক বন বা গাছের উপর নির্ভর না করে অনুরূপ আরো গাছের বাগান করা যেতে পারে। ফারাক্কা বাধের ফলে বাংলাদেশের বড় বড় নদীতে এমনকি বঙ্গোপসাগরের বুকেও বিশাল চর জেগে উঠেছে। এ সব চরে রাষ্ট্রীয় ভাবে কাঠের বা ফলজ গাছ লাগানো যেতে পারে যা থেকে অনেক অর্থ আয় হওয়া সম্ভব। আমাদের দেশে যে সব ফল- ফলাদি পাওয়া যায় তার অধিকাংশই অন্যদেশ থেকে আমদানী করা হয় অথচ আমাদের দেশে প্রযুক্তি খাটিয়ে অনুরূপ ফল-ফলাদী ফলানো সম্ভব। রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে সরকারি জমি লিচ দিয়ে ব্যক্তি মালিকানায়ও ফলের বা কাঠের বাগান করার ব্যবস্থা করতে পারে।

ইতিমধ্যে উত্তরাঞ্চল সহ অনেক এলাকায়ই ফলজ ও কাঠের বন করা শুরু হয়েছে। তবে তা এখনো ব্যাপক সাড়া জাগায়নি দেশে যদি প্রচুর পরিমাণে ফল উৎপাদন হয় তবে বিদেশ থেকে ফল আমদানী করার দরকার হবে না বরং দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রফতানী করা সম্ভব হবে। এতে একদিকে যেমন দেশের অর্থ সাশ্রয় হবে আবার আয়ও হবে। সুতরাং বিভিন্ন ধরণের গাছ-পালা এবং বাহারী ফলের চাষ করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রচুর পরিমাণ অর্থ উপার্জন করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

নদী-সামদ্রিক সম্পদের আয়

বাংলাদেশের বিশাল অঞ্চল জুড়ে আছে নদী ও সমুদ্র। এ থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থ আয় করা সম্ভব। যদিও কিছু আয় হয় তবে তা যে পরিমাণ আয় হওয়া সম্ভব তার তুলনায় খুবই কম। নদী বা সাগর থেকে আমাদের দেশে যে সকল সম্পদ আয় করা সম্ভব তার মধ্যে প্রধান হল মৎস্য। কিন্তু মৎস্য চাষের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা এখনও নেয়া হয়নি বরং যা আছে তাও সঠিক তত্বাবধানের অভাবে সংরক্ষণ করা যাচ্ছে না। ছোট ছোট মাছ ধরা ঝাটকা ইলিশ নিধন সরকারীভাবে নিষিদ্ধ থাকলেও তা পুরাপুরি কার্যকরি হয়না। যে কারণে প্রচুর পরিমাণে ইলিশের ঝাটকাসহ নানাবিধ মাছের ছোট ছোট পোনা ধরে বিক্রি করা হয়। ফলে দেশে বেশী অর্থ আয় থেকে বঞ্চিত হয়। অথচ ঐ সকল ঝাটকা বা পোনা যদি পরিণত মাছ হবার পরে ধরা হয়, তবে দেশ কয়েকগুন বেশী অর্থ আয় করতে পারে সকল প্রকার নদী সামুদ্রিক সম্পদই ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের অন্যতম উৎস। আল্লাহপাক পবিত্র কুরআনে বলেছেন– "এবং সেইতো তিনি, যিনি সাগরকে বশীভূত করেছেন, সেমতে তা হতে তোমরা তাজা মাংস ভক্ষণ করতে পার এবং ব্যবহার্য অলংকার তা থেকে বের করতে পার।"[১]

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রধান অর্থকারী সম্পদ মাছ ছাড়াও সমুদ্র গর্ভে মহামূল্যবান সম্পদ মুক্তা ও সুক্তি রয়েছে। উপরোক্ত সবগুলোর উপরই কর ধার্য হতে পারে। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) সামুদ্রিক সম্পদের উপর কর ধার্য করে যথাযথভাবে সংগ্রহ করার জন্যে কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। কোন এক কর্মচারীর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, সমুদ্র হতে উৎপন্ন সকল দ্রব্য হতেই রাজস্ব বাবদ এক পঞ্চমাংশ আদায় করতে হবে। কারণ ইহাও আল্লাহ তাআলারই একটি দান। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)ও এমনই প্রচার করেছিলেন। নদী, ঝিল, বিল ইত্যাদি হতে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে যে বিপুল পরিমাণে মৎস উৎপাদন হবে তারও এক পঞ্চমাংশ বায়তুলমালে জমা হবে। হযরত আলী (রাঃ) কার্যতঃ এর সূত্রপাত করেছিলেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের মতেও জল ভাগ হতে যা কিছু উৎপন্ন হবে তা হতেও রাজস্ব আদায় করতে হবে। কারণ তা স্থল ভাগের খনিজ সম্পদের সমতুল্য।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে অসংখ্য নেয়ামত দান করেছেন। এ নেয়ামত সমূহকে ব্যবহার করা উচ্চাকাঙ্খা মানুষের মধ্যে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা এখন সমুদ্র গর্ভ থেকে গ্যাস উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছে। তারা বিদ্যুৎ বায়ু-তরঙ্গ প্রভীতিকে নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে। এভাবে মানুষ যত বেশী উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হবে তত বেশী অর্থনৈতিকভাবে ততই বেশী লাভবান হবে। ব্যক্তি, সমাজ, জাতী, রাষ্ট্র সবাই।

১। সূরা নহল, আয়াত নং- ১৪, পৃঃ ১৬

Dhaka University Institutional Repository

দারাইব
(জরুরী পরিস্থিতিতে কর নির্ধারণ)

দেশে যদি এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যেমন – যুদ্ধাবস্থা, প্রাকৃতিক দূর্যোগ, ভূমিকম্প, মঙ্গাভাব, প্রবল বন্যা, জল উচ্ছাস, দূর্ভিক্ষাবস্থা, জনগণের বেকরাত্ব দূর করা ইত্যাদি কারণে বায়তুলমালের জমাকৃত অর্থ যথেষ্ট নয়, তখন সরকারের তরফ থেকে সমাজের বিত্তবানদের উপর যে সাময়িকভাবে কর ধার্য করা হয় তাকে দারাইব বা জরুরী পরিস্থিতিতে কর বলা হয়, ইসলামী রাষ্ট্রের কোষাগার কোন কোন সময় এমন কোন পরিস্থিতিতে যদি শূণ্য হয়ে পড়ে অথবা ব্যয় অপেক্ষা আয় কম হয় অথবা কোন জনকল্যাণমূলক পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্যে অধিক অর্থের প্রয়োজন হয় তখনও ইসলামী রাষ্ট্র দেশবাসীর উপর আরো অতিরিক্ত কর ধরতে পারবে। তবে কর নির্ধারণের সময় ইনসাফ ও ন্যায়-নীতিভিত্তিক হতে হবে।

ইসলামী রাজনীতিবিদ ইমাম মাওয়ার্দী (আল-আহ-কামুস্সুলতানীয়া গ্রন্থের অষ্টাদেশ অধ্যায়ের ২০৪ পৃঃ) লিখেছেন জরুরী অবস্থায় সকল প্রকার ব্যয় বহনের দায়িত্ব সমগ্র মুসলমানদের উপরই বর্তাবে, প্রয়োজনের সময় তাদের নিকট হতে প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ আদায় করা যেতে পারে।[১]

ইবনে হাজমের ভাষায়; "সুলতান অথবা খলীফা এ ব্যাপারে বিত্তবানদের বাধ্য করতে পারেন।"

নবী করীম (সঃ) যুদ্ধের সময় যাকাত, উশর ইত্যাদি ছাড়াও আকস্মিকভাবে আরো অধিক অর্থের প্রয়োজন বোধ করেছিলেন এবং মুসলমানদের নিকট তিনি সেজন্য অর্থ সাহয্যের দাবী পেশ করেছিলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এবং উসমান (রাঃ) এসময় তাদের যাবতীয় ধন সম্পদের অর্ধেক উপস্থিত করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) তাঁর সম্পূর্ণ বিত্ত সম্পদ এনে নবী করীম (সঃ) এর খিদমতে পেশ করেছিলেন।

১। ইমাম মাওয়ার্দী, আল-আহ-কামুস্সুল তানীয়া, অধ্যায় নং- অষ্টাদশ, পাতা নং- ২০৪

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বিত্তবানদের উপর ফরজ করে দিয়েছেন, তারা যেন তাদের ধন-সম্পদ থেকে বিত্তহীনদের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী সম্পদ প্রদান করেন। সুতরাং বিত্তহীনরা যদি ভূখা, নাঙ্গা ও দূরবস্থায় থাকে তবে তার কারণ এই হবে যে, বিত্তবানরা তাদের এই ফরয বিধান বাস্ত বায়নে ব্যর্থ হয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন – "তোমার ধনসম্পদে যাকাত ছাড়াও সমাজের অধিকার রয়েছে।"

গরীব অথবা বিত্তহীনদের অভাব দূর করার জন্য যেমন বিশেষ কর ধার্য করা যায়। তেমনি জিহাদও এ ধরণের অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর জন্যে বিত্তবানদের উপর বিশেষ কর ধার্য করা যায়। ইয়ার মুকের যুদ্ধের সময় নবী করিম (সঃ) এ ধরণের সাহায্য প্রদানের জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। সাহাবাগণ তাতে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সাড়া প্রদান করেছিলেন।

জরুরী অবস্থায় যে কর ধার্য করা হয় তা সাধারণত দু'প্রকারের হতে পারে। যথাঃ- প্রথম যে কর সাধারণভাবে সকল মানুষের প্রয়োজন ও কল্যাণ সাধনের জন্য ধার্য করা হয়। দ্বিতীয় প্রকারের যা কোন অত্যাচারী শাসন কর্তা বিলাসিতার খরচ মেটানোর জন্য জনগণের কাছ থেকে আদায় করে থাকে, জনস্বার্থে অথবা জনকল্যাণে আদৌ খরচ করা হয়না। এই উভয় প্রকার করই কখনো সাময়িকভাবে আবার কখনো স্থায়ীভবে ধার্য হয়ে থাকে। তবে ইসলামী রাষ্ট্রে এই দ্বিতীয় প্রকারের করের কোন স্থান নেই। কিন্তু প্রথম প্রকারের কর ইসলামী রাষ্ট্রে ন্যায় সঙ্গত, যদি এরূপ কর ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার কর্তৃক ধার্য করা হয় তবে দেশবাসীর পালন করা একান্ত কর্তব্য, ফরয। এ বিষয়ে ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ একমত।

তবে অন্যায়ভাবে জনস্বার্থ হানিকর কোন কাজের জন্য যদি অতিরিক্ত কর ধার্য করা হয় তবে তা প্রদান করা মুসলমানদের কর্তব্য নয়। কারণ এ ধরণের কর ধার্য করা সম্পর্কে নবী করীম (সঃ) বলেছেন – অতঃপর জেনে রাখ, আল্লাহ তা'আলা শাসক ও রাষ্ট্রকর্তাদিগকে জাতি ও জনগণের সংরক্ষণ ও রক্ষানাবেক্ষণকারী হবার আদেশ করেছেন এবং তাদেরকে এজন্য, রাষ্ট্রকর্তা নিযুক্ত করা হয় নাই যে, তারা জাতি ও দেশবাসীকে নতুন নুতন কর ভারে জর্জরিত ও নিঃস্ব করে দিবে।

মুসলমানগণ এ ধরণের কর প্রদানে কেবল যে বিরত থাকবে তাই নয়, বরং এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলাও একান্ত আবশ্যক।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের খাত

ভূমিকাঃ ইসলামী শরীয়ায় রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যবস্থার যে নির্দেশনা দিয়েছে সেখানে রয়েছে যেমন সুনির্দিষ্ট আয়ের উৎস, তেমনি রয়েছে ব্যয়ের খাতের সুস্পষ্ট বর্ণনা। ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের উৎস থেকে যদি সঠিকভাবে আয় উসূল করে ব্যয়ের নির্দেশনা মোতাবেক নৈতিক দৃঢ়তার সাথে ব্যয় করা যায়, তাহলে দারিদ্রতা থাকার কথা নয় বরং দেশ উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি অর্জন করবে যার নমুনা মহানবী (সঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে দেখা গেছে। এস,এম, ডঃ আলী আক্কাস এবং জহুরুল ইসলাম বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ইয়ার বুক ১৯৯৬ সাল থেকে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে দেখা যায়, ব্যবহৃত সোনা, রূপা ও বনজ সম্পদ ছাড়া অন্যান্য উৎস থেকে শুধু যাকাত ও উশর আদায় হবে ৩৮, ৪৩৭ মিলিয়ন টাকা।

২০০২-২০০৩ সেশনের একটি অর্থনৈতিক সমীক্ষায় বলা হয়েছে বাংলাদেশে প্রতিবছর উশর ও যাকাতের আদায় যোগ্য পরিমাণ হল ৪,১০০ কোটি টাকা, যা এদেশের দারিদ্র বিমোচনের জন্য যথেষ্ট। তবে ইহা বাস্তবায়নের জন্য দরকার নৈতিকতা সম্পন্ন ও ইসলামী জ্ঞান সমৃদ্ধ ব্যবস্থাপনা যারা সঠিক ইসলামী পন্থায় রাজস্ব উসূল করে সঠিক খাতে ব্যয় করবে। প্রচলিত অর্থনীতিতে ইসলামী এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই আরো গতি সঞ্চয় করবে। বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশেই জন-প্রতিনিধিগণ জনগণকে অনেক আশা ভরসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের সমর্থন নিয়ে প্রতিনিধির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে তাদের দেখে মনে হয় তারা জনগণের সম্পদ লুন্ঠন করার জন্যই নেতৃত্ব পেয়েছেন। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ শোষক ও লুন্ঠনকারীর ন্যায় নির্বিচারে দু'হাতে জনগণের অর্থ সম্পদ লুঠতে পারেনা।

Dhaka University Institutional Repository

নিরপেক্ষতা, ন্যায়নীতি, সহৃদয়তা ও সহানুভূতি এবং বৃহত্তর কল্যাণে সাধন হবে ইসলামী রাষ্ট্রের কর ধার্য করা ও আদায় করার মূলভিত্তি। সাথে সাথে সরকারী ব্যয় নীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ সমগ্র দেশ ও জাতির স্বার্থে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর ভাষায় "আমার জন্য আল্লাহর (রাষ্ট্রীয়) ধন-সম্পদ কোন এতিমের ধন-সম্পদের মতই, প্রয়োজন না হলে তা স্পর্শও করিনা। যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই গ্রহণ করি।" আর আমাদের দেশের সরকারের নীতি নির্ধারক ও বাস্ত-বায়নকারীদের মানসিকতা ও চেতনা কোথায় তা সকলেই অবগত। অর্থনীতির ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয়-নীতি যত সুষ্ঠু, সংযত ও সুবিচার পূর্ণ হবে দেশ ও দেশবাসীর ততই কল্যাণ হবে। এজন্য রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয়ের ব্যাপারে পরিপূর্ণ সতর্কতা, বিচক্ষণতা, সামগ্রিক সামঞ্জস্যতা ও মিতব্যয়িতা রক্ষা করা একান্ত বাঞ্চনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যয়ের নীতিমালা

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয়ের যেমন কতগুলো নীতিমালা রয়েছে তেমনি ব্যয়ের ক্ষেত্রেও কতগুলো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। উক্ত নীতিসমূহ চাপরা (১৯৯২. পৃঃ ২৮৯) মাজাল্লাহ-তে অর্ন্তভূক্ত প্রবন্ধ সমূহ হতে উদ্ভাবন করেছেন। যা নিম্নরূপ ঃ

প্রথমনীতিঃ সকল ব্যয় বরাদ্ধের মূলনীতি হবে জনগণের কল্যাণ এই মূলনীতির তাৎপর্য হলো কোন ইসলামী সরকার তাঁর খেয়াল খুশীমত অর্থ ব্যয় করতে পারবে না। তাঁর একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকবে। সরকারের ব্যয়ের মূল লক্ষ্য হবে জনগণের কল্যাণ সাধন। এ কল্যাণের মধ্যে অবশ্যই বস্তুগত কল্যাণের পাশাপাশি আত্মিক কল্যাণও থাকবে। গ্রামীণ অবকাঠামো ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মসূচীসহ সঠিক অবকাঠামো গঠন, চরিত্র গঠনসহ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন, অপুষ্টি দূরীকরণ, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ ও পয়নিষ্কাশন ব্যবস্থাসহ স্বাস্থ্য কর্মসূচী, গৃহায়ন প্রভৃতি এক্ষেত্রে গৃহীতব্য উল্লেখ্যযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী।

দ্বিতীয়নীতিঃ আরামপ্রদ ও বিলাসের সংস্থানের পূর্বে দারিদ্র বিমোচমকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে – জনগণের মৌলিক ও অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের জন্যই সরকার সবার আগে ব্যয় করবে। এসব কর্মসূচী বা প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারকে অগ্রাধিকার দিতে হবে যেসবের মাধ্যমে জনগণের কষ্টের লাঘব হয়, দূর্দশা মোচন হয় এবং জীবন যাপনের মান উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। অপুষ্টি ও নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী, মহামারী রোধ, যাতায়াত ও যোগাযোগের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ইত্যাদি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয়নীতিঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের বৃহৎ স্বার্থ সংখ্যালঘু লোকের ক্ষুদ্র স্বার্থের উপর প্রধান্য পাওয়া উচিৎ এই নীতির তাৎপর্য হলো যদি মটরকার ও বাস আমদানীর মধ্যে পছন্দ বা বাছাই করার সুযোগ থাকে তাহলে সরকারকে অবশ্যই বাস আমদানীর উপর জোড় দিতে হবে। কারণ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জনগণের সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ বাসে চড়েই যাতায়াত করে থাকে। মটরকার তাদের নাগালের বাইরে। একই কারণে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের জন্যে সরকারকে সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতে হবে। কেননা দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠি পল্লীতেই বসবাস করে।

চতুর্থনীতিঃ জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে ব্যক্তি স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া যেতে পারে; বড় ক্ষতি এড়াবার জন্যে ছোট ক্ষতি বাধ্য করা যেতে পারে। পূর্বোক্ত নীতির উদাহরণ এই নীতির ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে। শহুরে লোকদের জন্য মটরকার নিঃসন্দেহে আরামদায়ক সামগ্রী। তাদের জন্য বাসের চেয়ে এটা সুবিধা জনক। অপর দিকে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বাসেই যাতায়াত করে, সুতরাং মটরকার আমদানী নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ করলে মুষ্টিমেয় শহুরে ধনী লোকের অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু সেই অর্থে বাস আমদানী করলে শহরে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক লোকের উপকার হবে।

পঞ্চমনীতিঃ যারা সুবিধা ভোগ করবে তারা তার খরচও বহন করবে। এটি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। উদাহরণের সাহায্যে এটা বোঝানো যেতে পারে। ধরা যাক, দেশের কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলে একটা বাঁধ তৈরী করতে হবে। এই বাঁধের খরচ বহণ করবে ঐ এলাকার লোকেরাই যারা ঐ বাঁধের সুবিধা ভোগ করবে। সেতু পারাপার হওয়ার সময়ে যানবাহন যে টোল দেয় সেটা এর আরেকটা উদাহরণ।

ষষ্ঠনীতিঃ যে কাজ না করলে কোন দায়বদ্ধতা পূরণ করা যায় না তা করাও বাধ্যতামূলক ধরা যাক শরীয়াহতে সুস্পষ্টভাবে আয়ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাসের কথা বলা হলেও কুটির শিল্প উন্নয়ন সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। যদি এমন হয় সে কুটির শিল্পের উন্নয়ন ছাড়া দরিদ্রের আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব নয় এবং সে জন্যেই ধনী দরিদ্রের পার্থক্য হ্রাস সম্ভব হচ্ছে না, তাহলে কুটির শিল্পের উন্নয়নের জন্যে সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ সরকারের জন্যে অত্যাবশ্যক বিবেচিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ইসলামী রাষ্ট্র অন্যান্য রাষ্ট্রের মত এক নয়; বরং আদর্শ ও ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় সর্বদাই উজ্জীবিত। যে কারণে অন্যান্য রাষ্ট্রের চেয়ে অনেক বেশী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। নিম্নে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য তুলে ধরা হল।

১। ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের প্রধান কাজ হল দ্বীন ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করা, উহাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করা এবং সেই অনুযায়ী জাতীয় পূর্ণ গঠন করা।

২। দেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করা। সেজন্য শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী এবং নৌ স্থল ও বিমান বাহিনীকে ইসলামী আদর্শে সু-সংগঠিত ও সু-সংবাদ করে তোলা, এব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন "তোমরা তোমাদের সাধ্যনুযায়ী শক্তি সামর্থ অর্জন কর ও প্রস্তুত রাখ, প্রস্তুত রাখ প্রয়োজনীয় যানবাহন, যেন তোমরা উহার সাহায্যে আল্লাহর দুশমন এবং তোমাদের দুশমনকে ভীত ও বিতাড়িত করতে সক্ষম হও।"[১]

৩। অভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলা, শাসন, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। সেজন্য পুলিশ ও দেশ রক্ষা বাহিনী এবং আদালত ও সকল প্রকার বিচারালয় স্থাপন ও ইসলামের নীতি অনুযায়ী উহার পরিচালনা করা। পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে ঘোষণা করা হয়েছে "মানুষের মধ্যে যখন বিচার ফয়সালা করবে, তখন ইনসাফের সাথে করবে।[২]

আল্লাহপাক আরো বলেন "আমি স্পষ্ট হেদায়েত দিয়ে আমার রাসূলদের প্রেরন করেছি যেন মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।[৩]

৪। দেশবাসীর নাগরিক অধিকার রক্ষা করা, অভাব-অভিযোগ ও পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করা, দুর্ভিক্ষ, বন্যা, অজন্মা প্রভৃতি জরুরী পরিস্থিতিতে এককালীন সাহায্য ও বিনা সুদে ঋণ বিতরণ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের সুস্পষ্ট অধিকার রয়েছে।"[৪]

১। সূরা আনফাল, আয়াত নং- ৬০
২। সূরা আল-নিসা, আয়াত নং- ৫৮
৩। সূরা আল-হাদীস আয়াত নং- ২৫
৪। সূরা আল যারিয়াত, আয়াত নং-১৯

Dhaka University Institutional Repository

৫। সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করার স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা করা অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, মীরাসী আইন কার্যকর করণ, সামাজিক জটিলতার মীমাংসা করণ, সকল প্রকার প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের জন্য প্রাথমিক স্তর হতে বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ স্ত রের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও ট্রেনিং কেন্দ্র স্থাপন। বিনা মূল্যে শিক্ষাদান ও জনস্বাস্থ্যের জন্যে সকল প্রকার আয়োজন ও বিধি ব্যবস্থা করা।

৬। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ যেমন রাস্তা, পুল, রেল লাইন, বিমান পথ, টেলিগ্রাম, টেলিফোন লাইন ও বেতারকেন্দ্র স্থাপন, ইত্যাদি।

৭। বৈদেশিক বাণিজ্য ও আমদানী রফতানীর জন্য সামুদ্রিক যানবাহন ও বন্দর স্থাপন, আলোক স্তম্ভ ও বিমান ঘাটি প্রস্তুত করণ।

৮। কৃষি কাজের উন্নতি বিধানের জন্য পানি সেঁচের বিভিন্ন উপায় অবলম্ভন, বড় বড় পুকুর, খাল ও কূপ খনন, বাঁধ বাঁধার আধুনিক যন্ত্রপাতির আমদানী ও সার প্রয়োগে উৎপাদন হার বৃদ্ধি করা।

৯। প্রয়োজনীয় শিল্পের উন্নয়ন, জনগণের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থা কার্যকর করা। যেন কেবলমাত্র বৃষ্টির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং জনগণও উন্নত জীবনমান উপযোগী দরকারী দ্রব্যাদি সহজেই লাভ করতে পারে।

১০। দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত বৈদেশিক স্থাপনের জন্য সকলমিত্র দেশ রাষ্ট্রদূত এবং হাই কমিশনার স্থায়ীভাবে নিয়োগ এবং তৎসংশ্লিষ্ট যাবতীয় খরচ বহন; দেশ বিদেশে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনীয় যাতায়াত, নিজ দেশের বিভিন্ন শহরে মুসাফির খানা স্থাপন করা যেন দেশী বা বিদেশী কোন ব্যক্তিই ফুটপাতে বা গাছতলায় অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকতে বাধ্য না হয়।

১১। ভূমি, বন-জঙ্গল, ইত্যাদি জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও এর উন্নতি বিধান; কৃষক মজুর ও শ্রমিকের অধিকার রক্ষার নিখুঁত ব্যবস্থা করা।

১২। কৃষক, মজুর, শ্রমিক সকলের অধিকার সংরক্ষণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রের প্রতি আরো অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে যা ইসলামী সরকারকে পালন করতে হয়। এজন্য তাকে বিরাট অংকের ব্যয়ভার বহন করতে হয়। শারাহ শিরাতুল ইসলাম নামক গ্রন্থে সৈয়দ আলী ফাদা হানাফী বলেন, আমীরের কর্তব্য হল তিনি স্বীয় শাসনাধীন অঞ্চল ও দেশে কোন দরিদ্রকে দরিদ্র থাকতে দিবেন না, ঋণ গ্রস্থ ব্যক্তিকে ঋণমুক্ত করবেন, দুর্বল ও অত্যাচারীতকে সাহায্য করবেন, অত্যাচারীকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখবেন, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিবেন ইত্যাদি।

ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থ ব্যয়ের উপরোক্ত খাতের বিরাট ব্যয়ভার সম্পর্কে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই অনুমান করতে পারেন। ইহা সু-স্পষ্ট কথা যে, এই বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র এই অর্থ অন্ধ শোষক ও লুণ্ঠনকারীর ন্যয় নির্বিচারে দু'হাতে লুট করতে পারে না। বরং নিরপেক্ষ ন্যায়নীতি সহৃদয়তা ও সহানুভূতি এবং বৃহত্তর কল্যাণ কামনাই হবে এর জন্য কর ধার্যকরণ ও আদায় করার মূল ভিত্তি।

প্রথমতঃ সরকারী ব্যয়নীতির সহিত সমগ্র দেশ ও জাতীর স্বার্থ নিবিরভাবে জড়িত। সরকারী ব্যয়নীতি যত সুষ্ঠু সংযত ও সুবিচার পুণ্য হবে দেশ ও দেশবাসীর ততই কল্যাণ সাধিত হতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ দেশের রাজকোষ জনগণের "হার ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, বুকের রক্ত পানি করে উপার্জন করা" অর্থ সম্পদই সঞ্চিত হয়ে থাকে। এজন্য রাষ্ট্রীয় অর্থ-ব্যয়ের ব্যাপারে পরিপূর্ণ সর্তকতা, বিচক্ষণতা, সামগ্রিক সামঞ্জস্য ও মিতব্যয়িতা রক্ষা করা একান্ত বাঞ্চনীয়।

শুধু নৈতিকতার কথাই নয়, ইসলামী শরয়ীয়তে এ সম্পর্কে রীতিমত বিধান রয়েছে। কারণ রাষ্ট্রীয় অর্থ সাধারণতঃ রাষ্ট্রের পরিচালক মণ্ডলীরাই ব্যয় করে থাকে। আর রাষ্ট্রীয় অর্থ তাদের পৈতৃক সম্পত্তি বা নিজেদের পরিশ্রম লব্দ নয়, বরং তা দেশের আপামোর জনগণের শ্রমার্জিত ধন। কাজেই ইসলামী রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় করার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি দিগকে এ ব্যাপারে কিছুতেই অবাধ স্বাধীনতা দেয়া যেতে পারে না। নিজেদের ইচ্ছামত ব্যয় করার অধিকার ও সুযোগ দেয়া যেতে পারে না। অন্যথায় রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয়ে মারাত্মক অপচয় দেখা দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ঠিক এজন্যই ইসলামী অর্থনীতির মূলনীতি দাতা আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে সর্বাত্মক নিয়ন্ত্রণ ও বিধি-নিষেধ আরোপ করেছেন। তাতে একদিকে যেমন আয়কে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে, অপরদিকে ব্যয়কেও সুষ্ঠু ও সুসংযত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের খাতসমূহ

ইসলামী অর্থনীতিতে আয়ের যেমন কতগুলো খাত সু-নির্দিষ্ট তেমনি ব্যয়ের কতগুলো খাত নির্দিষ্ট তবে আয় ও ব্যয়ের কতগুলো ক্ষেত্রে এমনও আছে যা মজলিসে শু'রা তথা গণ-প্রতিনিধিত্বমূলক পার্লামেন্টের পরামর্শ অনুযায়ী নির্ধারন করার অধিকার রাষ্ট্র নেতাকে দেয়া হয়েছে। এজন্য ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালের আয়-ব্যয়কে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথাঃ

১। কুরআন মজীদ যেসব ব্যয়ের খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যেমন গণিমতের মাল, যাকাত বাবদ আদায়কৃত অর্থ এবং বিনা যুদ্ধে সাধারণ নিয়মে প্রাপ্ত ধন সম্পদ "ফাই" এভাগে গণ্য হতে পারে।

এসব খাতের অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় সরকার শুধু আমানতদার ও মাধ্যম মাত্র। এতে কোন ব্যক্তিকে নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকারই দান করা হয়নি। তবে এসব খাতে ব্যয় করার পন্থা ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবশ্যই বিবচেনা করার অধিকার থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

২। যে আমদানীর ব্যয়ের খাত নির্ধারণ করা রাষ্ট্র সরকারের বিবেচনার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে খারাজ, জিজিয়াগুলোর তিন চতুর্থাংশ এবং অন্যান্য আমদানী এসব আমদানী ব্যয় করার ব্যাপারে মজলিসে শুরার পরামর্শ ও মঞ্জুরী গ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

ফিকহ্ শাস্ত্রবিদগণ বায়তুলমালে জমাকৃত অর্থ সম্পাদকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে পৃথক পৃথক পাঁচটি শাখা বায়তুলমাল স্থাপন করার পরামর্শ দিয়েছেন। তবে এগুলো কেন্দ্রিয় বায়তুল মালের নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

- ❖ প্রথম শাখায় – থাকবে গনিমতের মাল, খনিজ সম্পদ ও তৎলব্ধ অর্থ এবং ভূগর্ভ হতে প্রাপ্ত প্রাচীন সম্পদের এক পঞ্চমাংশ এবং সাদাকাহ্।
- ❖ দ্বিতীয় শাখায় – যাকাত, জমির উশর ও মুসলিম ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত শুল্ক।
- ❖ তৃতীয় শাখায় – ফাই ও বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ।
- ❖ চতুর্থ শাখায় – খারাজ, জিজিয়া, অমুসলিম সংখ্যালঘু ও বৈদেশিক আশ্রয় প্রার্থী ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত অর্থ, কিরাউল আরদ, দারায়েব, অতিরিক্ত আদায়কৃত অর্থ সম্পদ।
- ❖ পঞ্চম শাখায় – লা-ওয়ারিশ মাল।

ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মালের উল্লেখিত প্রত্যেক প্রকার শাখার আমদানীর জন্য আলাদা আলাদা খাত ঠিক করা প্রয়োজন যেন একখাতের আয়ের অপেক্ষা ব্যয়ের পরিমাণ বেড়ে গেলে অন্য খাতের উদ্ধৃত অর্থ হতে ঋণ বাবদ অর্থ গ্রহণ করা যায় এবং ইসলামী অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ বৈধ।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনে নির্দিষ্ট ব্যয়ের খাতসমূহ

প্রথম শাখাঃ

আমরা ইতিপূর্বে বায়তুল মালের ব্যয়ের খাতকে দু'ভাগে ভাগ করে আলোচনা করেছি এবং এর প্রথম খাত যা কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে এখন আমরা কুরআনে বর্ণিত এখাতের আলোচনা তুলে ধরছি।

❖ গণীমতের মাল ঃ ইহার ব্যয়ের খাত পবিত্র কুরআন মজিদে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। যেমন বলা হয়েছে - গনীমত হিসেবে যে মাল সম্পদই তোমরা লাভ করবে এর এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য তাঁর রাসূলের জন্য এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও নিঃসম্বল পথিকদের জন্য নির্ধারিত।

কুরআনের এই নির্দেশ অনুযায়ী নবী করীম (সঃ) গনীমতের মালের বিরাট অংশ পাঁচ ভাগের চার ভাগ সামরিক লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন এবং এর এক পঞ্চমাংশ মাত্র উল্লেখিত খাতে ব্যয়ের জন্য জমা দিয়েছেন।

নবী করীম (সঃ) এর অর্ন্তধানের পর গণীমতের মাল পাঁচ ভাগের পরিবর্তে তিন ভাগ করা হত। খুলাফায়ে রাশেদুন পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত রাসূলে করীম (সঃ) এবং তাঁর নিকটাত্মীয়দের অংশ বাতিল করে দিয়েছেন। বর্তমান সময়ে উল্লেখিত অংশ দু'টি বাতিল করার পরিবর্তে এর দ্বারা সামরিক অস্ত্র-সরঞ্জাম ক্রয়ে ব্যয় করাই যুক্ত যুক্ত। আল্লামা শামী বলেন, খুমুস অভাবী পিতৃহীন শিশু, মিসকীন এবং মুসাফিরের জন্য ব্যয় করতে হবে।

হানাফী মাযহাব মতে উক্ত অর্থ তিন প্রকার লোকদের মধ্যেই বন্টন করতে হবে। তবে শুধু এক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বন্টন ও বৈধ।

বাহুরুর রায়ক কিতাবেও এরূপ লিখিত আছে। তবে কেউ কেউ উক্ত বাতিলকৃত খাত দু'টির অর্থ বাদ না দিয়ে উক্ত অর্থ বাদ না দিয়ে উহা দ্বারা সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

যুদ্ধ লব্ধ স্থাবর সম্পদ (দালান, ভারী যুদ্ধ সরঞ্জাম, ভারী যন্ত্রপাতি, ট্রাক, ট্রেন, বিমান, জাহাজ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করা যাবেনা। এসব সম্পদ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকবে। তবে জমিন চাষাবাদের জন্য সৈন্যদের মধ্যে বন্টন করে তা থেকে উশর আদায় করতে হবে। উল্লেখ্য, গণীমতের মাল স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বন্টন করা উচিৎ। তবে যুদ্ধের অস্বাভাবিকতা হেতু যদি নিতান্তই দেরী করার প্রয়োজন হয় তাহলে পরে নির্দিষ্ট কোন তারিখে তা বন্টন করা যাবে। যেমন ওহুদ যুদ্ধের গণীমত একমাস পরে বিতরণ করা হয়েছিল। আবার নিয়মিত সৈন্যবাহিনী ও তাদের নির্ধারিত বেতন স্বত্ত্বেও তাদেরকে পূর্ণ গনীমত প্রদান করা হবে কিনা তাও ভাববার বিষয়। খনিজ সম্পদ ও রিকাজ (মাটিতে প্রথিত সম্পদ)-এর এক-পঞ্চমাংশও উপরোক্ত পদ্ধতিতে বন্টিত হবে।

সাদাকাহ্ বলতে এখানে ওয়াজিব সাদাকাহ্ বুঝানো হযেছে। ফিতরা পাওয়ার প্রথম হকদার হল একান্ত গরীব নিকটাত্মীয়, এরপর গরীব দূরাত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী, ইয়াতীম মিসকিন, নও-মুসলিম, ঋণে জর্জরিত এবং সামরিক সংকটে পতিত ব্যক্তিবর্গ। সাময়িকভাবে কোথাও দূর্ভিক্ষ দেখা দিলে সেখানেও ফিত্‌রা পাঠানো যেতে পারে। তবে অ-মুসলিমদেরকে এ অর্থ থেকে সাহায্য করা যাবেনা। তাদেরকে ভিন্ন খাত থেকে সাহায্য করতে হবে।

দ্বিতীয় শাখা – যাকাত, জমির উশর, মুসলিম ব্যবসায়ীদের থেকে আদায়কৃত শুল্ক।

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত ব্যয়ের খাত

যাকাতের অর্থ বন্টনের নীতিমালা

ইসলামী শরীয়াহ্ শুধু যাকাতের অর্থ প্রাপকদেরই চিহ্নিত করে দেয়নি, বরং কিভাবে তা বন্টন করতে হবে সে বিষয়েও শরীয়াতে কিছু নীতিমালা প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা গেলঃ

১। যাকাতের অর্থ আদায় হওয়ার সাথে সাথেই তা বিতরণ করতে হবে। কারণ প্রাপকরা যেহেতু গরীব-অভাবী, তাই তাদের সব সময়ই অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে। সেক্ষেত্রে যাকাতের অর্থ পেলে তাদের প্রয়োজন যতদূর সম্ভব পূরণ হবে।

২। যে এলাকা হতে যাকাত সংগৃহীত হবে সে এলাকার লোকদের মধ্যেই যাকাতের অর্থ বন্টন করতে হবে। কেননা প্রাপ্তদের কাছের লোকজনই বেশী হকদার। তাছাড়া কাছের লোকদের মধ্যে বন্টন করলে উভয়ের মধ্যেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হয় এবং পারস্পারিক সু-সম্পর্ক গড়ে উঠে।

৩। যাকাতের অর্থ এমনভাবে গৃহীতাদের মাঝে বন্টন করতে হবে তাতে তারা এর দ্বারা সামাজিক ও আর্থিকভাবে কল্যাণ সাধণ করতে পারে। তাদের যাতে প্রাপ্ত অর্থ বসে বসে খেতে না হয়, সেদিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। যাকাত প্রাপ্তরা যাতে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে একটি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে সেভাবে ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। যে সকল দরিদ্র অসহায় লোক কর্মহীন, যাদের করার মত কোন কিছুই নেই এ ধরণের লোকদের যাকাতের অর্থ সবচেয়ে বেশী দরকার, তারা যাতে যতসামান্য দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে বিক্রয়ের মাধ্যমে কিছু লাভ করে বেঁচে থাকতে পারে সে ব্যবস্থা যাকাত প্রদানকারীদেরই করতে হবে।

আর যে সকল দরিদ্র লোক ছোট খাট কাজে নিয়োজিত কিন্তু পুঁজির অভাবে তারা এগুতে পারেনা, এ ধরণের লোকের জন্য যাকাতের অর্থ দিয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করা দরকার যাতে তারা তাদের পেশাকে মজবুতভাবে গড়ে তুলতে পারে এবং আয় উন্নতিও বৃদ্ধি করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

যাকাতের অর্থ যাদের জন্য নির্ধারিত

যাকাতের অর্থ অন্যান্য অর্থ বা রাজস্বের ন্যায় সকল শ্রেণীর মানুষ ভোগ-ব্যবহার করতে পারবে না। বরং কোন শ্রেণীর মানুষ যাকাতের অর্থ ভোগ-ব্যবহার করতে পারবে বা গ্রহণ করতে পারবেনা সে ব্যাপারে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনে আট শ্রেণীর লোককে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যাদের মধ্যে যাকাতের অর্থ বন্টন করে দিতে হবে। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন "যাকাত হলো কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা প্রয়োজন, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্থদের জন্যে আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে। এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।"[১]

নিম্নে এসকল লোকদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলোঃ

১। দরিদ্র (ফকির) ঃ এমন দরিদ্র ব্যক্তি, যার কিছু সম্পদ আছে। কিন্তু সে সম্পদে তার সংসার চলেনা আবার আত্মমর্যাদার জন্য তিনি কারো কাছে কিছু প্রার্থনাও করেন না।

২। মিসকিন (অভাবী) ঃ বাংলাদেশে এদের এক যোগে ফকীর মিসকিন বলা হয়। অভাবী শ্রেণীর লোক তারাই যাদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয়না। তাদের নিসাব পরিমান দ্রব্যসামগ্রী, ধন-সম্পদ তো দূরে থাক, প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, কাজের সরঞ্জাম, গবাদী পশু ইত্যাদির অভাব প্রকট। এই শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত সকলেই যাকাত পাবার যোগ্য, দাবীদার।

আল-ফুকারাহ ও আল-মিসকিন কারা তা নিয়ে একাধিক মতামত রয়েছে। তবে সহীহ্-বুখারী ও সহীহ্ মুসলিম শরীফে এ ব্যাপারে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা হল নিম্নরূপ ঃ

"অভাবী লোক সে যে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে দু'একটা খেজুর, কিছু খাবার চায়না বরং সে খুব বিব্রতবোধ করে ---- অথবা সেই যার প্রয়োজন পূরণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ নেই এবং তার অবস্থা সম্বন্ধে অন্যেরা অবগতও নয়।"[২]

এখানে বিশেষভাবে মনেরাখা দরকার ফকীর ও মিসকীন উভয়েই দারিদ্র এবং তারাই যাকাতের প্রথম দাবীদার। অবশ্য এদের মধ্যে তারাও শামিল যারা বেকার বা কর্মহীন, শ্রমিক ও মজুর, যারা অভাবের তাড়নায় নিজের এলাকা এমনকি দেশত্যাগ করেছে এবং তারাও যারা শারিরীকভাবে বিকলাঙ্গ, অসমর্থ এবং বয়সের ভারে অক্ষম।

১। সূরা আত্ তাওবা ৯ঃ৬০

২। বুখারী, মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

৩। **যাকাত আদায়কারী কর্মচারী** ঃ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যাকাত বিভাগে যাদেরকে নিয়োগ করা হয় তাদের সম্মানী ভাতা আদায়কৃত যাকাত থেকেই দিতে হবে। এরা যাকাতের অর্থ সামগ্রী সংগ্রহ হিসেব রক্ষণাবেক্ষন, বিল বন্টন ও সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে।

খলিফা হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময়ে এই উদ্দেশ্যে আট শ্রেণীর লোক নিযুক্ত ছিল। তারা সমগ্র আরব এলাকা পরিভ্রমণ করতো এবং স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করত।

৪। **যাদের মন আকৃষ্ট করা দরকার (নও-মুসলিম)** ঃ ইসলাম ধর্মের প্রতি মন আকৃষ্ট করার জন্যে অমুসলিমদের কিংবা বিত্তশালী নও মুসলিমদের যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে। প্রায়ই দেখা যায় যে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তারা পরিবার হতে বিচ্ছিন্ন, বিতাড়িত হয় এবং তাদের অধিকাংশই উপায়-উপার্জনের উৎস হতে বঞ্চিত হয়। এসব লোককে তাৎক্ষণিক সমস্যা থেতে বাঁচানোর জন্যে ঈমানকে দৃঢ় করার স্বার্থেই তাদেরকে যাকাতের অর্থ-সামগ্রী প্রদানের বিধান রয়েছে। এটা তাদের শরীয়াহ্ হকও বটে। ফকীহদের মতে যাদের মন ইসলামের দিকে ঝুঁকেছে তাদের মন জয় করার উদ্দেশ্যেও এই অর্থ ব্যয় করা যায়েজ।

৫। **দাসমুক্তি** ঃ যে ক্রীতদাস স্বাধীনতা পেতে চায় কিন্তু এজন্য তার মনিব তাকে যে পরিমাণ অর্থ দিতে বলেছে তা সংগ্রহ করতে পারেনা, এক্ষেত্রে যাকাতের অর্থ দিয়ে উক্ত দাসকে মুক্ত করার বিধান রয়েছে। হয়ত, উক্ত দাসেরা মুক্ত মানুষ হিসেবে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করতে এবং সমাজের যোগ্য নাগরিক হয়ে অবদান রাখতে পারবে।

৬। **ঋণগ্রস্থ** ঃ আমাদের সমাজে এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছে যারা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করে, কিন্তু সময় মতো সে ঋণ আর পরিশোধ করা সম্ভব হয়না। অথচ সে ঋণ চক্রাকারে বৃদ্ধি পেতে পেতে কয়েকগুন বেড়ে যায় যা ঐ ব্যক্তির জন্য পাহাড় সমান বোঝা হয়ে যায়। এমতাবস্থায় তাদের ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয়িত হতে পারে। ফকীহ্‌বিদগণ মনে করেন যদি কোন ব্যক্তি সামাজিক দায় দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে ঋণগ্রস্থ হয়, যেমন – ইয়াতিমদের প্রতিপালন,

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন, মসজিদ মাদ্রাসার সংস্কার সাধন ইত্যাদির জন্যে ঋণ করে, আর পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে যাকাতের অর্থ দিয়ে এ ঋণও পরিশোধ করা যাবে। যদি ঐ ব্যক্তি ধার্মিক হয়. তাহলেও এটা বৈধ হবে।

৭। ফিসাবিলিল্লাহ (আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়) ঃ ইসলাম প্রচার, প্রসার, প্রতিষ্ঠা এবং মানব কল্যাণের সব কাজই ফিসাবিলিল্লাহে দান। এসব ক্ষেত্রে যাকাতের তহবিল থেকে অর্থ ব্যয় করা অন্যরকম দান। ফকিহদের মধ্যে অবশ্য এই শব্দের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। অনেকে মনে করেন আল্লাহর দ্বীন কায়েমের পথে জিহাদকারীদের মধ্যেই ইহা সীমিত তারা যদি রাষ্ট্রীয় তহবিল, বায়তুলমাল হতে বেতন না পায় এবং ধনীও হয় তাহলেও তাদের জন্য এই অর্থ ব্যয় বৈধ। আবার অনেকে মনে করেন এর মধ্যে ঐসব কাজ রয়েছে যা বান্দাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। সুতরাং যে কেউ আল্লাহর পথে সংগ্রাম করলে, তার অনুগত হয়ে সৎকর্মশীল হলে এবং তাঁরই দ্বীন প্রচারের জন্যে ব্রতী হলে তারা যাকাত পাবার যোগ্য বিবেচিত হবে। এই দৃষ্টি কোন থেকে স্কুল, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা হাসপাতাল, সেনিটারী লেট্রিন, কালভার্ট ইত্যাদির খাতে ব্যয় আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের মধ্যে আসে।

৮। মুসাফির (ভ্রমণকারী) ঃ যে পথচারী সফরে এসে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে তাদেরকেও যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে। এক্ষেত্রে যারা সফরে বেড়িয়ে বিদেশ-ভ্রমণে অর্থাভাবে আটকে পড়েছে এবং দেশে ফিরে আসতে পারছেনা, আর যে কাজে গিয়েছে তাও সম্পন্ন হচ্ছেনা একই কারণে সেই অবস্থায় তাদেরও যাকাতের অর্থ পাবার হক রয়েছে। তবে এ অবস্থায় তাদের সফরের উদ্দেশ্যে বৈধ হতে হবে। মহান আল্লাহ তাআলা সতর্ক করে দিয়ে বলেন সৎকর্ম ও খোদাভীরু একে অন্যের সাহায্য করে। পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করেনা।[১] কোন কোন ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মতে এই বিধানের আওতায় যাকাতের অর্থ পথিকদের জন্যে রাস্তাঘাট মেরামত, পান্থনিবাস তৈরী ইত্যাদি কাজেও ব্যবহার করা যায়। যদিও ফকীহদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

১। সূরা আল-মায়েদা আয়াত নং-২

Dhaka University Institutional Repository

যাকাতের আর্থ-সামাজিক প্রভাব

যাকাতের অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে দেশের আর্থ-সামজিক পরিমণ্ডলে একটা তাৎপর্যপূর্ণ ও ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করা সম্ভব। দেশের দারিদ্র বিমোচনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারে যাকাত ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে আমাদের দেশে যাকাতের প্রভাব কত? তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা গবেষণা হয়েছে, যা বাস্তবায়ন করতে পারলে সমাজের প্রতিটা ক্ষেত্রেই শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এখানে যাকাতের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থ সামাজিক প্রভাব তুলে ধরা গেলঃ

১। ধনলিপ্সা দূর হয় ঃ অর্থ-সম্পদের প্রতি দূর্বর আকাঙ্খা মানব জীবনের সহজাত প্রবৃত্তি, অর্থমোহ মানুষের মধ্যে লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা ও অহংকারের জন্ম দেয়, আর এর ফলে মানুষ অমানুষে পরিণত হয়। কিন্তু যাকাত মানুষকে অর্থের মোহ থেকে মুক্ত করে সকল প্রকার কৃপণতা ও সংকীর্ণতা দূর করে দিতে সক্ষম। শুধু তাই নয়- বিত্তশালী মুসলমানদের ধন লিপ্সা দূর করে যাকাত অর্থ সম্পদ শুদ্ধ করার সুযোগ সৃষ্টি করে। ঠিক একারণেই আল-কুরআনে তাগিদ রয়েছে –

"তাদের ধন-সম্পদ হতে যাকাত উসূল করো যা তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে।"(১)

২। যাকাতের উদ্দেশ্য শুধু দারিদ্র বিমোচন নয়, বরং ধনী ব্যক্তিদের ধন-সম্পদকে পবিত্র ও শুদ্ধ করণ। আল-কুরআনে আল্লাহপাক ঘোষণা করেছেন –

"আত্মীয় স্বজনকে তার হক দান কর এবং অভাবগ্রস্থ ও মুসাফিরকেও।"(২) অর্থাৎ যাকাত প্রাপ্তির দিক থেকে গরিব ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের অধিকার, কিন্তু আদায়ের দিক থেকে তা ধনীদের দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা সমাজে বিরাজমান দারিদ্রের প্রকৃতি ও পরিধি, আয়, বন্টনের আকৃতি এবং সম্পদ ও আয়ের ধরণের উপর নির্ভরশীল। তবে যাকাতের অর্থ পরিকল্পিত ও যথাযথ ব্যবহার হলে দারিদ্র বিমোচনে তার লক্ষনীয় প্রভাব পড়বেই। এ প্রসঙ্গে অনেকেই অর্থ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক কল্যাণ, ইত্যাদি প্রকল্পে ব্যয় করার প্রয়োজন অনুভব করে থাকেন। এতে গরীবদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

১। সূরা আত্-তাওবা আয়াত নং- ১০৩

২। বণী ইসরাইল, আয়াত নং- ২৬-২৭

Dhaka University Institutional Repository

৩। আয় পূণঃবন্টনঃ সকল ইসলামী অর্থনীতিবিদ এ ব্যাপারে একমত যে, যাকাত যদি যথাযথভাবে আদায় ও বন্টিত হয় তাহলে তা মুসলিম দেশগুলোতে অর্থনৈতিক উন্নতির স্তর নির্বিশেষে বিরাজমান মারাত্মক আয় ও ধন বন্টন বৈষম্য দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে।

৪। উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টিঃ অর্থনীতির বিভিন্ন পর্যায়ের আলোচনায় প্রচুর মাঠ পর্যায়ে গবেষণা লব্ধ সমীক্ষার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেসব গবেষণায় দেখানো হয়েছে ধনীদের তুলনায় দরিদ্রের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা বেশ উঁচু। এক্ষেত্রে বাস্তবতা হলো অধিকাংশ মুসলিম দেশে এরাই জনগণের বৃহত্তর অংশ। যাকাত যেহেতু ধনীদের কাছ থেকে দরিদ্রের কাছে হস্তান্তর আয় সেহেতু এই তথ্যের তাৎপর্য হলো অর্থনীতিতে এ ধরণের ব্যয়ের ফলে সামাজিক ভোগ ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে। এসব দেশে অর্থনীতিতে কষ্টকর চাহিদার দরুন ঘাটতি থাকায় উঁচু হারের ভোগ প্রবণতা নিঃসন্দেহে প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের অনুকূল প্রভাব বিস্তার করবে।

আবার বিনিয়োগ যদি বন্ধ থাকে তাহলে সঞ্চয়ের উপর যাকাতের প্রভাব হবে নেতিবাচক। অন্যভাবে বলা যায় যদি বিনিয়োগ করার জন্যে উদ্যোগ না নেয়া হয় তাহলে ক্রমাগত যাকাত প্রদানের ফলে এক সময়ে দেখা যাবে অর্থ সম্পদ কমতে কমতে নিসাবের নিচে নেমে যাবে।

এমতাবস্থায় ব্যক্তিকে তার সম্পদ অব্যবহৃত, অলসভাবে জমা ফেলে না রেখে উৎপাদনমূলক ভাবে অথবা অন্যকোন লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত করে। এর সামগ্রিক ফলাফল নেতিবাচক নয় বরং ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। সুতরাং জোড় দিয়েই বল যায় ইসলাম মানুষকে বিনিয়োগে উৎসাহিত করেছে। সম্পদ জমা করে রাখতে বলেনি। মহানবী (সঃ) নিজেও এর অনাকাঙ্খিত পরিণতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন সেজন্যই তিনি যারা ইয়াতিমদের ধন-সম্পদ রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন তাদেরকে তা বিনিয়োগ করতে বলেছেন যেন থাকাত দেয়ার ফলে তা ধীরে ধীরে কমে না আসে।

৫। স্থিতিশীলতাঃ যাকাতের অর্থ যদি পর্যাপ্ত হয় তাহলে তার একটি অংশ চক্র-বিরোধী কৌশল অবলম্বনের জন্যে কাজে লাগানো যেতে পারে। অর্থাৎ যখন মুদ্রাস্ফীতি হয় তখন যাকাতের কিছু অর্থ সঞ্চয় হিসেবে রাখা যায়। আবার মুদ্রা সংকোচনের সময় যদি তা ছাড়া হয় তাহলে অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে এবং ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

Dhaka University Institutional Repository

যাকাতের অর্থ দিয়ে বাস্তবায়নযোগ্য কর্ম-পরিকল্পনা

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় ৫০% লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে–যারা দৈনিক ১,৮০৫ কিলো ক্যালোরী খাদ্য অথবা তার কম গ্রহণ করতে বাধ্য হয় তারাই চরম দারিদ্র সীমায় রয়েছে। পক্ষান্তরে যারা দৈনিক ২১১২ কিলো ক্যালোরী খাদ্য অথবা তার কম গ্রহণ করতে পারে তারা রয়েছে দারিদ্র সীমায়। এর মূল কারণ হলো ক্রয় ক্ষমতার অভাব, তাই হয় এদেরকে খাদ্য সাহায্য দিতে হবে অথবা ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানোর উপযুক্ত কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। নইলে এরা সম্পদের পরিবর্তে দেশের বোঝা হয়ে দাড়াবে। বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে দারিদ্রের পরিমাণ কত? বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রথমবারের মতো ২০০০ সালে মৌলিক চাহিদার ব্যয় পদ্ধতি [Cost of Basic Needs (CBN) Method] ব্যবহার করে Hould Income and Expenditure Survey (HIES) পরিচালনা করে এই পরিমাপ পদ্ধতিতে উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে জাতীয় পর্যায়ে দারিদ্রের পরিমাণ দাড়িয়েছে ৪৯.৮ শতাংশ। শহর এলাকায় এর পরিমাণ ৩৬.৬ শতাংশ হলেও পল্লী এলাকায় এর পরিমাণ ৫৩.১ শতাংশ।[১]

বাংলাদেশে এসব দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে যাকাতের তহবিল থেকে যেসব কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা দরকার তা নিম্নরূপ –

১। বাংলদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৪; পৃঃ ১৫৬

Dhaka University Institutional Repository

ত্রান ও কল্যাণধর্মী কর্মসূচী

১। বৃদ্ধদের জন্যে ভাতা প্রদানঃ- আমাদের দেশে সরকারী, আধা-সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হতে যারা অবসর নেয় কেবলমাত্র তারাই পেনশন পেয়ে থাকে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবির বার্ধক্য কালিন সময়ে কোন আর্থিক সহায়তা নেই। অনেক সময় নিজেদের পরিবারের কাছেও এরা বোঝা স্বরূপ। এদের এই অসহায় অবস্থা দূর করার জন্যে প্রাথমিকভাবে দেশের সকল ইউনিয়ন (৪৪৫১) এবং পৌর কর্পোরেশনের অধীনস্থ ওয়ার্ডের (৫৮৪) প্রতিটি হতে প্রতি বছর যদি অন্ততঃ পঞ্চাশ জনকে মাসিক টাকা ১০০০/- হিসেবে আর্থিক সহায়তা দেয়া যায় তাহলে ২,৭১,৭৫০ জন উপকৃত হবে। তাদের নুন্যতম প্রয়োজনের খানিকটা পূরণ হবে। এজন্য প্রয়োজন হবে বার্ষিক ৩০২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। ইদানিং সকল ইউনিয়ন ও পৌর সভার ওয়ার্ড পিছু পাঁচ জন দরিদ্র অসহায় বৃদ্ধ ও বিধবাদের ২০০/- টাকা হারে সরকারীভাবে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু ইতি মধ্যেই খবরের কাগজে প্রকাশিত রিপোর্ট হতে জানা যায় জনকল্যাণের চেয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করাই এর পেছনে বেশী কাজ করছে। সাহায্য প্রার্থীরা বিশেষ এক রাজনৈতিক দলের সমর্থক কিনা তালিকাভূক্তির ক্ষেত্রে সেটাই বিশেষ প্রধান্য পাচ্ছে। যাকাতের অর্থ বন্টনের ক্ষেত্রে এধরণের উদ্দেশ্যে কোন ক্রমেই কাঙ্খিত হবেনা।

২। বিধবাদের সাহায্য সহযোগীতা ঃ বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে যে সকল নারীরা বিধবা হয়ে থাকে তাদের দুঃখ দুর্দশার সীমা নেই। তাদের অসহায় অবস্থা দূর করার জন্যে প্রাথমিকভাবে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নের এবং পৌর কর্পোরেশনের অধিনস্থ ওয়ার্ডের প্রতিটি হতে কমপক্ষে কুড়ি জন করে বিধবা পরিবার বেছে নেওয়া হয়। তাহলে সর্বমোট ১০০,৭০০টি পরিবারকে সহায়তা ১০০০/- টাকা করে সাহায্য করলে বার্ষিক ১৭০ কোট ৮৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩। **বিকলাঙ্গদের সাহায্য** ঃ এদেশে জন্মগতভাবে, দূর্ঘটনা জনিত কারণে, নানাবিধ রোগ-ব্যধির কারণে অনেক মানুষ বিকলাঙ্গ হয়ে থাকে। এরা একদিকে যেমন অসহায় অন্যদিকে পরিবারের জন্য বোঝাও বটে। এদের অসহায় অবস্থার দূর করার জন্যে প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌর এলাকা হতে প্রতি বছর কমপক্ষে কুড়ি জন করে বিকলাঙ্গকে বেছে নিলে সর্বমোট ১০০,৭০০টি পরিবারকে সহায়তা প্রদান করা যাবে। এদেরকেও মাসিক ন্যুনতম ১০০০/- টাকা করে ভাতা প্রদান করলে ১৭০ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন হবে।

৪। **পারিবারিক মৌলিক সহায়তা** ঃ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল এবং শহরতলীতে বহু পরিবার রয়েছে যারা মশার আক্রমন হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে একটি মশার ব্যবস্থা করতে পারছেনা, শীতের প্রকোপ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্যে একটি লেপ, কম্বল এর ব্যবস্থা করতে পারছেনা। এধরণের পরিবারের শিশু এবং বৃদ্ধ/বৃদ্ধাদের কষ্ট অবর্ণনীয়, তীব্র শীতের কষ্টে প্রতি বছর বহু শিশু ও বৃদ্ধ/বৃদ্ধা মৃত্যু বরণ করছে এছাড়া নানা রোগ ব্যধিরও শিকার হচ্ছে। এ ধরণের জটিল সমস্যার সমাধানের জন্য যদি একটি করে বড় মশারী $\left(৫\frac{১}{২}\times৭\right)$ এবং একটি লেপ/কম্বল $\left(৬\times৭\frac{১}{২}\right)$ ক্রয় করে দেওয়া যায় তাহলে তারা দীর্ঘদিনের জন্যে মশার আক্রমন ও প্রচন্ড শীতের প্রকোপ হতে রক্ষা পাবে। যদি প্রতিটা মশারীর গড় মূল্যে ২৫০/- টাকা হয় এবং প্রতিটা লেপ/কোম্বলের গড় মূল্য ৬০০/- টাকা হয় তাহলে এজন্যে প্রয়োজন হবে ২১ কেজি ৩৯.৫ লক্ষ টাকার এই পদক্ষেপের ফলে দশ বছরে ২৫ লক্ষ ১৭ হাজারেরও বেশী পরিবার উপকৃত হবে।

৫। **কন্যাদায় গ্রস্থদের সাহায্য** ঃ আমাদের সমাজে যে সকল সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হল মেয়ের বিয়ে। যৌতুকের অভাবে অনেক মেয়ের বিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া যৌতুক না দিলেও মোটামুটিভাবে মেয়েকে সাজিয়ে গুছিয়ে শ্বশুর বাড়ীতে পাঠাতে হলেও যে টাকার প্রয়োজন তা অনেক পিতা মাতারই নেই। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে ন্যুনতম ৫০০০/- টাকা হলে একটি মেয়েকে স্বামীর ঘরে পাঠানো সম্ভব। যদি দেশের প্রতিটা ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড হতে প্রতি বছর ৫টি করে মেয়ের বিয়ের জন্যে এ ধরণের সহযোগিতা করা যায় তাহলে বছরে ব্যয় হবে ১২ কোটি ৫৮.৭ লক্ষ টাকা। দশ বছরে বিয়ে হবে ২,৫১,৭৫০টি মেয়ের। ফলে যে বিপুল সামাজিক কল্যাণ অর্জিত হবে তা অপরিসিম।

Dhaka University Institutional Repository

৬। ঋণগ্রস্থ কৃষকদের জমি অবমুক্ত করণ ঃ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে এমন অনেক ভূমিহীন কৃষক রয়েছে যারা কয়েক বছর পূর্বেও মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল, কৃষি জমির মালিক ছিল। কিন্তু পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ করতে যেয়ে ব্যাংক অথবা গ্রাম্য মহাজনের নিকট থেকে ঋণ গ্রহণের ফলে তাদের কৃষি জমি হারিয়ে ফেলেছে। প্রান্তিক ও ক্ষুদে কৃষকরাই এই তালিকার সংখ্যাধিক, এসব ঋণ গৃহীতাদের অধিকাংশই এই ঋণ আর শোধ করতে পারেনা। ফলে ঐ জমি চলে যায় ব্যাংক বা মহাজনের হাতে। এই জমি উদ্ধার করার জন্য ঐ ঋণ কৃষককে যাকাতের অর্থ থেকে প্রদান করা যেতে পারে। যদি সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা করে প্রতি ইউনিয়নের বিশ জন কৃষককে সাহায্য করা যায় তাহলে ৮৯০২০জন কৃষককে প্রতি বছর ঋণ মুক্ত করা যায়, এতে বার্ষিক ব্যয় হবে ৪৪ কোট ৫১ লক্ষ টাকা। এতে দশ বছরের মধ্যে প্রায় সকল ক্ষুদেও প্রান্তিক ঋণ মুক্ত হয়ে যাবে।

৭। দরিদ্র শিশুদের পুষ্টি সাহায্য ঃ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে তো বটেই শহরের বস্তি এলাকাতেও অসংখ্য শিশু নিদারুন পুষ্টিহীনতার শিকার। ফলে এরা যৌবনেই নানান ধরণের দুরাগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। যেমন রাতকানা, রিকেট, ম্যারাসমাস, ঘ্যাস, প্রাইলস, প্রভৃতি নানা রোগের শিকার হয়। এর প্রতি বিধানের জন্যে যাদের বয়স ২ থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে তাদের ভিটামিন "এ" ক্যাপসুল ভিটামিন "সি" ট্যাবলেট আয়োডিন যুক্ত লবনের প্যাকেট ইত্যাদি সরবরাহ করা যেতে পারে। এজন্যে প্রাথমিক পর্যায়ে যদি প্রতি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডে দুই হতে চার বছরের ১০০ জন শিশুকে বাছাই করা হয় তবে প্রতি বছরের ৫,০৩,৫০০ শিশু এর আওতায় আসবে শিশুর বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হলে এই সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে। এজন্যে শিশু প্রতি মাসিক ব্যয় যদি ন্যুনতম ৬০/- টাকা ধরা হয় তাহলে খরচ হবে ৩৬ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা।

৮। প্রসাবকালীন সহযোগিতা ঃ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এখনও প্রসূতি মায়েদের যথাযথ পরিচর্যা সেবা যত্ন ও পুষ্টিকর খাবার যোগানের ব্যাপারে একদিকে যেমন বিপুল অমনোযোগিতা ও অশিক্ষা বিদ্যমান তেমনি সামর্থ্যের অভাবও স্বীকৃত। ফলে মায়েদের শেষের ছয় সপ্তাহে যখন পুষ্টিকর খাবারের বেশী প্রয়োজন তখন তারা তা যেমন পায়না প্রসবের পরেও সেই অবস্থার কোন উন্নতি ঘটেনা। ঘটনাক্রমে যদি উপর্যপুরি দ্বিতীয়,

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় কন্যা সন্তানের জন্ম হয় তাহলে আর ঐ প্রসূতির প্রতি অনাঙ্গর অবহেলার সীমা থাকে না। উপরন্তু প্রসবকালে সে পরিচ্ছন্ন ও জীবানুমুক্ত কাপড়-চোপড়, জীবানু নাশক সামগ্রী ও ঔষধপত্র প্রয়োজন দরিদ্র পরিবারে তার খুব অভাব। এর প্রতিবিধান করতে পারলে গর্ভবর্তী ও প্রসূতিমায়ের কল্যাণ হবে। তাদের অকাল মৃত্যুর হার কমে যাবে। একই সাথে নবজাতকের মৃত্যুর হার ও কমে যাবে। এজন্যে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পিছু যদি ২০টি দরিদ্র পরিবারের গর্ভবর্তী মাকে বেছে নেয়া হয় এবং ন্যুনতম ২০০০/- টাকা সহযোগিতা দেয়া যায় তাহলে বছরে প্রয়োজন হবে মোট ২০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা।

৯। ইয়াতিমদের প্রতিপালন ঃ বাংলাদেশে যে কয়টি শিশু সদন রয়েছে সে তুলনায় ইয়াতিম শিশু কিশোরদের সংখ্যা অনেক বেশী, সে কারণে ঐ সকল শিশু সদনে সংকুলন মোটেই সম্ভব নয়। উপোরন্তু ঐ গুলোতে আহার ও পোষাকের যে দুঃখবহ চিত্র মাঝে মাঝে বিভিন্ন মাধ্যমে দেখা যায় তা হৃদয় বিদারক। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেও অনেক শিশু-কিশোর ইয়াতিম ও নিঃস্ব হয়। এদের জন্য বস্ত্র, বাসস্থান ও শিক্ষার যাকাতের অর্থ ব্যয় করা খুবই জরুরী। এজন্যে নতুন ইয়াতিমখানা তৈরী, ইয়াতিমদের ভরণ পোষণ ও সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং সাধারণ শিক্ষাসহ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যদি ১০০ জন ইয়াতিমের একটি প্রতিষ্ঠানের জন্যে বার্ষিক ন্যুনতম সার্বিক ব্যয় ১২ লক্ষ টাকা ধরা হয় তবে এরকম ৫০টি ইয়াতিম খানার জন্যে বছরে ব্যয় হবে ৬ কোটি টাকা।

১০। মুসাফিরদের সাহায্য ঃ বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে নিঃস্ব হয়েছে এমন লোকদের সংখ্যা অনেক ঘর আগুনে পুড়ে নিঃস্ব হয়েছে, বাড়ী-ঘর নদী গর্ভে বিলিন হয়ে গেছে। চিকিৎসা করাতে এসে বাড়ী ফেরার মত অর্থ নেই। দুর্বৃত্তের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারিয়েছে মসজিদে নামাজ শেষে প্রায়ই এ ধরণের অসহায় মানুষকে সাহায্যের আবেদন শোনা যায়। এ ধরণের মানুষের সাহায্য সহযোগিতা করা আমাদের শরীয়তের দায়িত্ব। এ ব্যাপারে মসজিদের ইমাম সাহেবের সাহায্য নেয়া যায়। তাঁর হাতে প্রতি মাসে ২০০০/- টাকা তুলে দিলে ঐ সকল মানুষের সাময়িক সাহায্য করা সম্ভব। দেশের ৬৪টি জেলা শহরে গড়ে ৫টি এবং থানা সদরে একটি করে মসজিদ বাছাই করে নিলে মোট মসজিদের সংখ্যা দাড়ায় (৩২০+৪৬০=৭৮০)। এসব মসজিদে মুসাফিরদের জন্যে মাসে গড়ে ২০০০/- টাকা ব্যয় করলে বছরে খরচ হবে ১ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা। এর ফলে যে বিপুল সামাজিক উপকার হবে তা অবর্ণনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

১১। ইউনিয়ন মেডিক্যাল সেন্টার ঃ আমাদের দেশের পল্লী এলাকায় চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবার সুবিধার খুবই অভাব। গ্রাম্য জনগণ সুচিকিৎসার অভাবে তাবিজ-তুমার, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদির উপর বিশ্বাস করে। আবার কখনও, হাতুরে ডাক্তারের খপ্পরে পড়ে জীবন আরো দুর্বিসহ অবস্থায় ফেলে দেয়। এদেরকে সুস্থভাবে বাঁচার সুযোগ দিতে হলে আধুনিক চিকিৎসা সুবিধা পল্লী এলাকায় পৌছে দিতে হবে। এজন্যে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে ন্যুনতম সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন মেডিক্যাল সেন্টার গড়ে তোলা দরকার। এদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপক প্রসারের উদ্দেশ্যে সরকার "স্যাটেলাইট ক্লিনিক" নামে ইউনিয়ন ভিত্তিক কর্মসূচী চালু করেছেন আজ হতে দুই দশক আগে সে ধাচেই প্রস্তাবিত ইউনিয়ন কেন্দ্রিক এই সেন্টার গড়ে উঠতে পারে। এটি হবে মুলত ভ্রাম্যমান মোবাইল, এখানে থাকবে একজন এম,বি,বি,এস ডাক্তার একজন করে পুরুষ মেডিকেল এসিটেন্ট ও মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী এবং পল্লী এলাকায় সব ঋতুতে ব্যবহার ও চলাচল উপযোগী বিশেষভাবে তৈরী ভ্যান। এই জন্যেই থাকবে ঔষধপত্র ও চিকিৎসার যাবতীয় সরঞ্জাম। ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত গ্রামগুলোতে পালা করে নির্দিষ্ট দিনে হাজির হবে এই ভ্রাম্যমান মেডিকেল সেন্টার, বিনামূল্যে চিকিৎসা স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ের পরামর্শ পাবে পল্লী জনগণ ইউনিয়ন পিছু কেন্দ্রের গড় মাসিক ব্যয় (ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী, ভ্যান চালকের বেতন ও ঔষধসহ) ন্যুনতম বিশ হাজার টাকা ধরলে দেশের ৪,৪৫১টি ইউনিয়নের জন্যে বার্ষিক ব্যয় দাড়াবে ১০৬ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা।

১২। মরনোত্তর ঋণ পরিশোধ ঃ ঋণ বান্দার হক, এই ঋণ পরিশোধ না করলে আল্লাহ তা'আলাও তা ক্ষমা করবেন না যতক্ষণ না তা বান্দাই ক্ষমা করবেন। সহীহ্ হাদীসে উল্লেখ আছে-ঋণ রেখে মারা গেলে শহীদকেও আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করবেন না। তাই যদি কোন ঋণ গ্রহীতা ঋণ পরিশোধ না করে মারা যায় এবং তার সন্তান সন্ততি বা উত্তরাধিকারীরা সেই ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে শেষ দিবসে ঐ ব্যক্তির অনন্ত আযাবের আশংকা রয়েছে। তাই ঋণগ্রস্থ দরিদ্র কৃষকের জমি অবমুক্ত করার জন্যে যে ধরণের প্রস্তাব ইতিপূর্বে করা হয়েছে, অনুরূপ সাহায্য এক্ষেত্রেও করা যেতে পারে। কৃষি কাজ ছাড়াও নানা কাজে লোকে ঋণ নেয় এবং অনেকে তা সাধ্যমতো চেষ্টা সত্ত্বেও শুধতে পারেনা। এদের মরনোত্তর ঋণ পরিশোধে এগিয়ে এলে অসহায় সন্তান সন্ততি ও বিধবা স্ত্রী পীড়ন ও অসম্মান হতে রেহাই পাবে। উপরোন্ত ঋণ যদি জমি বন্ধক রাখার কারণে হয়ে থাকে তাহলে ঋণ পরিশোধের ফলে জমি ফিরে পাবে ওয়ারিশরা, এতেও বিরাট কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৩। শরনার্থী সহায়তা ও উদ্বাস্ত পূণবার্সন ঃ বর্তমান সময়ে বিশ্বজুড়ে মুসলমানরা সন্ত্রাসের শিকার। স্বদেশ ছেড়ে পার্শবর্তী দেশে আশ্রয় নিচ্ছে অসহায় হাজার হাজার নারী পুরুষ, শিশু-কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ। জীবন বাঁচাবার জন্যে অনেকেই নিরুপায় হয়ে শুধু পুরণের কাপড়টুকু সম্বল করে অজানা গন্তব্যের দিকে যারাপারি জমিয়েছিল তাদের বর্তমান অবস্থা বিভীষিকাময়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তারা অজানা ও অনিশ্চিত। চেচনিয়া, বসনিয়া, মায়ানমার, মেসিডোনিয়া, কাশ্মীর, মিন্দানাও, ইথিওপিয়া, পূর্ব তিমুর, নাইজেরিয়া, আফগানিস্তান, লেবানন, ফিলিস্তিন এর জ্বাজ্বল্যমান উদাহরণ, জাতিসংঘের উদ্বাস্ত হাইকমিশনের দেয়া সাহায্য এবং মাঝে মাঝে মুসলিম বিশ্বের কোন কোন দেশের পাঠানো মানবিক সাহায্য বিপুল প্রয়োজনের তুলনায় সমুদ্রে গো-সম্পদ মাত্র লাখো লাখো বনি আদমের সাহায্যে মুসলিম মিল্লাতকেই এগিয়ে আসতে হবে। উম্মাহর এই দুর্দিনে রাষ্ট্রের পাশাপাশি ব্যক্তি মুসলমানকেই এগিয়ে আসতে হবে শক্তি সামর্থ্য নিয়ে সেই সাথে যাকাতের অর্থও দিতে হবে অকাতরে এসব অভাবী ভাইবোনদের প্রয়োজনে, তাদের পুনঃবাসনের জন্যে ক্ষুধা তৃষ্ণার খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের পাশপাশি শীতের ঠান্ডা, গ্রীষ্মের দাবদাহ হতে রক্ষার জন্য দরকার আশ্রয়স্থল। বাংলাদেশে এখনও মায়ানমারের রোহিঙ্গা মুসলমান এবং আটকে পড়া পাকিস্তানিদের অনেকেই মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্যহচ্ছে। এদের প্রয়োজন পূরণ ও প্রত্যাবাসনে ও যাকাতের অর্থে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা সম্ভব। এজন্য দরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও যথাযথ পরিকল্পনা।

১৪। স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার ঃ এদেশের পল্লী অঞ্চলে তো আছেই শহরতলীতেও স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগারের বেশ অভাব। হাজার হাজার পরিবারের একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আর্থিক সামর্থ্যের অভাবে শৌচাগার তৈরী করা সম্ভব হয়না, একারণেই যেখানে সেখানে প্রসাব ও পায়খানার কদর্য ও স্বাস্থ্যবিধি বহির্ভূত অভ্যাস আরও বেশী প্রসার লাভ করছে। এরফলে সহজেই পানি দূষিত হচ্ছে। সংক্রামক ব্যাধিবিস্তার লাভ করছে। পুঁতি গন্ধময় পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে। উপরোন্ত গ্রামাঞ্চলে মহিলাদের পক্ষে ইজ্জত আরুদ্ধ বজায় রেখে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করা খুবই দূরূহ। দেশের উত্তরাঞ্চলে এই সমস্যা

Dhaka University Institutional Repository

সব চেয়ে বেশী প্রকট। এর বিহীত ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে দারিদ্র পরিবার সমূহের জন্যে স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা করা জরুরী। এজন্যে দরকার একটা প্যানসহ স্লাব এবং সিমিন্টের ২/৩টা রিং। এতে সর্বোচ্চ খরচ পড়বে ৩৫০/- টাকা। গৃহীতারা নিজেরাই পাটখড়ি বা শুকনা কলা পাতা পলিথিন দিয়ে এটা ঘিরে নিতে পারে। যদি প্রতি ইউনিয়নে ও ওয়ার্ডে বছরে ৫০টি পরিবারকে এই সুবিধা দেওয়া যায় তাহলে প্রয়োজন হবে ৮ কোটি ৮১ লক্ষ টাকা। এভাবে ১০ বছরে ২৫,১৭,৫০০ পরিবার এই কর্মসূচীর আওতায় চলে আসবে। পর্দা স্বাস্থ্য রক্ষা ও পরিবেশ দূষণরোধে এর ফলাফল হবে সুদূঢ় প্রসারী।

১৫। নওমুসলিম পুনঃবাসন ঃ আমাদের দেশে প্রতি বছরই অন্য ধর্মের কিছু কিছু লোক, পরিবার ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম কবুল করে। ইসলাম কবুলের সাথে সাথেই তারা পারিবারিক সাহায্য সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়। এদের সম্মানজনক পূনঃবাসনের জন্যে সহযোগিতায় এগিয়ে আসা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। যদি দেশের সকল অঞ্চল হতে প্রতি বছর অন্তত ৫০টি নওমুসলিম পরিবারকে এ উদ্দেশ্যে ন্যুনতম মাসিক ৫০০০/- টাকা হারে এক বছর ভাতা প্রদান এবং কর্মসংস্থানের জন্যে এককালিন ১০ হাজার টাকা সাহায্য করা যায় তাহলে বছরে ব্যয় হবে ৩০ লক্ষ টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচী

১। ইসলামী শিক্ষা অর্জনে সহযোগিতা ঃ প্রকৃত মুমিন হতে হলে ইসলামী শিক্ষা অর্জন করা একান্ত জরুরী, অথচ এদেশে ইসলাম শিক্ষা অর্জনের সুযোগ ক্রমেই সংকোচিত হয়ে আসছে। দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যম মাদ্রারাসাগুলো কোন ক্রমে টিকে আছে। সরকারী পরিসংখ্যান হতে দেখা যায় ১৯৯১–১৯৯২ সালে দখিল মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৪,৪৬৬। এসংখ্যা ১৯৯৪–৯৫ সালে এই সংখ্যা দাড়ায় ৪,১২১। তিন বছরে কমে যায় ৩৪৫টি মাদ্রাসা। আবার সরকার প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য বিনামূল্যে বই বিতারণ, উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের উপবৃত্তি, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য বিতরণ ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতেছে। অথচ মাদ্রাসাগুলো এসব সুযোগ হতে বঞ্চিত। এক্ষেত্রে মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষার মান বাড়াতে হলে অনুরূপ সুযোগ প্রদান করতে হবে। এজন্য দখিল আলিম ও ফাজিল মাদ্রাসাগুলো হতে ১০ লাখ ছাত্র-ছাত্রী বেছে নেওয়া হয়। তাহলে এদের বই সরবরাহ করতে গড়ে মাথাপিছু ৩০০/- টাকা হিসেবে দরকার হবে ৩০ কোটি টাকা একসেট পোশাক সরবরাহ করতে গড়ে ২০০/- টাকা ধরলে প্রয়োজন হবে ২০ কোটি টাকা। এছাড়া স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যে ভিটামিন ও আয়রণ ট্যাবলেট সরবরাহ করলে প্রয়োজন হবে আরও ১০ কোটি টাকার। সর্বসাকুল্যে এই ৬০ কোটি টাকার বিনিময়ে মানব সম্পদ উন্নয়নের যে স্থায়ী ভিত রচিত হবে তার ভবিষ্যৎমূল্য অপরিসীম, এসবের পাশাপাশি মাদ্রাসার লিল্লাহ বোর্ডিংগুলোতে ও খাদ্যমান বাড়ানোর জন্য যাকাতের অর্থ ব্যবহার অপরিহার্য।

২। ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ ঃ ইসলামের প্রচার, প্রসার এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থা কায়েমের জন্যে ইসলামী চিন্তা ও বিশ্বাসের ধারক বই পুস্তক ও পত্র পত্রিকা প্রকাশের কাজে বিশেষ মনোনিবেশ করতে হবে। সহজবোধ্য করে লেখা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার বুনিয়াদী শিক্ষার পাশাপাশি জ্ঞানগর্ভ, যুক্তিপূর্ণ অথচ স্বল্প আয়তনের বইয়ের এখন বিশেষ প্রয়োজন। এসব বই পৌছে দিতে হবে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবক যুবতীর হাতে। এ

Dhaka University Institutional Repository

পদক্ষেপ ছাড়া পশ্চাত্যের ভোগবাদী দুনিয়া সর্বস্ব জীবনদর্শনের মুকাবেলা করা আদৌ সম্ভব নয়। এ জন্যে মাদ্রাসা সহ অন্যান্য যেসব প্রতিষ্ঠান দ্বীনের কাজে সক্রিয়ভাবে লিপ্ত তাদেরই এগিয়ে আসতে হবে। এ প্রসঙ্গে বর্তমান শতাব্দীর প্রখ্যাত মনিষি ও ইসলামী চিন্তাবিদ ডঃ ইউসুফ আল-কায়যাবীর বক্তব্য এখানে তুলে ধরা যেতে পারে। তিনি বলেন-

যাকাত খাতের সমস্ত আয় সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণমূলক ও প্রচার ধর্মী কার্যাবলীতে ব্যয় করাই একালে উত্তম। সঠিক ইসলাম দাওয়াতের প্রচারের কেন্দ্র স্থাপন এবং অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন একালে সব কয়টি উপমহাদেশেই একান্ত কর্তব্য কেননা একালে বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের মধ্যে প্রচন্ড দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ চলছে। একাজও "জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ রূপে গণ্য হতে পারে। দেশের অভ্যন্তরে ইসলাম প্রচার কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং মুসলিম যুব সমাজকে একাজে নিয়োজিত করা এবং প্রতি পালন করা একান্ত আবশ্যক। খালেস ইসলামী মতবাদ ও চিন্তা ধারামূলক বই-পুস্তক ও পত্র পত্রিকা প্রচার করাও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তা প্রতিহত করবে বিধ্বংসী বিভ্রান্তিকর চিন্তা-বিশ্বাসের ধারক বই পুস্তক ও পত্র পত্রিকার যাবতীয় কারসাজি। তার ফলেই আল্লাহর কালিমা প্রাধান্য লাভ করতে পারে এবং সত্য সঠিক চিন্তা সর্বত্র প্রচারিত হতে পারে। একাজও আল্লাহর পথে জিহাদ, ঘুমন্ত মুসলিম জনগণকে জাগ্রত করা এবং খ্রীষ্টান মিশনারী ও নাস্তিকতার প্রচারকদের মুকাবিলা করা নিশ্চয়ই ইসলামী জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ।[১]

৩। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজঃ একথা নিঃদ্বিধায় বলা যায় যে, বাংলাশে ইসলামের প্রতি আহব্বান, দাওয়াত এবং প্রচার- প্রসার, দ্বীনের প্রতি আহবানের কাজ অবহেলিত। ইসলামের শিক্ষা ও তার দাবী সম্বন্ধে অবহেলিত না হয়ে যুব সমাজ বিপদগামী, ভিন্ন জীবন দর্শনের অনুরাগী, এই অবস্থার প্রতিবিধানের জন্যে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করার বিকল্প নেই। প্রত্যেক ব্যক্তিকে দায়ী ইলল্লাহ হিসেবে গড়ে তুলবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, তাদের হাতে ইসলামী সাহিত্য পৌছে দেয়া খ্রীষ্টান মিশনারী ও এনজিওদের অপতৎপরতা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করা এবং ইসলামের বিশ্ববাসী যে অপপ্রচার ও শ্বেতস্নান চলছে সে সম্বন্ধে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ নিতান্তই জরুরী। দেশের সর্বত্র এই কাজের যথাযোগ্য আনজাম দেবার জন্যে কমপক্ষে

১। ডঃ ইউসুফ আল-কায়যাবী ইসলামে যাকাত বিধান, ২য় খন্ড, অনুবাদ- মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩; পৃঃ ১৭৫–১৭৬

Dhaka University Institutional Repository

থানা ভিত্তিক লোক নিয়োগ করতে হবে। এজন্যে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা খরচ করলে সারা দেশে বছরে খরচ হবে মাত্র তিন কোটি টাকা। দেশের ভবিষ্যৎ স্বার্থ বিবেচনায় এই অর্থ একেবারেই নগণ্য।

এই মহৎ কাজ বাস্তবায়নের জন্যে প্রাথমিক পর্যায়ে পাঁচ বছরেরর জন্যে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। তাতে থাকবে দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন ওয়র্ডে ইসলামী সাহিত্য বিতরণ এবং পাঠাগার স্থাপনের উদ্যোগ এতে ইউনিয়ন/ওয়ার্ড পিছু ন্যুনতম পঞ্চাশ হাজার টাকার কিছু বেশী। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এই পরিমাণ অর্থ সাধারণভাবে সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। তাই যাকাতের অর্থ ব্যবহার করে হলেও যুব সমাজকে ধ্বংসের পথ থেকে চিন্তা ও মননশীলতার দিকে ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে তৎপরতা গ্রহণ একান্তই জরুরী।

৪। শিক্ষার জন্যে বৃত্তি ঃ দেশের মাদ্রাসা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যেসব গরীব ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রী পড়াশুনা করছে তাদের লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহের জন্যে মাতা-পিতাকে খুব কষ্ট করে টাকা সংগ্রহ করতে হয়। এমন দেখা গেছে শেষ সম্বল চাষের জমিটুকু বিক্রি অথবা বন্ধক রাখতে হয় এদের মধ্যে থেকে উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রী/সম্মান ও মাষ্টার্স শ্রেণী, মাদ্রাসার ক্ষেত্রে আলিম, ফাজিল ও কামিল শ্রেণী, প্রকৌশল ও মেডিকেল কলেজ এবং পলিটেকনিক ও ভোকেশনাল ইনস্টিটিউটগুলোতে অধ্যায়নের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে যদি প্রতি বছর পঞ্চাশ হাজার ছাত্র/ছাত্রীকে বাছাই করা হয় এবং মাসিক ১,৫০০/- টাকা হারে বৃত্তি দেয়া হয়, তাহলে বার্ষিক ব্যয় হবে ৯০ কোটি টাকা। এভাবে দশ বছরে পাঁচ লক্ষ ছাত্র/ছাত্রীকে শিক্ষার একটা পর্যায় পর্যন্ত পৌছে দেয়া সম্ভব।

উল্লেখ্য, যেহেতু দ্বিতীয় বছরে নতুন ছাত্র-ছাত্রীরা এ প্রকল্পের আওতায় আসবে এবং পুরাতনরাও অধ্যয়নরত থাকবে। সেহেতু তখন প্রয়োজন হবে ১৮০ কোটি টাকা। তৃতীয় বছরে এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাড়াবে ২৭০ কোটি টাকা এবং চতুর্থ বছরে ৩৬০ কোটি টাকা। সম্ভাব্য বৃত্তি ভোগীদের বাছাই করার সময়ে মেধার পাশাপাশি প্রকৃতই পরিবারিক আর্থিক অনটন রয়েছে কিনা এমন প্রত্যয়ন পত্রের প্রয়োজন হবে। এলাকার দুজন বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীর আমল আখলাখ ও তাকওয়া সম্বন্ধে গোপনে প্রত্যয়ন করবেন। উপরোন্ত বৃত্তি ভোগিরা কর্ম জীবনে প্রবেশ করে প্রাপ্ত অর্থের অন্ততঃ ৫০% ওয়াক্বফ তহবিলে কিস্তিতে পরিশোধ করবে এরকম বিধান করাও সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

৫। **নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণ ঃ** নারীরা ঘরে বসেই যাতে জীবিকা উপার্জনের পথ করে নিতে পারে সেজন্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। বিভিন্ন ধরণের সেলাই, কাটিং-নিটিং, এমব্রয়ডারী, বুটিক, ফেব্রিকস, প্রিন্ট, ফুল, চামড়া, কাপড়ের আকর্ষণীয় সামগ্রী, উলের কাজ ইত্যাদির সেখানোর জন্যে জেলা ও থানা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। এখানে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল মহিলারাই কাজ শেখার সুযোগ পাবে। এজন্যে বড় বড় শহরে একাধিক এবং ছোট জেলা বড় থানা গুলোতে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি করে মোট ১০০টি কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে। এসব কেন্দ্রে প্রশিক্ষকের বেতন, শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক ব্যয়সহ মাসিক ন্যুনতম গড় ব্যয় ৮০০০/- টাকা ধরলে বছরে ব্যয় হবে ৯৬ লক্ষ টাকা। এর বিনিময়ে হাজার হাজার মহিলা আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিজেদের পায়ে দাড়াবার সুযোগ পাবে। তাদের আর্থিক প্রবৃদ্ধি ঘটবে, পারিবারিক বিপর্যয়ও রোধ হবে।

৬। **কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ঃ** বর্তমান সময়ে কম্পিউটারের গুরুত্ব খুবই জরুরী। ব্যাপক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বর্তমানে কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন অতীব গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আমাদের দেশে রয়েছে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকার। যদি ডাটা এন্ট্রি অপারেটর হিসেবে এদের প্রশিক্ষণ দেয়া যায় তাহলে এদের কর্মসংস্থানের সুযোগ খুলে যাবে। এ ব্যাপারে প্রতি বেশী দেশ ভারত ইতি মধ্যেই উদ্যোগ নিয়ে **V-sat** চ্যানেলের সংযোগ নিয়েছে এবং শুধুমাত্র ডাটা এন্ট্রি করেই প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে। আমাদেরও আগামী শতাব্দীর চাহিদা ও কর্মসংস্থানের প্রতি লক্ষ্য রেখে এখনই যুগোপযোগি প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ অবকাঠামো **(Communication intrastructure)** গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া উচিৎ। যদি প্রাথমিকভাবে দেশ-ব্যাপি ১০০টি সঠিক মানের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা যায় তাহলে বছরে ন্যুনতম ১২,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া যাবে। এজন্যে প্রথম বছরে ৫ কোটি টাকার মতো ব্যয় হলেও শেষে এটা বছরে ২ কোটি টাকায় নেমে আসবে।

উপরোক্ত কর্মপদ্ধতি ছাড়াও যাকাতের টাকা দিয়ে আরো অনেক কর্মসূচি গ্রহণ করা যায় যেমন যে সকল কৃষক হালের বলদ ক্রয় করতে পারছেনা তাদের হালের বলদ ক্রয়ে সহায়তা করা। পাশাপাশি দুধের গাই ক্রয় করে দেয়া। তাছাড়া গ্রাম বাংলার ও শহরতলীর এলাকাগুলোতে ক্ষুদে আকারের উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা যেমন –

Dhaka University Institutional Repository

ক) চাল, চিড়া, মুড়ি, খই তৈরী, মোয়া, চাটনী, আচার, মোরব্বা তৈরী, মিঠাই তৈরী, লুঙ্গি তোয়ালে, গামছা বোনা, বাঁশ- বেতের কাজ, নক্শী কাঁথা তৈরী বিভিন্ন ধরণের খেলনা তৈরী হাঁস-মুরগী পালন, মাছের চাষ, সবজ্বী চাষ ইত্যাদিতে সাহায্য করা।

খ) পেশাগত সরঞ্জাম ক্রয় সংযোজন ও মেরামত, রিক্সা ও ভ্যান তৈরী ও মেরামত, জাল তৈরী গরু ও ঘোরার গাড়ীর চাকা তৈরী ও মেরামত, চাষাবাদের সরঞ্জাম তৈরী ও মেরামত, ইলেকট্রিক সামগ্রী মেরামত, স্যালো মেশিন মেরামত ইত্যাদি।

গ) ক্ষুদ্র আকারের ব্যবসা, মুদী দোকান, মনোহারী দোকান, মাটির তৈজসপত্রের দোকান, চায়ের দোকান, দর্জির দোকান, মাছের ব্যবসা, সবজীর ব্যবসা, মৌসুমী ফলের ব্যবসা, ফুলের দোকান, ফেরীওয়ালা ইত্যাদি।

উপরে উল্লেখিত প্রায় ৪০ ধরণের কাজের মধ্যে যদি প্রতিটি ইউনিয়ন ও পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে যেকোন দশটি পেশায় প্রতি বছর গড়ে দশ জন হিসেবে ১০০ জন বেকার অথচ উদ্যোক্তা পুরুষ ও নারীকে গড়ে পাঁচ হাজার টাকার উপকরণ দিয়ে সহযোগিতা করা যায় তাহলে বছরে প্রয়োজান হবে সর্বমোট ২৫১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা। এ সুযোগ একজন লোক মাত্র একবারই পাবে। ফলে প্রতি বছরে কর্মসংস্থান হবে ৫,০৩,৫০০ জনের উল্লেখ্য, ডিসেম্বর ১৯৯৭ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংক বাদে উল্লেখযোগ্য NGO গুলোর প্রদত্ত ঋণের ক্রম পুঞ্জীভূত পরিমাণ ছিল ৪.৩৯৮ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। পক্ষান্তরে ১৯৯৭ সালে ঋনের পরিমাণ ছিল, ৫০৯ কোটি ৯ লক্ষ টকা। এবছরে ঋণ গ্রহীতাদের গৃহীত মাথাপিছু ঋণের পরিমাণ ছিল মাত্র ২,২৩৮/- টাকা।[১] এই ঋণে সবটাই শুধতে হয়েছে সুদসহ যার হার খুবই চড়া। গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষেত্রেই এ হার ১২২% হতে ১৭৩%, এমনকি ক্ষেত্র বিশেষ ২১৯% পর্যন্ত।[২] এরই বিপরীতে যাকাতের মাধ্যমে উপকরণ গৃহীতাকে সাহায্য করা হচ্ছে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে এবং প্রদত্ত অর্থও (যার পরিমাণ এনজিওগুলো প্রদত্ত গড় অর্থের দ্বিগুনের বেশী) তার কাছে বয়ে যাচ্ছে মূলধন আকারেই।

১। তথ্য সূত্রঃ CDF Statistics, Vol. 5, December 1997, Credit and Development Forum, Dhaka, P.60

২। ইনকিলাব, ৯ ও ১৬ নভেম্বর ১৯৯৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় শাখার ব্যয়ের খাতঃ

ফাই ও বিনা যুদ্ধে লব্দ ধন সম্পদঃ- আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফাই ও বিনা যুদ্ধে লব্ধ ধন সম্পদ এর ব্যয়ের খাত পবিত্র কুরআনে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ইহা প্রথমতঃ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় তথা বায়তুলমালে জমা থাকবে এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রয়োজনে তা ব্যয় হবে। হযরত নবী করীম (সঃ) এ ধরণের যাবতীয় মাল-সম্পদকে নিজেরই তত্ত্বাবধানে ব্যয় ও বন্টন করেছেন। এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে –

আল্লাহ গ্রামবাসীদের রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের নিকট থেকে তাঁর রাসূলকে যা কিছু বিনা যুদ্ধে দান করেছেন, তা আল্লাহ তাঁর নিকটাত্মীয়, ইয়াতিম, মিসকীন, ও নিঃস্ব পথিকদের জন্য বন্টন করা হবে। যেন ধন সম্পত্তি তোমাদের কেবল ধনীদেরই হাতে কুক্ষিগত হয়ে না থাকে।[১]

আয়াতে উল্লেখিত রাসূল এবং তাঁর নিকাত্মীয়ের অংশ বর্তমান সময়ে রহিত করা হযেছে। তবে তা দেশ বাসীর সামগ্রিক কল্যাণে, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন পূরণ এবং দেশের যাবতীয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় ব্যয় করা হবে। ইয়াতিম মিসকীন ও নিঃস্ব পথিকের জন্য যে অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে, তা তাদের ব্যয় করতে হবে।

মুসলমানদের কল্যাণ ব্যবস্থার দৃষ্টিতে অন্য কোন জাতির উপকার করা, তাকে ঋণ দেয়া কিংবা তাদের সহানুভূতি লাভ করার জন্যে অর্থ দান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব হলে এই অর্থ সে জন্যই খরচ করা যাবে।

মনে রাখতে হবে যে কুরআন মাজিদের উপরোক্ত আয়াতের ফাই অথবা সাধারণ রাষ্ট্রীয় ধন সম্পদের এক পঞ্চমাংশের ব্যয়ের খাত নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট চার পঞ্চমাংশ ব্যয় করার ভার ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচালকদের উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গনীমত ও ফাইর ধন-সম্পদের এক পঞ্চমাংশ ব্যয় করার ব্যাপারে যদি কোন রূপ মত বিরোধ দেখা দেয়, তবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানই উহার মিমাংসা করে দিবে।

১। সূরা হাসর – ৭ নং আয়াত

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ শাখার ব্যয়ের খাত ঃ

এ খাতের মধ্যে আছে খারাজ, জিজিয়া, অমুসলিম বণিকদের থেকে আদায়কৃত শুল্ক। কিরাউল আরদ এবং দারাইব।

- আর জিজিয়ার উদ্দেশ্যেই হল অমুসলিমদের নিরাপত্তা দান, এজন্য প্রশাসনিক ব্যয়ই এর মূল ব্যয় খাত।

- দারায়েব এর সংজ্ঞাতেই এর ব্যয়ের খাত সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, যুদ্ধাবস্থা, দুর্ভিক্ষ, জনকল্যাণ, জনগণের বেকরাত্ব দূর করার জন্য যাকাত সদকাহ ছাড়াও যে আর্থিক সাহায্য সরকারের তরফ থেকে বিত্তবানদের উপর আরোপ করা হয় তাকে দারায়েব বলা হয়। সুতরাং এর অর্থ বায়তুল মালে, জমা হওয়ার পরই তা দেশের প্রকৃত দূর্যোগ বা অন্য কোন কারণে সমস্যাগ্রস্থ জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

- কিরাউল আরদ অথবা দখলী জমির ভাড়া খারাজের মতই গণ্য হয়। সুতরাং তাও ফাই এর ন্যায় ব্যয় করা হবে।

- জিম্মি ও বিধর্মী রাষ্ট্রের অমুসলিম বণিকদের উপর আরোপিত শুল্ক, সরকারী ভাতা ও প্রশাসনিক ব্যয়ে ব্যয়িত হবে। যদিও হযরত ওমর (রাঃ) এতে সাবইকে অন্ত র্ভূক্ত করেছেন; কিন্তু কেউ কেউ মত ব্যক্ত করেছেন যে, দরিদ্র না হলে এতে কোন অংশ পাবেনা। কারণ বর্ণিত হয়েছে যে গনীমত ও ফাইর সম্পদে ধনীদের এবং উক্ত কাজে রত থাকা ব্যক্তির কোন অংশ নেই। আবার কারো কারো মতে সব মুসলমান সম্পদের অংশীদার। ইমাম আবু উবায়দ আল কাসিম ইবনে

Dhaka University Institutional Repository

সাল্লাম (রা) যিনি কিতাবুল আমওয়ালের মূল রচয়িতা তিনি বলেন, সবার অংশ না থাকা সম্পর্কিত হাদীস মানসুখ। আর এর মূল তাৎপর্য হল ইমাম বা মুসলিম রাষ্ট্র প্রধান ইসলামও মুসলিমদের স্বার্থের প্রতি সতত দৃষ্টি রেখে এ ব্যাপারে যেকোন নীতি গ্রহণ করতে পারেন। এখানে বেতনাদী, শিক্ষকদের ভাতা, ওয়ায়েজীন, ইমাম মোয়াজ্জিনদের মাসোহারা, সৈন্যদের বেতন, দূর্ঘনির্মাণ, সংস্কারসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা, সীমান্ত ও পরিসীমা রক্ষা ব্যয় অস্ত্র-সস্ত্র ক্রয় ইত্যাদিসহ জনহিতকর ও কল্যাণমুলক কাজের ব্যয় এর অন্তর্ভূক্ত।

আল্লামা শামী বলেন, জনকল্যাণমূলক কাজের মধ্যে হাট বাজার স্থাপন, ব্রীজ-পুল নির্মাণ, আলেম, জ্ঞানী-গুনী, বিচারকমণ্ডলী ও রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের ভরণ-পোষণ, যুদ্ধে আহত ও নিহত সৈনিক এবং তার পরিবার বর্গ, রোগী, পঙ্গু, লা-ওয়ারিস শিশুর খাদ্যদান, সীমান্ত ছাউনি নির্মাণ, মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণ ইত্যাদি সবই অন্তর্ভূক্ত। বেতন ভাতাদি সম্পর্কে হযরত ওমর (রাঃ) একটি সুন্দর ও সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন বেতন ভাতার হার হবে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর উপর নির্ভর করে। যেমন- ঐ ব্যক্তি ইসলামের জন্য কি পরিমাণ দুঃখ ভোগ করেছে, সে ইসলাম প্রচারে কতখানি অগ্রসর হয়েছে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কতখানি কষ্ট স্বীকার করেছে। তার ইসলামী জীবন যাপনের দিক দিয়ে প্রকৃত প্রয়োজন কতখানি এবং তার দায়িত্বে তার পরিবারের কতজন লোকের ভরন পোষণ রয়েছে। (আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ)

ইসলামী অর্থনীতি, কর্মচারীদের অন্তনির্হিত স্বাভাবিক যোগ্যতা, কর্মক্ষমতা, দায়িত্বের স্বরূপ ও পদমর্যাদার স্বাভাবিক পার্থক্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম শাখার ব্যয়ের খাত ঃ

এই শাখায় রয়েছে অতিরিক্ত সম্পদ অর্থ্যাৎ বেওয়ারিশ মাল অথবা লা-ওয়ারিশ মাল, যার কোন ওয়ারিশ নেই, বিধর্মী বিদ্রোহীর বাজেয়াপ্ত সম্পদ, বেওয়ারিশ লাশের ক্ষতিপূরণ, মুর্তাদ-ইসলাম ত্যাগী ব্যক্তির সম্পত্তি, যেসব সম্পত্তি পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া যায় এবং যার মালিক কোথাও খুজে পাওয়া যায় না, এধরণের সকল সম্পদই বায়তুল মালে জমা হবে।

ফকীহ্গণ এগুলো ব্যয়ের প্রধানতঃ দুটি খাতের নির্দেশ দিয়েছেন, প্রথমতঃ যেখানে সেখানে পড়ে থাকা ছিন্নমূল শিশুদের, লা-ওয়ারিশ শিশুদের লালন পালন ও ভরণ পোষণ এবং দ্বিতীয়তঃ অভিভাবকহীন দরীদ্রের ভরণ পোষন, বৃদ্ধ/বৃদ্ধা যারা কাজ করার ক্ষমতা হাড়িয়ে ফেলেছ এবং তাদের কোন সহায়-সম্পদও নেই এ ধরণের মানুষের ভরণ পোষণ ইত্যাদি কাজে ব্যয় করতে হবে। আল্লামা শা'মী এ দু'টি খাতের উল্লেখের পর বলেছেন এর উদ্দেশ্যে একটাই এর ব্যয়ের খাত হল দূর্বল ও অসহায় দরিদ্র ব্যক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

সমস্যা এবং সমাধান

যাকাতের মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বিপুল উন্নয়নের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। যেমন –

ক) যাকাত নামাজ রোযার মত ফরয। অথচ এর গুরুত্ব এত বেশী হওয়া সত্ত্বেও নামাজ রোযার প্রচার যেভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে হয়ে থাকে যাকাতের প্রচার তার চেয়ে কম।

খ) সাহেবে নিসাব ব্যক্তিদের নিকট থেকে যাকাত আদায়ের জন্য কোন প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা সরকারীভাবে কোন লোক নিয়োগ দেয়া হয়না।

গ) কর বা খাজনা আদায় করার জন্যে যেভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন জারী রয়েছে, অনুরূপভাবে যাকাত আদায়ের জন্য কোন আইন জারী নেই।

উপরোক্ত সমস্যাগুলোর সমাধান যেমন সহজসাধ্য নয় তেমনি অল্প সময়েও সমাধান করা সম্ভব নয়। তবে সমস্যা যেখানে সমাধান সেখানে এই সত্যের প্রতি খেয়াল রাখলে বাস্তবায়ন সম্ভব। যেমন-

ক) ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও দাবী সম্বন্ধে জনগণের ওয়াকিব হাল হওয়া, যাকাত আদায় ও বিলি বন্টন সম্পর্কে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া ও সরকারী নীতি নির্দেশনা এবং সুদৃঢ় প্রসারী কার্যকর পরিকল্পনা। তাহলে এনজিওদের কবল মুক্ত ও সুদের অভিশাপ মুক্ত হয়ে সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়া সম্ভব।

খ) সাহেবে নিসাবদের কোন পূর্ব পরিকল্পনা না থাকায় ব্যয়িত এই অর্থ হতে দীর্ঘ মেয়াদী কল্যাণ বা দারিদ্র দূরীকরণ কোনটাই হয়না। এজন্য প্রয়োজন এদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা এবং সুফল প্রত্যক্ষ করার সুযোগ দেয়া। এ প্রস্তাব ইতিমধ্যেই দেশের কোন কোন অঞ্চলে সাংগঠনিকভাবে এই উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে এবং তার উপকারও চাক্ষুষ করা যাচ্ছে।

গ) যাকাত আদায় ও তা বিলি বন্টনের জন্যে সরকার অথবা কোন সংস্থার বাড়তি অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন নেই। কেননা যাকাত আদায়কারীই আল কুরআনের নির্দেশ অনুসারে যাকাতের অর্থ পেতে পারে সেহেতু আদায়কৃত অর্থ হতেই আদায়কারীকে এর

Dhaka University Institutional Repository

একটা অংশ বেতন হিসেবে দেয়া যেতে পারে, কোন প্রতিষ্ঠান এ কাজে এগিয়ে এলে তাকে এ অর্থ দেয়া সম্ভব। এর ফলে বেশ কিছু লোকের কর্মসংস্থান হবে। উপরোন্ত দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত যাকাত সংগ্রহ ও অর্থ সামগ্রী বিতরণের কাজটি সহজ হবে।

ঘ) দেশের ওলামা মাশায়েখগণ ঐক্যবদ্ধ, সক্রিয়, বলিষ্ঠ এবং সঠিক পদ্ধতিতে যাকাত ও উশর আদায় এবং তার সর্বোচ্চ কল্যাণমুখী ব্যবহারের জন্যে জনগণকে আহবান জানাতে পারেন। একই সঙ্গে সরকারকেও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গঠনের জন্যে বলতে পারেন। অনুরূপভাবে দেশের বিভিন্ন দ্বীনি সংগঠন ও ইসলাম প্রিয় শিক্ষিত জনগণের সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ তৎপরতা গ্রহণের তৎপরতা গ্রহণের প্রয়োজন ও অস্বীকার্য।

ঙ) বাংলাদেশের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে ঐক্যজোটের সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছেন তারা ইসলামী মূল্যবোধ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। যদিও তাদের মেয়াদ প্রায় শেষের দিকে তারপর কোটি কোটি তৌহিদী জনতার আশা আকাঙ্খা পূরণে তারা তৎপর হবেন এই প্রত্যাশা দেশবাসীর। এই সরকার একটু উদ্যোগ নিলেই রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব।

তবে এ ব্যাপারে বাধা আসবে ইসলাম বিরোধীদের চাইতে তথা কথিত ইসলাম দরদীদের কাছ থেকে। এসব বাধা জয় করার দৃঢ় মানসিকতা থাকতে হবে। সুদান, পাকিস্তানসহ প্রভৃতি দেশের মুসলিম বুদ্ধিজীবীরাই রাষ্ট্রীয়ভাবে যাকাত আদায় ও তার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বৈরী মনভাব পোষণ করেছেন। কিন্তু জেনারেল জিয়াউল হকের মত নেতারা তাদের কাছে মাথা নত করেননি। তাই ইসলামী মূল্যবোধের অনুসারী জনগণ সঙ্গতভাবেই ধরে নিতে পারেন সরকার যথাযোগ্য ভূমিকা রাখবেন এবং মুমিন মুসলমানদের লালিত বাসনা পূরণে সামর্থ হবেন।

সরকারের যথোচিত উদ্যোগ, প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন, কার্যকর ভূমিকা এবং সুদৃঢ় প্রসারী পরিকল্পনা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত ১৪ কোটি তৌহিদী জনতার অধ্যুষিত এই দেশে যারা সাহেবে নিসাব তারা সকলেই যদি স্বেচ্ছা প্রনোদিত হয়ে নিয়মিত যাকাতের অর্থ পরিকল্পিতভাবে আল কুরআনে উল্লেখিত খাতগুলোতে ব্যয়ের জন্যে উদ্যোগী হন তাহলে গরীব জনগণের ভাগ্যের চাকা যেমনি ঘুরবে তেমনি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের পরিধি হবে আরও বিস্তৃত। দারিদ্রের স্থান হবে তখন যাদুঘরে। এজন্যে আজ প্রয়োজন সদিচ্ছার, সুষ্ঠু পরিকল্পনার এবং দরিদ্র জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য প্রকৃতই দৃঢ় অভিলাষের।

Dhaka University Institutional Repository

যাকাতের অর্থ যে পরিমাণই আদায় হোকনা কেন, তা যেসব সময় বাধ্যতামূলক ভাবে আটটি খাতের প্রত্যেকটিতে ব্যয় করতে হবে, ইসলামী অর্থনীতিতে এমন কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করে নাই, এমনকি প্রয়োজন হলে উহার বিশেষ একটি খাতেও যাকাতের যাবতীয় অর্থ ব্যয় করা যেতে পারে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, যাকাত বাবদ আদায়কৃত অর্থ আঞ্চলিকভাবে বন্টন করা আবশ্যক। স্থানীয় বায়তুলমালে অর্থ জমা করা এবং তারই মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে তা বন্টন করা বাঞ্চনীয়। কেননা নবী করীম (সঃ) একস্থানের আদায়কৃত যাকাত ও সাদাকাহ অন্যত্র নিয়ে যাওয়াকে সমর্থন করেননি। এসম্পর্কে হাদীস অত্যন্ত স্পষ্ট। তবে নিত্যন্ত সমস্যা দেখা দিলে তখনকার কথা স্বতন্ত্র, তবে উক্ত আটটি খাতের বাইরে অন্যকোন খাতে যাকাতের টাকা ব্যয় করা যায়েয নয়। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সঃ) বলেছেন – আল্লাহ তাআলা যাকাতের ব্যয় খাত নির্ধারণে কোন নবী রাসূল অথবা অপর কারো ফয়সালার অপেক্ষায় থাকতে রাজি হননি। বরং তিনি নিজেই এই খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং তিনি ইহার ব্যয় খাতকে আটটি ভাগে ভাগ করেছেন।

বর্তমান সময়ের পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অর্থ উপার্জনের অবাধ সুযোগ দেয়া হয়েছে। যেখানে যাকাতের কোন ব্যবস্থা নেই, বরং ইনকাম ট্যাক্স আদায় করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স আদায়ের ক্ষেত্রে যেমন ঘাপলা রয়েছে তেমনি এই ইনকাম ট্যাক্স দ্বারা গরীব জনগণের কোন কল্যাণই সাধিত হয়না। তা কেবল ধনীদের পকেটেই থাকে। কারণ রাষ্ট্র সরকার ধনীদের নিকট থেকে মোটা রকমের অর্থ ঋণ বাবদ গ্রহণ করে থাকে আর ইনকাম ট্যাক্স বাবদ লব্দ অর্থ সেই ঋণের সুদ আদায় করতেই ব্যয় হয়ে যায়। ফলে দেশে অর্থ সম্পদের আবর্তনের পরিবর্তে তার সমগ্রটাই মুষ্টিমেয় পুঁজিদারদেরই হাতে কুক্ষিগত হয়ে থাকে। বস্তুতঃ ইসলামী অর্থনীতি ছাড়া মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করার আর কোন পন্থাই নেই থাকতে পারেনা।

উশর হল যাকাতের ন্যায় একটি নির্ধারিত অংশ, যা জমির ফসলের উপর বাধ্যতামূলকভাবে ধার্য করা হয় এবং ফসল থেকেই তা গ্রহণ করা হয়। প্রকৃতিগতভাবে উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ এবং সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের বিশ ভাগের একভাগ উশর হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ইহার ব্যয়ের খাতও যাকাতের অনুরূপ, অর্থ্যাৎ যেসকল খাতে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা হবে ঐ সকল খাতেই উশর এর অর্থ ব্যয় করা হবে।

মুসলিম ব্যবসায়ীদের থেকে বাণিজ্যিক পণ্যের যে শুল্ক আদায় করা হয় তাও যাকাতের ব্যয়ের খাতের অনুরূপভাবে ব্যয় করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনে অবর্ণিত ব্যয়ের খাতসমূহ

বায়তুল মালের ব্যয়-খাত সম্পর্কিত খুটিনাটি ব্যাপারে মুজতাহিদগনের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা সত্বেও সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, ব্যয়ের যে সব খাত সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদিসের ভাষ্যে উল্লেখ্য রয়েছে সেগুলোতে কোন প্রকার পরিবর্তন হবে না। এছাড়া অপরাপর ক্ষেত্রে অর্থাৎ ইসলামী অর্থনীতি নিত্য নতুন উদ্ভাবিত প্রয়োজন অনুসারে রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় করার সীমাবদ্ধ অনুমতি ইসলামী হুকুমাতের রাষ্ট্র প্রধানের রয়েছে। রাষ্ট্র প্রধান মজলিসে শুরার সদস্যদের, উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের কার্যালয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যম প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বায়তুলমালের অর্থ ব্যয় করতে পারবে। যেমন কাজী আবু ইউসুফ (রাঃ) এর কিতাবুল খারাজ গ্রন্থে কাজ ও খিরাজ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত উমর (রাঃ) এর একটি সিদ্ধান্তের আলোকে এ বিষয়টির চমৎকার ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। হযরত উমর (রাঃ) এর উক্ত সিদ্ধান্তটি ছিল ইরাকের জমি মুসলমানদের জন্য ওয়াক্বফ করে সরকারী মালিকানাধীন রাখা সম্পর্কে।

এ ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) বলেছেন; হযরত উমর (রাঃ) এর সিদ্ধান্ত ছিল বিজিত এলাকার জমি মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে না। কারণ আল্লাহর কিতাব পঠিত কুরআনে এ সম্পর্কে কোন ভাষ্য নেই। মুলতঃ এটা ছিল তাঁর উত্তম সিদ্ধান্ত। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করেছেন। আর তাতেই সকল মুসলমানের কল্যাণ নিহীত ছিল; সেসব জমির রাজস্ব জমা করে সকল মুসলমানকে তা থেকে উপকৃত হবার ব্যবস্থা করা দলীয় ও সামাজিক দিক থেকেও অত্যন্ত উত্তম পদ্ধতি ছিল। কেননা এসব জমি যদি মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হতো, সাধারণ মুসলমানদের সাহায্য ও ভাতার জন্য রেখে দেয়া না হত, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা করা যেতনা এবং যুদ্ধের জন্যও শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব হতনা। তাতে করে জিহাদে ভাতা দেয়ার ব্যবস্থা না থাকলে মুসলমানদের রাষ্ট্র কাফিরদের আক্রমন থেকে কখনো নিরাপদ থাকতো না, বস্তুত আল্লাহ তাআলা সকল দিক থেকে সব চাইতে বেশী জানেন।[১]

১। ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা- মাওলানা হিফজুর রহমান ১০৯ পাতা

Dhaka University Institutional Repository

উপরের আলোচনা থেকে ধারণা পাওয়া যায় যে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের প্রয়োজনীয় খাতে অর্থ ব্যয় করার ইখতিয়ার আছে।

ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের যে সকল খাতে অর্থ বন্টন করার ইখতিয়ার আছে সেগুলো সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা গেল।

রাষ্ট্র প্রধানের বেতন ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের বেতন বায়তুলমাল হতে আদায় করা হবে। নবী করীম (সঃ) মুসলমানদের সামগ্রিক আয় হতে যে অংশ গ্রহণ করতেন, তা হতেই তাঁর এবং তাঁর পরিবার পরিজনের জীবিকা নির্বাহ হত।

নবী করীম (সঃ) এর পরে প্রথম খলীফাতুল মুসলিম হযরত আবু বকর (রাঃ)কেও ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুল মাল হতে বেতন দেয়া হত। হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হবার পূর্বে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) মুসলমানদের পক্ষ হতে বলেছিলেন; "আপনি ব্যবসার কার্যে লিপ্ত হলে মুসলামনদের সামগ্রিক ও রাষ্ট্রীয় কার্যে অনেকখানি ব্যহত হবে।" অতএব আপনি ইহা ত্যাগ করুন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) নিজের রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ও পরিবার বর্গের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্বের কথা চিন্তা করে বললেন, জনগণের সামগ্রিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালন করার সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য চলিয়ে যওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। একাজে পরিপূর্ণ নিলিপ্ততাও ঐকান্তিকতার সাথে আত্মনিয়োগ করা আবশ্যক। ওদিকে আমারও পরিবার বর্গের জৈবিক প্রয়োজনও রয়েছে।

অতঃপর মুসলমানদের মজলিসে শুরায় খলীফাকে বেতন দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তাঁর প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার উপযোগী পরিমাণ অর্থ ইসলামী হুকুমাতের বায়তুলমাল হতে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বেতনের হার ঃ রাষ্ট্র প্রধানকে কি পরিমাণ বেতন দেয়া হবে এ সম্পর্কে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর একটি নীতি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন –

তোমাদের সামগ্রিক ধন-সম্পদ ইয়াতিমদের ধন-সম্পদের সমতুল্য এবং আমি যেন ইয়াতিমদের মালেরই রক্ষণাবেক্ষণকারী। অতএব আমি যদি ধনী হই অভাবী না হই তবে আমি বায়তুল মান হতে কিছুই গ্রহণ করবো না। আর যদি দরিদ্র ও অভাবী হই তবে অপরিহার্য পরিমাণ কিংবা সাধারণ প্রচলিতমানের বেতনই আমি গ্রহণ করবো।[১]

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর এই বাণীটি ইয়াতিমের ধন-সম্পত্তির হিফাযতকারী সম্পর্কে আল্লাহর নিম্নলিখিত বাণীর ভিত্তিতে উক্ত হয়েছিল।

ইয়াতিমের ওলী অথবা অভিভাবক যদি ধনী হয় তবে ইয়তিমের মাল হতে তার বেতন গ্রহণ না করাই উচিহ আর সে গরীব হলে সাধারণ প্রচলিত পরিমাণ অনুযায়ী বেতন গ্রহণ করবে।[২]

মোট কথা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের বেতনের হার এই আয়াত অনুসারে তাই হবে যা তার প্রয়োজন ও সাম্প্রতিক দ্রব্য-মূল্য অনুসারে সাধারণ প্রচলিত পরিমাণ বলে বিবেচিত হবে।

হযরত আবু বকর (রাঃ) কে প্রথমে দৈনিক তিন দিরহাম দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ঐতিহাসিক ইবনে সায়াদের বর্ণনা অনুসারে প্রথম তাঁর জন্য বার্ষিক দুই হাজার দিরহাম দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন এর দ্বারা তাঁর প্রয়োজন পূরণ হবেনা বলে মত প্রকাশ করলেন তখন বাৎসরিক আরো পাঁচ শত দিরহাম বৃদ্ধি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাঁর বেতন বাবদ বায়তুল মাল হতে বার্ষিক পাঁচ হাজার দিরহাম গ্রহণ করতেন।

১। কিতাবুল খারাজ, আবু ইউসুফ, পাতা নং- ১১৭
২। সূরা নেছা, আয়াত নং- ৬

Dhaka University Institutional Repository

হযরত উসমান (রাঃ) খলীফা নিযুক্ত হয়েও বায়তুলমাল থেকে কিছুই গ্রহণ করতেন না, কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিপুল ধন সম্পদ দান করেছিলেন। এই জন্য তিনি বায়তুল মাল হতে কিছু গ্রহণ না করে বরং নিজের ধন সম্পদ দ্বারা বায়তুল মালকে অধিকতর সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন।

উপরোক্ত আলোচনার শেষে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারি যে, নিম্নতম প্রয়োজন নিশ্চিতরূপে পূর্ণ হবার পরিমাণ অনুযায়ী বেতন দেয়াই হল ইসলামী অর্থনীতিতে রাষ্ট্র প্রধানকে বেতন দেয়ার স্থায়ীমান।

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান বায়তুলমালের অর্থ যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতে পারবেনা। জনগণের মজুরী ব্যতিত নিজের জন্য কোন জিনিস গ্রহণকরা সম্পূর্ণ নীতি বিরোধী কাজ। যদিও রাষ্ট্র প্রধান অনেক ক্ষমতার অধিকারী, ইচ্ছা করলে তিনি বায়তুলমাল থেকে ইচ্ছে মত অর্থ গ্রহণ করতে পারেন কিন্তু সেই অর্থ সম্পদের মালিক তিনি নন, একথা সর্বদাই স্মরণ রাখা দরকার যে তিনি একজন রক্ষক মাত্র।

সরকারী কর্মচারীদের বেতন প্রদান ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের ন্যায় অন্যান্য সরকারী কর্মচারীর বেতনও রাষ্ট্রীয় কোষাগার তথা বায়তুলমাল হতেই আদায় করা হবে। কারণ এরা সকলেই মুসলিম জনগণের সামগ্রিক ও সামাজিক রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম আঞ্জাম দেয়ার নিরন্তর আত্মনিয়োগ করে থাকে; কাজেই জনগণের সামষ্টিক ধন ভাণ্ডার বায়তুলমাল হতেই তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করে দিতে হবে ইহাই স্বাভাবিক। আমাদের প্রিয় নবী (সঃ) নিজে সরকারী কর্মচারীদের বেতন দিয়েছেন, এবং খোলাফায়ে রাশেদুনের জামানায় এর ধারাবহিকতা বজায় ছিল।

মুলতঃ রাষ্ট্র সরকারই হচ্ছে মানবীয় শক্তি ও শ্রম শক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ খরিদ্দার। কাজেই সাধারণভাবে দেশের শ্রম ও চাকুরীর বেতন নির্ধারণের উপর সরকার নির্ধারিত বেতনের হার ও বেতন নির্ধারণের মূলনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাব তীব্রভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। রাষ্ট্র সরকার যদি বেতনের সুবিচারপূর্ণ হার নির্ধারণ করে তবে সমগ্র দেশেই সেই মান অনুযায়ী মজুর শ্রমিক ও চাকরীজীবীদের বেতন নির্ধারিত হতে থাকবে। এজন্য ইসলামী অর্থনীতি সাধারণভাবে সকল প্রকার মজুর শ্রমিকদের বিশেষ করে সরকারী

Dhaka University Institutional Repository

কর্মচারীদের বেতনের হার নির্ধারণের মূলনীতি উপস্থাপন করেছে। পুজিবাদী অর্থনীতিতে চাকুরীজীবিদের বেতন নির্ধারণে অনেক ত্রুটি বিদ্যমান। যেমনঃ

ক) পুজিবাদী রাষ্ট্রের চাকুরীজীবি কর্মচারীদের কমপক্ষে যে বেতন দেয়া হয়, তা দ্বারা একটি পরিবারের ভরণ-পোষণ সম্পন্ন হওয়াতো দূরের কথা এক ব্যক্তির জীবন যাপনের জন্যেও তা যথেষ্ট নয়।

খ) বেতনের হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে একজন চাকুরীজীবির সংসারিক খরচ এবং পোষ্যদের সম্পর্কে বিন্দুমাত্র চিন্তা করা হয়না।

গ) বেতন নির্ধারণের ব্যাপারে অবিবেচকের মত আকাশছোয়া পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়।

এরূপ অবিচার মূলক বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনিবার্যরূপে অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করে। একদিকে যেমন কম বেতনের প্রাপকদের মনে অধিক প্রাপকদের প্রতি চরম প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ জাগ্রত হয়। অন্যদিকে অধিকপ্রাপকদের মনে অহংকার, গৌরব শ্রেষ্ঠত্ববোধ এবং নিরংকুশ বিলাসিতা, অপচয়, স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি ধরণের মনোভাব দেখা দেয়। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি এ ধরণের অবিচারমূলক নীতির তীব্র প্রতিবাদ করে এবং পরস্পরের মধ্যে বৈষম্য ও পার্থক্য সৃষ্টির পদ্ধতির মোটেই বরদাশত করতে পারেনা।

ইসলামী অর্থনীতি অনুযায়ী সরকারী কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণের ব্যাপারে কর্মচারীর যোগ্যতা ও কাজের স্বরূপ এবং প্রয়োজন ও ভরণ–পোষণের দায়িত্ব সম্পর্কে বিশেষ বিবেচনা করা হয়। নবী করীম (সঃ) এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত রূপ নীতি ঘোষণা করেছেন –

যে লোক আমাদের সরকারী কর্মচারী হবে, সে যদি বিবাহ না করে থাকে তবে সে বিবাহ করে নিবে। তার কোন গৃহ চাকর না থাকলে সে তা রেখে নিবে। তার ঘর না থাকলে সে একখানা ঘর প্রস্তুত করবে। এর অধিক যে গ্রহণ করবে সে হয় বিশ্বাস ঘাতক, না হয় চোর।[১]

১। আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ

Dhaka University Institutional Repository

নবী করীম (সঃ) এর হাদীস ছোট-বড় সকল প্রকার সরকারী কর্মচারীদের বেতন সম্পর্কে একটি স্থায়ীমান নির্ধারণ করে। ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মচারী হওয়ার দিক দিয়ে উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থের মধ্যে কোন রূপ তারতম্য নেই। সকল কর্মচারীই সমান দায়িত্বশীল। অতএব সরকার সকলেরই বুনিয়াদী প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। খুলাফায়ে রাশেদুনের যুগেও বেতনের হার উক্ত হাদীস অনুসারেই নির্ধারিত হয়েছিল।

এ সম্পর্কে হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর নিম্নলিখিত বক্তৃতাংশ হতে চূড়ান্ত মূলনীতি লাভ করা যায়।

ক) এক ব্যক্তি ইসলামের জন্য কি পরিমাণ দুঃখ ভোগ করেছে।

খ) এক ব্যক্তি ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে কতখানি অগ্রসর হয়েছে।

গ) এক ব্যক্তি ইসলাম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কতখানি কষ্ট স্বীকার করেছে।

ঘ) এক ব্যক্তির জীবন যাপনের দিক দিয়ে প্রকৃত প্রয়োজন কতখানি।

ঙ) এবং এক ব্যক্তির উপর তার পরিবারের কতজন লোকের ভরণ–পোষণের দায়িত্ব রয়েছে।[১]

একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায় যে, বেতন নির্ধারণের জন্য ইতা অপেক্ষা সুবিচার পূর্ণ ন্যায় নীতি আর কিছুই হতে পারেনা। ইসলামী অর্থনীতিতে বেতন নির্ধারণ সম্পর্কে গৃহীত এই নীতিকে বলা হয় – "ভরণ–পোষণের দায়িত্ব পালন উপযোগী বেতন দেয়ার নীতি। খুলাফায়ে রাশেদুনের যুগে এ নীতিই কার্যকর ছিল। ফলে একটি পরিবারে যখন একটি সন্তানের জন্ম হত, তখনই বায়তুলমাল হতে তার জন্য বৃত্তি দান শুরু করা হত।

ইসলামী অর্থনীতি নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের অধিকার হরণ করে তাদের অনিবার্য প্রয়োজন অপূর্ণ রেখে বড় বড় অফিসারদের বিলাস বাসনের ব্যবস্থা করার অনুমতি কখনই দিতে পারেনা।

১। আবু দাউদ, কিতাবুল খারাজ

Dhaka University Institutional Repository

লা-ওয়ারিস শিশু সন্তান প্রতিপালনঃ লা-ওয়ারিশ শিশু-সন্তানের প্রতিপালন করাও ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্য। যে সন্তান নিজে উপার্জনে সক্ষম নয়, যার নিজের কোন অর্থ-সম্পদ নেই, কিংবা যার কোন গার্জিয়ান অথবা কোন নিকটাত্মীয়ও এমন নেই যে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে; ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারকেই এ ধরণের সন্ত ানদের জীবিকার ব্যবস্থা করার জন্য দায়িত্ব নিতে হবে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র এ ধরণের সন্তানদের নিষ্কর্মা বসিয়ে খেতে দিবেনা, তাদের জন্য শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করে দিবে এবং স্বাধীনভাবে ব্যবস্থা করে দিবে এবং স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জনের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য বিশেষ শিল্পকার্যে ট্রেনিং দিবে। অমুসলিমদের লা-ওয়ারিস সন্তানদের সম্পর্কেও এই নীতি প্রযোজ্য হবে।

কয়েদী ও অপরাধীদের ভরণ-পোষণঃ যেসব অপরাধীকে কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়, যেসব অপরাধীর পৌনঃপূনিক অপরাধের দরুন জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে পরে বলে তাদেরকে দীর্ঘদিন বন্দী করে রখার সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তাদের ভরণ-পোষণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সুতরাং উহার ব্যয়ভার বায়তুলমাল হতে আদায় করতে হবে। যেসব লা-ওয়রিস কয়েদী মৃত্যু মুখে পতিত হয় তাদের দাফন কাফনের ব্যবস্থ করাও ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

ক্ষতিপূরণ প্রদানঃ যখন ইসলামী রাষ্ট্রের কোন সামাজিক কাজের জন্য কিংবা, যুদ্ধের ঘাটি নির্মাণ, সৈনিকদের চলাচল, রাস্তা ঘাট নির্মাণ, রাষ্ট্রীয় কার্যে ব্যবহারের জন্য জনগণের জমি প্রয়োজন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, অথবা বৈদেশিক আক্রমনের ফলে নাগরিকের বিশেষ কোনক্ষতি সাধন ইত্যাদি ধরণের কাজের জন্য জনগণকে ক্ষতি পূরণ প্রদান করা ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের কর্তব্য। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর নিকট একজন কৃষক এসে অভিযোগ করলো যে, সিরিয়ার একদল সৈন্যের পথ অতিক্রম করার সময় তার শস্যক্ষেত নষ্ট করে গেছে, একথা শুনে তিনি বায়তুলমাল হতে তার ক্ষতিপূরণ বাবদ দশ হাজার দিরহাম দান করেন।

সুতরাং সরকারী যখন কোন কাজ করতে গিয়ে, অনেক জনসমষ্টির কল্যাণে কোন কাজ করতে অন্য কোন মানুষের আর্থিক ক্ষতি হয়ে যায় তখন ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার উক্ত ক্ষতি পূরণ করে দিবে।

Dhaka University Institutional Repository

জন কল্যাণমূলক কাজঃ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বায়তুল মালের উপর বিভিন্ন প্রকার খরচের সম্মুখিন হতে হয়, যা পূরণ করা অবশ্য কর্তব্যের অন্তর্ভূক্ত। এসকল দায়িত্ব পালনের পরও যদি বায়তুলমালের ধন-সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকে তাও জনগণেরই কল্যাণের ব্যয় করতে হবে। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তাই করেছিলেন। তিনি উদ্বৃত্ত অর্থ-সম্পদ হতে শুধু শহরবাসীদের জন্যই নয়, গ্রামবাসীদের জনও কে, কি, কিভাবে পেতে পারে তা রীতিমত পরীক্ষা করে সেই পরিমাণ খাদ্য বরাদ্ধ দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে বায়তুলমালের অর্থ সম্পদ যখন আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন তিনি দেশবাসীর জন্য পোষকেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি তাদের জন্য সুদৃঢ় ও উন্মুক্ত বায়ুময় ঘর-বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন। কুফা, বসরা, ফুসতাত প্রভৃতি এলাকায় শহর স্থাপন করেছিলেন। তাদের জন্য প্রশস্ত রাস্তাঘাট, দোকান ও চক ইত্যাদির নির্মাণ করেছিলেন। এমনকি প্রত্যেক মহল্লার লোকদের উট বাধার জন্য আলাদা স্থানও তৈরী করেছিলেন। নতুন নতুন খাল কেটে এবং ঝর্ণাধারা বানিয়ে শহরে ও গ্রামে জল সেঁচের নিখুত ব্যবস্থা করেছিলেন। ফলে ইসলামী রাজ্যের প্রত্যেকটি বাসিন্দাই আহারের জন্য খাদ্য, পরিধানের জন্য পোষাক এবং থাকার জন্য বাড়ীঘর লাভ করেছিলেন। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের সময় অন্ধ এবং গরীব নাগরিকদের পথ চলার কাজে সাহায্য করার জন্য এবং পঙ্গু ও অক্ষম লোকদের সেবার জন্য সরকারী খরচায় লোক নিযুক্ত করা হয়েছিল। বিবাহের সঙ্গতিহীন যুবক-যুবতীদের বিবাহের ব্যবস্থা ও তৎসংক্রান্ত খরচ পত্রও সরকারের তরফ হতে বহন করা হয়েছিল। মোট কথা ইসলামী অর্থনীতি প্রবর্তিত ন্যায়-নিষ্ঠা ও সামাজিক নিরাপত্তার ফলে ইসলামী রাষ্ট্রের কোথাও দারিদ্র বা অনশন ইত্যাদির নাম নিশানা ছিলনা। মূলতঃ ইসলামী অর্থনীতির ইহাই বৈশিষ্ট্য।

হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের উপরোক্ত কার্যাবলী পরবর্তী সকল সময়ের রাষ্ট্র প্রধানদের জন্য মডেল এবং পথ নির্দেশনা। বর্তমান সময়েও আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরণের সমস্যা বিরাজমান। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ বিতরণ, গ্যাস, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, পয়নিষ্কাশন, ব্রিজ, কালভাট নির্মাণ, খাল খনন, নদী ড্রেজিং, ফেরী পারাপার, বসতবারড়ী, রাস্তা নির্মাণ, বেকার সমস্যার সমাধান ইত্যাদি ধরণের জনহিতকর কার্যাবলীতে রাষ্ট্রীয় কোষাগার তথা বায়তুল মাল হতেই অর্থ ব্যয় করতে হবে। মূলতঃ ইসলামী অর্থনীতির এটাই বৈশিষ্ট্য। আর এই বৈশিষ্ট্য দেশ-কাল নির্বিশেষে সকল সময় এবং সকল দেশেরই লাভ করা যেতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

অমুসলিমদের আর্থিক নিরাপত্তাঃ ইসলামী রাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তা কেবল মুসলিম নাগরিকদেরই প্রদান করা হয় নাই, বরং ধর্মমত নির্বিশেষে সকল দেশবাসীই এই নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে। ইসলামের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে যেসব স্থানে মিসকিন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় ধন-সম্পদে তাদের অধিকারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যে সকল ক্ষেত্রেই ধর্মমত নির্বিশেষে সকল নিঃস্ব দরিদ্র নাগরিককেই বুঝানো হয়েছে।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর সময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষ হতে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) "হীরা" বাসীদের সাথে যে সন্ধির চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেছিলেন তাতে তিনি স্পষ্টভাবে লিখেছিলেন –

এবং আমি তাদেরকে এই অধিকার দান করলাম যে তাদের কোন বৃদ্ধ যদি উপার্জন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে কিংবা কারো উপর কোন আকস্মিক বিপদ এসে পড়ে অথবা কোন ধনী ব্যক্তি যদি সহসা এতদূর দরিদ্র হয়ে পড়ে যে, তার সমাজের লোকেরা তাকে ভিক্ষা দিতে শুরু করে তখন তার উপর ধার্য জিজিয়া কর প্রত্যাহার করা হবে। সে সঙ্গে তার ও তার সন্তানদের ভরণ-পোষণ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল হতেই প্রদান করা হবে। যতদিন সে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে থাকবে।[১]

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) দামেশ্‌ক যাত্রাকালে কুষ্ঠরোগ গ্রস্থ এক খ্রীষ্টান জনগোষ্ঠীর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন, তাদের এ অবস্থা দেখে তিনি তাদেরকে সাদাকার ফান্ড হতে অর্থদান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২]

১। আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, ১৪৪ পৃঃ
২। বালাজুরি লিখিত ফতুহুল বুলদান

Dhaka University Institutional Repository

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এক বৃদ্ধ ইয়াহুদীকে ভিক্ষা করতে দেখে তকে ভিক্ষা করার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল আমাকে জিজিয়া প্রদান করার নির্দেশ দেয় হয়েছে, কিন্তু তা আদায় করার কোন সামর্থ আমার নেই, হযরত ওমর (রাঃ) তার একথা শুনে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন, বায়তুলমালের খাজাঞ্চীকে ডেকে আদেশ করলেন, ইহার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর, তার জন্য বৃত্তি নির্দিষ্ট করে দাও এবং তার থেকে জিজিয়া আদায় করা বন্ধ করে দাও। অতঃপর বললেন "আল্লাহর শপথ তার যৌবন শক্তিকে আমরা কাজে ব্যবহার করবো, আর বার্ধক্যের অক্ষম অবস্থায় তাকে অসহায় করে ছেড়ে দিব, তা কোন মতেই ইনছাফ হতে পারেনা।[১]

হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) এর উক্ত কথার শেষাংশ বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। রাষ্ট্র সরকার ধনশীলদের নিকট হতে কর, রাজস্ব ও চাঁদা ইত্যাদি আদায় করবে, যুব শক্তিকে জাতীয়কাজে নিযুক্ত করবে, ইহা দেশবাসীর উপর স্বাভাবিক অধিকার, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একজন নাগরিক যখন দরিদ্র হয়ে পরে ক্রমেই বৃদ্ধ হয়ে উপার্জন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তখন তার যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্র সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে, ইহা রাষ্ট্রের উপর নাগরিকদের স্বাভাবিক ও ন্যায় সঙ্গত অধিকার, ইহাও যথাযথভাবে পূর্ণ করা অপরিহার্য, ইসলামী অর্থনীতির এই বৈশিষ্ট্য অতুলনীয় ও উদাহরণ যোগ্য, দুনিয়ার পুঁজিবাদী ও অন্যান্য অর্থনীতিতে শুধু সরকারী কর্মচারীদের জন্য বেতনের একটা সামান্য অংশ পেনশন বাবদ দেয়ার ব্যবস্থা হয় বটে কিন্তু তাতে তার মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয় কিনা, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র করা হয়না, তার দায়িত্বও গ্রহণ করা হয়না, একথা বিশেষভাবে স্মরনীয়।

১। আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ১৮৮

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামের প্রাথমিক যুগের ব্যয়ের খাত

নবী করীম (সঃ) এর জীবদ্দশাতেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল; আর তার সাথে সাথেই ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার সূচনা হয়। সাথে সাথে স্থাপিত হয় বায়তুলমাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগার। বিভিন্ন উৎস থেকে যাবতীয় আয় বায়তুলমালে জমা হত। আবার প্রয়োজন অনুসারে বায়তুল মালের অর্থ ব্যয় করা হত। নবী করীম (সঃ) এর জামানায় যে সকলখাতে ব্যয় করা হত তার মধ্যে প্রধান প্রধান খাতগুলো নিম্নরূপঃ-

১) জিহাদের জন্য অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া ও প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসপত্র ক্রয় করতে তখন অনেক অর্থের দরকার হত। কেননা ইসলাম বিরোধী শত্রু পক্ষ ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য সবসময়ই লেগে থাকতো। তাদেরকে দমন করার জন্য যে জিহাদ পরিচালনা করার দরকার হত তাতে ঘোড়া, নানাবিধ অস্ত্র, খাদ্য সামগ্রী এবং আরো অনেক জিনিসের দরকার হত। এসব যুদ্ধ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য অনেক অর্থের দরকার হত তা রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে ব্যয় করা হত।

২) মুসলিম দাসদের মুক্তির জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হত তাও রাষ্ট্রীয় কোষাগার তথা বায়তুল মাল হতে বহন করা হত।

৩) যেসকল লোক তাদের পূর্ব ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতো, এসকল নওমুসলিমদের পূণঃবাসনের জন্যও রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে অর্থ বহণ করা হত।

৪) অমুসলিমদের মন ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য সরকারী কোষাগার থেকে অর্থ ব্যয় করা হত।

৫) যে সকল দরিদ্র ব্যক্তিরা ঋণ রেখে মৃত্যু বরণ করেছে তাদের ঋণ পরিশোধ করা হত রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে।

৬) সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থবহন করা হত রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে।

৭) বর্তমান সময়ে সরকারী চাকুরিজীবিদের যে অবসর ভাতা পেনসনের ব্যবস্থা দেখা যায় তার সূচনা হয় মূলতঃ রাসূলে করীম (সঃ) এর জামানা হতেই।

পরবর্তী সময়ে খোলাফায়ে রাশেদার শাসনামলে এ সকল কাজ সমাধার পাশাপাশি আরো নানাবিধ উন্নয়ন ধর্মী ও কল্যাণমূখী কাজ-কর্ম করার জন্য রাষ্ট্রীয় কোষাগার হতে অর্থ ব্যয় করা হত।

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারী ব্যয়ের খাত

আধুনিক ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারী ব্যয়ের খাত সমুহকে ইসলামী অর্থনীতিবিদগণ বিভিন্নভাবে চিহ্নিত করেছেন, এদের মধ্যে অর্থনীতিবিদ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকি (১৯৯২) এর বর্ণনা অনুযায়ী তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথাঃ

ক) স্থায়ী ব্যয়ের খাত।

খ) বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যয়ের খাত।

গ) জনগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যয়ের খাত।

নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা গেলঃ

স্থায়ী ব্যয়ের খাতঃ এ শ্রেণীর ব্যয়কে স্থায়ী ব্যয় এজন্য বলা হয় যে, এগুলো সরাসরি আল কুরআন ও হাদীস হতে উৎসারিত এবং মুসলমানরা এগুলো মানতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে কোন মত পার্থক্যের সুযোগ নেই।

প্রতিরক্ষা ঃ মার্তভূমিকে বিদেশী আগ্রাসন হতে রক্ষা করা ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বাগ্র গন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে "আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্যে যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে যেন ভীতিকর প্রভাব পড়ে আল্লাহর দুশমনের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদের ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জাননা; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন।"[১]

সুতরাং রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্যে আল কুরআনের এ নির্দেশ খুবই স্পষ্ট এবং দরকারী আবশ্যিক স্থায়ী ব্যয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে পরিগনিত।

১। সূরা আনফাল, আয়াত নং-৬০

Dhaka University Institutional Repository

আইন শৃঙ্খলা ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগ হতেই অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। বাস্তব কারণেই এই= খাতে ব্যয় যেকোন রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। ফকীহ ইবনে তাহির বাগদাদী এক্ষেত্রে খুব সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়েছেন। "শরীয়াতে বহুবিধান রয়েছে যেগুলো শাসক অথবা তার প্রতিনিধি ছাড়া বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। উদাহরণতঃ স্বাধীন নাগরিকের ক্ষেত্রে হুদুদ ফৌজদারী আইনের বিধান প্রয়োগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।"

বিচার ঃ আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন। "আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণতা, সদাচারন এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অ-সঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন- যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।"[১]

আল কুরআনের এই নির্দেশ মান্য করা ইসলামী সরকারের অবশ্য কর্তব্য। তাই এখাতে সরকারী তহবিলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয়িত হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রয়োজন পূরণ ঃ মহানবী (সঃ) বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠার পর বলেছিলেন "যদি কেউ সম্পত্তি রেখে মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার উত্তরাধিকারীরাই তা পাবে এবং কেউ যদি তার বিধবা ও ইয়াতিম সন্তানদের খালি হাতে রেখে যায় তাহলে আমিই তাদের উত্তরাধিকারী।" বস্তুত; ইসলামী নীতি অনুসারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পুরণ। এসবের মধ্যে রয়েছে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। এসবের অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের জন্যে যে ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা দরকার সেজন্যে আধুনিককালে সরকারী তহবিলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করতে হবে।

১। সূরা আন নহল, আয়াত নং-৯০

Dhaka University Institutional Repository

দাওয়াহ কর্মসূচী ঃ অন্যান্য খাতের মত এ খাতেও ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আল কুরআনের একাধিক স্থানে উল্লেখ রয়েছে। এজন্যে একটা উদাহরণই যথেষ্ট। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, "আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিৎ যারা আহবান জানাবে সৎকর্মের প্রতি নির্দেশ দিবে ভাল কাজের এবং নিষেধ করবে অন্যায় কাজ থেকে, আর তারাই হবে সফলকাম"(১)

তাই ইসলামী রাষ্ট্রে দাওয়া কর্মসূচী অর্থ্যাৎ নিজ দেশবাসীসহ বিশ্বমানবের কাছে আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছে দেয়া রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে গণ্য হবে।

পৌর প্রশাসন ঃ সংজ্ঞা অনুযায়ী সরকারকে এইখাতে ব্যয় করতেই হবে। উপরে বর্ণিত খাতসমূহের প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহের পাশাপাশি দেশে সার্বিক প্রশাসনযন্ত্র অব্যাহতভাবে চালু রাখতে হলে সরকারকে নিয়মিত সঙ্গত পরিমান অর্থ ব্যয় করতে হবে।

ফরযে কিফায়া বা সামাজিক দায়িত্ব ঃ সরকারী ব্যয়ের অন্যতম খাত হল ফরযে কিফায়াতে ব্যয় করা। এ দায়িত্ব সকল নাগরিকের উপর বাধ্যতামূলক না হলেও সমাজের কিছু সংখ্যক নাগরিকের পালন করার নির্দেশ রয়েছে। শর্ত হল কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। নছেৎ সমাজের সকল লোকই আল্লাহর কাছে নিন্দনীয় হবে। কোন মৃত ব্যক্তির জানাজা ও দাফন করা এ জাতীয় কাজের অন্তর্ভূক্ত। ইসলামের অর্থনীতি ক্ষেত্রে এ কাজ হল নানারকম প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের সময়ে যেমন ঃ- বন্যা, খরা, ভূমিকম্প, জলোচ্ছাস, অগ্নিকান্ড, ডাবানল, সুনামি ইত্যাদি ধরণের দুর্বিপারেক সময়ে দুর্গত জনগণকে সহায়তা দান করা। ফকীহরা এ ব্যাপারে এতদূর পর্যন্ত গিয়েছেন যে তাঁরা মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে যা কিছু প্রয়োজন তা সবই এ দায়িত্ব-কর্তব্যের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য করেছেন।

১। সূরা আল-ইমরান, আয়াত নং- ১০৪

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যয়ের খাত

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার আলোকে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে সরকারকে যেসব খাতে ব্যয় করতে হবে সেগুলো মূলতঃ শরীয়াহ থেকেই পাওয়া যায়। নীচে সেগুলোর উল্লেখ করা গেলঃ .

পরিবেশ সংরক্ষণঃ অতীত কালের যে কোন সময়ের চেয়ে পরিবেশ রক্ষণের অপরিহার্যতা এখন অনেক বেশী। এটা এমন এক গণ দাবী যার উপকার প্রত্যেক নাগরিকই ভোগ করবে। কিন্তু এ জন্যে কারো কোন ক্ষতি হবেনা। পরিবেশ সংরক্ষণ, বাতাস বিশুদ্ধ রাখা, পানি দূষণ রোধ করা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রভৃতির জন্যে সে বিপুল অর্থব্যয় প্রয়োজন তা কোন ব্যক্তি বিশেষের একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই খুব স্বাভাবিক যে আধুনিক রাষ্ট্র সরকারী তহবিল হতেই একটা অংশ এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যেই ব্যয় করবে।

বৈজ্ঞানিক গবেষণাঃ আধুনিক কালে খুব জোড়ে শোরে প্রায়ই বলা হয় যে মুসলিম দেশগুলো উন্নত অমুসলিম দেশগুলোর উপর ক্রমগত অধীক পরিমাণে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। কারণ মুসলিম দেশগুলো বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর কোন গুরুত্ব দেয়নি। অথচ বৈজ্ঞানিক গবেষণা অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যেই অপরিহার্য যা উমাইয়া ও আব্বাসিয় খিলাফতকালে মুসলামনদের দ্বারাই চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। তাই বর্তমান সময়েও মুসলিম দেশগুলোকে স্বনির্ভর হতে হলে, নিজস্ব তাহজীব ও তমুদ্দুনের অনুযায়ী উন্নয়ন অর্জন করতে চাইলে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে সরকারকে এই খাতে বিপুল অর্থ যোগান দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

মূলধন গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নঃ এই খাতের ব্যয় সম্পর্কে আল-কুরআন এবং সুন্নাহতে কোথাও কিছু সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। তথাপি ইবনে তাইমিয়া, আল-কুরতুবী আল-আমিদীর মত প্রখ্যাত মুজতাহিদদের মতে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত। এক্ষেত্রে সার্বজনীন স্বীকৃত নীতি হলো "কোন দায়িত্ব পালনের জন্যে যা প্রয়োজন তা নিজেই একটা দায়িত্ব।" যদি সরকারকে জনগণের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করতে হয় এবং জীবন-যাপনের মানের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে হয় তাহলে মূলধন সংগঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। রাষ্ট্র যদি এ সদিচ্ছা পোষণ করে যে, তার জনগণ যাকাত গ্রহণ করার পরবর্তিতে যাকাত প্রদান করবে তাহলে রাষ্ট্রকে মূলধন গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্যে সর্বাত্মক প্রয়াস চালাতে হবে।

ভর্তুকী ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে মানুষকে তাদের নিজেদের প্রয়োজন পূরণ ছাড়াও সমাজের অন্যান্যদের প্রয়োজন পূরণে এগিয়ে আসতে হবে। এজন্যে জোর তাগিদ রয়েছে। সমাজে দওয়াহ কর্মসূচী, বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যক্রম এবং কল্যাণমূখী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এর অনেকটাই পূরণ হতে পারে। এজন্য বিপুল অর্থ ব্যয় প্রয়োজন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এর প্রত্যক্ষ উপকার দৃষ্টি গোচর হয়না। তাই এ ব্যাপারে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে এবং যারা এধরণের কাজে লিপ্ত রয়েছে তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য সহযোগিতা দিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই তা ভর্তুকী আকারেই হতে হবে। আধুনিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো একাজে সব সময়ই উদ্যোগী ও যত্নবান, সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের একাজে পিছিয়ে থাকার সুযোগ নেই।

স্থিতিশীলতা অর্জনের নীতি ঃ সমাজে আদল ও ইহসানের নিশ্চয়তা বিধানের স্বার্থে মূল্যস্তরে ব্যাপক উঠা নামা, অর্থনৈতিক কার্যক্রম হ্রাস-বৃদ্ধি, ব্যবসায়ী চক্রের দুর্নীতি প্রভৃতি দূর করতে হবে। এজন্য ইসলামী সরকারকে যথাযথ উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনীয় ব্যয়ও করতে হবে এই উদ্দেশ্যে সাধারণের জন্য।

Dhaka University Institutional Repository

জনগণ কর্তৃক ন্যস্ত দায়িত্বের জন্যে ব্যয়ের খাত

ইসলাম গণতন্ত্রকে সমর্থন করে। আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন "যারা পারস্পরিক, পরামর্শক্রমে কাজ করে"।[১] তাই যে সমস্ত কার্যক্রম উপরোক্ত দুটি বর্ণনায় (১) ও (২) নেই কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের পার্লামেন্টের কাছে জনগণ দাবী জানায়, সরকারকে তা পূরণ করতে হবে। এটা সরকারী ব্যয়ের অন্যতম খাত হিসেবে গণ্য হবে। এই মতের স্বপক্ষে নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী (১৯৯১) ইমাম আবু ইউসুফের কিতাবুল খারাজ হতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যেখানে তিনি তদানিন্তন শাসককে কতিপয় জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদনের পরামর্শ দিয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে পুরাতন খাল সংস্কার এবং ভূমি পুনরুদ্ধার। ঐ সময়কার জনগণ এ ধরণের কাজ হোক তা চেয়েছিলেন। অবশ্য এক্ষেত্রে এসব কাজ থেকে ঐ এলাকার জনগণ যে উপকার পাবে ইচ্ছা করলে সরকার সে জন্যে কর, টোল আকারে অর্থ দাবী করতে পারে।

১। আশ-শুরা, আয়াত নং- ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে আয় ও অর্থ বন্টনে অন্তরায় এবং সমাধাণ

আমাদের এই বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সমস্যা ধীরে ধীরে বিপর্যায়ের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। ৮৬% লোকই মুসলমান এবং তারা আর হোক মুখে ইসলামী জীবন দর্শনেই বিশ্বাসী। অথচ ইসলামী হুকুমত কায়েম করা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের অনেকেরই ঘোর বিরোধীতা। মূলতঃ এই প্রকৃতির মানুষের মাধ্যমেই প্রশাসন থেকে শুরু করে সকল স্তরেই দুর্ণীতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ ধরণের দুর্নীতি থেকে উত্তরণের উপায় নিশ্চয়ই আছে। নিম্নে আমাদের দেশের আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে অন্তরায় ও সমাধান তুলে ধরা হল ঃ-

১) মিরাসী সম্পদ বন্টনে সাম্য স্থাপনের ক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজনের মধ্যে প্রায়ই অনিয়ম দেখা যায়।

→এক্ষেত্রে প্রয়োজন দেশে বিদ্যমান দেওয়ানী আইনের মীরাসী অংশের পূর্ণ ও দ্রুত বাস্তবায়ন।

২) সম্পদ আয় ও বন্টনের ক্ষেত্রে সুদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে সমাজে যে দেশে যে অর্থনীতিতে একবার সুদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে সে অর্থনীতি পঙ্গু হয়ে গেছে। সে সমাজ ধ্বংস হয়ে গেছে। সে দেশ বৈদেশিক ঋণে জর্জরিত। ধনী-গরীবের মধ্যে পার্থক্য হয়েছে বিপুল অথচ এদেশে মুসলিম শাসনামলে মুসলমানদের মধ্যে সুদ চালু ছিলনা কিন্তু ইংরেজী শাসনামলে তাদেরই সহযোগিতা ও তৎপরতায় এদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সুদের অনুপ্রবেশ ঘটে। এখান থেকে পরিত্রাণের উপায় –

→ সুদ ভিত্তিক বাণিজ্যিক লেনদেন বন্ধ করে দিতে হবে। এটা যে সম্ভব তা ইতিমধ্যে এদেশের ইসলামী ব্যাংক সমূহ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে প্রতিযোগিতামূলকভাবে সাফল্যের সাথে কাজ করে দেখাচ্ছে। এ সাফল্যকে আরও বিস্তৃত ও সূদূর প্রসারী করতে হলে আরও বেশী সংখ্যক ইসলামী ফাইন্যান্সিয়াল প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

৩) গরীব কৃষকরা কৃষি কাজের জন্য সুদি ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে। কিন্তু বছর শেষে দেখা যায় তারা যে ফসল পায় তার অর্ধেক চলে যায় মহাজনের গোলায়, আর বাকী অর্ধেক ব্যাংকের সুদ আসলেই শেষ। শেষ পর্যন্ত এধরণের গরীব কৃষককে শূন্য হাতে দীর্ঘ নিঃশেষ ফেলে ঘরে উঠতে হয়।

→এক্ষেত্রে কৃষকদের জন্য সরকারী কোষাগার হতে কর্যে হাসানা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪) যাকাত আদায় এবং তা সুষ্ঠুভাবে বন্টনের জন্য আমাদের দেশে তেমন কোন সরকারী ব্যবস্থা নেই। যার কারণে সঠিকভাবে যাকাত আদায় হয়না আর আদায় না হলে বন্টন হবার প্রশ্নই উঠে না।

→যাকাত নামাজ-রোযার মতই ফরয ইবাদত সুতরাং যাকাতের গুরুত্ব মানুষকে বুঝাতে হবে এবং সরকারীভাবে আদায় বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫) ব্যবসায় অসাধুতা হচ্ছে আমাদের দেশের আরেকটি মারাত্মক ব্যাধি। মাপে কম, পণ্যে ভেজাল, ভাল পণ্যের নকল করা, কর ফাকি দেয়া, কালোবাজারী এ ধরণের অসাধুতা অর্থনৈতিক অবস্থাকে ভয়ানক নাজুক করে তুলেছে।

→এর প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে একদিকে যেমন দেশে বিদ্যমান আইনের সুষ্ঠু ও ত্বরিৎ প্রয়োগের জন্যে জোর দাবী তুলতে হবে, গণ সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, তেমনি অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধেও গড়ে তুলতে হবে সামাজিক সচেতনতা, ক্ষেত্র বিশেষে সামাজিক প্রতিরোধ, সামাজিক প্রতিরোধের মাধ্যমেই কেবল কালো-বাজারী, চোরাচালানী ও মজুতদারী উচ্ছেদ সম্ভব।

৬) ঘুষ ও অন্যান্য অবৈধ উপায়ে আয় সামাজিক শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টির অন্যতম কারণ, ঘুষের অনুপ্রবেশ গোটা প্রশাসন, বিচার ও আইন প্রয়োগকারী ব্যবস্থাকে ঘুনে ধরা কাঠেরমত ধ্বংশ করে ফেলে। ঘুষের অর্থে একজন নিম্নমান সরকারী কর্মচারীর ঢাকা শহরে বহুতলা বিশিষ্ট বাড়ী-গাড়ী হয়। ইন্সেপেক্টর অফিসার থেকে শুরু করে আমলারা পর্যন্ত ঘুষের টকায় প্রচুর দামী দামী বাড়ী, গাড়ী বউয়ের গলার নিত্য-নতুন ডিজাইনের গহণা হয়। শুধু তাই নয় এদেশের এম,পি, এমনকি বড় বড় মন্ত্রীরাও ঘুষের টাকা দিয়ে করেছে বিনোদন কেন্দ্র বাগান বাড়ী তৈরী করেছে। বোম্বাই থেকে শুরু করে লণ্ডন-ওয়াশিংটনেও ঘুষের টাকা দিয়ে তারা বিলাস বহুল বাড়ী করছে। ঘুষের যতরকম রূপ সম্ভব দেশে তার সবকটিই প্রচলিত আছে। ঘুষের এই কুৎসিত রূপ এদেশের প্রায় সকল জনগণের কাছে এখন স্পষ্ট। আর এ কারণেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দূর্নীতিতে বাংলাদেশ এখন শীর্ষে।

→এ অবস্থা নিরসনের জন্যে চাই আল্লাহর আইন, সৎ লোকের শাসন, একদিকে যেমন খোদাভীরু ও যোগ্যলোক প্রশাসন, আইন, বিচার ও অন্যান্য বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করবে অন্যদিকে তারা ফয়সালা করবে আল্লাহর আইন অনুসারে। এদেশের অর্থনীতিতে বৈষম্য দূর করে মানুষের সত্যিকার কল্যাণ ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধানের জন্যে যেসব আইন বলবত আছে অন্ততঃ সেগুলোর প্রয়োগ যেন যথাযথভাবে হয় তার চেষ্টা চালাতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭) বেহুদা খরচ সম্পর্কে মহান খুলাফায়ে রাশেদুন (রাঃ) এতদূর সতর্ক ছিলেন যে মিশরের গভর্ণর তাঁর সরকারী বাসভবনের প্রাচীর তৈরী করলে তাকে পদচ্যুৎ করা হয়। আর সেই প্রাচীরও ধুলিসাৎ করা হয় খলীফার নির্দেশে। খলীফা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) সরকারী কর্মকর্তাদের নিদের্শ দিতেন লেখার জন্য কলমের নিব সরু করে নিতে এবং কাগজের মার্জিনেও লিখতে। উদ্দেশ্যে ছিল সরকারী সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়া। অথচ আজ প্রবাদ বাক্যের মত চালু হয়ে গেছে– "সরকারকা মাল দরিয়া যে ডাল"

দুর্ণীতির কবলে পড়ে দেশের শিল্প আজ ধ্বংশের মুখোমুখি সার কেলেঙ্কারীর ফলে সার রফতানীকারী. দেশের নিরীহ কৃষক লাশ হয়ে ঘরে ফিরে গেছে। এজন্য দায়ী সীমাহীন দূর্ণীতি ও অপরিমেয় লোভ।

→এধরণের দূর্ণীতি থেকে উত্তোরনের উপায় হল শরীয়াহ সম্মত জীবনযাপন এবং ধর্মীয় অনুশাসনে জীবন পরিচালনা করণ সাথে সাথে নতুন প্রজন্মের তরুন, যারা সাহস, শক্তি, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠারদ্বারা সবধরণের সামাজিক অনাচার দূর্ণীতি ও কালো টাকার প্রতিরোধ করতে সক্ষম। সঙ্গে সঙ্গে জনমত গড়ে তোলা ও অন্যায়ের প্রতিবাধ করার জন্য দূর্বার আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের পবিত্র দায়িত্বও গ্রহণ।

৮) বাংলাদেশ যেহেতু ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক পরিচালিত নয় সেহেতু অর্থনীতির ক্ষেত্রে শরীয়তের যাবতীয় আইন একই সাথে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়, তবে এদেশের জনগণ প্রকৃতগতভাবেই ধর্ম পরায়ন, তাই এক্ষেত্রে যদি অর্থনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী যেমন– ফারায়েজ, মীরাসী আইন, শ্রমনীতি প্রভৃতির বাস্তবায়ন করতে পারলে মনস্তাত্ত্বিকভাবেই মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আরও বেশী তৎপর হবে ইসলামের অন্যান্য সু-বিচারপূর্ণ আইনের সুযোগ গ্রহণের জন্যে। তাহলে অর্থনীতির সমস্যার ইসলামী সমাধান অনেকখানি সহজ হয়ে যাবে।

৯) মানুষের মৌলিক চাহিদা – খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা এই পাঁচটি প্রয়োজন পূরণে এদেশের কোন সরকারই এখনও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। এই সুযোগে গরীব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহায্যে ঈমান হরণকারী এনজিওগুলো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

→এর মোকাবিলায় আমাদের আন্তরিকতার সাথে তৎপর হয়ে ইসলামের আলোকেই গভীরভাবে ভাবতে হবে–কিভাবে এই পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজনের সু-ব্যবস্থা করা যায়। এজন্যে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে, কেননা খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি অপরিহার্য। ইসলামের ভূমিস্বত্ব, ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং ভূমি রাজস্বের বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতা সম্বন্ধে জনসাধারণকে বুঝাতে হবে।

বস্ত্রখাতের নাজুক অবস্থা দূর করে, উৎপাদনও বিতরণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। প্রকৃত তাঁতীদের কর্যে হাসানা প্রদান, উপযুক্ত সমবায় সমিতি গঠন, কঠোরভাবে চোরাচালান দমন এবং অসম প্রতিযোগিতার পথ রুদ্ধ করা জরুরী।

দেশের বিপুল সংখ্যক জনগণের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। এর প্রতিকারের জন্যে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা, ইসলামী এনজিও গঠন, যাকাতের অর্থের পরিকল্পিত ব্যবহার এবং ইউনিয়ন পর্যায় গৃহনির্মাণ ঋণদানের জন্যে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নেই হেল্‌থ কমপ্লেক্স তৈরী হয়েছে অথচ সেখানে প্রয়োজন মাফিক ডাক্তার নেই। সারা দেশেই ডাক্তার সংকট। জনসাধারণ ন্যুনতম চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত। দেশের টাকায় ডাক্তার হয়ে সেবা প্রদান করে মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য দেশে।

এই অবস্থার নিরসন হওয়া জরুরী আর্ত মানবতার সেবায় আমাদের ডাক্তারদের উদ্বুদ্ধ করে, গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্য-সুবিধা, পুষ্টি শিক্ষা ও প্রতিষোধকের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড-ব্রেইন- এই তপ্ত বাক্য বেশী আওড়ানোর চেয়ে এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটানো প্রয়োজন। শিক্ষাঙ্গন থেকে সকল ধরণের দুর্নীতি, সন্ত্রাস, অস্ত্রের ঝনঝনানি দূর করে, শিক্ষার মান উন্নত করে, জাতির ভবিষ্যত ছাত্র সমাজকে নৈতিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় আয় ও বন্টনের যেসব পদ্ধতি আলোচনা করা হল তা বাস্তবায়িত হলে, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব, বস্তুনিষ্ঠতা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সর্বাধিক ফল প্রসূ এবং মানবিক গুনাবলী অর্জনে এর ভূমিকা, সর্বোপরি মানুষের সার্বিক জীবনে শান্তি–শৃঙ্খলা বজায় এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধি অর্জনে সফল হবে। নবী করীম (সঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে ও পরবর্তী সময়ের যতদিন ধরে এ অর্থ ব্যবস্থা বাস্তবায়িত ছিল, ততদিন পর্যন্তই সবচেয়ে বেশী সুখ-শান্তি বিরাজ করছিল। এখনও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। এজন্য যুগপৎ ব্যক্তি ও সরকারকে উদ্যোগী, সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাসহ তৎপর হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আদল ও ইহসান প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই সম্পদ আয় ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর হতে পারে এবং আয় ও কর্মসংস্থানের পথ সকলের জন্য উন্মুক্ত হতে পারে। এর ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও ভারসাম্যহীনতা দূর হয়ে একটি সমৃদ্ধ, গতিশীল ও সুস্থ অর্থনীতি বিনির্মাণের পথ সুগম হবে।

বর্তমান সময়ে বিশ্বে যে ক'টি অর্থব্যবস্থা প্রচলিত আছে তার মধ্যে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ব্যতিত অন্য কোনটিতেই প্রকৃত শান্তি নেই। কেননা পুঁজিবাদের নীতিতে যেখানে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও পরকালীন সুখ শান্তিকে পরিহার করে বৈষয়িক উন্নতিকেই প্রধান্য দেয়া হয়। ব্যক্তি স্বার্থ ও জাগতিক ভোগ বিলাসিতাই জীবনের শেষ চাওয়া, সেখানে প্রকৃত শান্তি আসতে পারেনা। কারণ পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্য হলো – চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য। বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের ছলে বিশ্বকে শোষনের কৌষল গ্রহণ; যুগপৎ চরম দারিদ্র ও ভোগ বিলাস পূণঃ জীবনযাপন। এনজিও কালচার পত্তনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে শোষনের কৌশল এবং ইসলাম ধর্মের প্রতিরোধে সমাজতন্ত্রের সাথে অভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ইত্যাদি।

অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা মানুষকে যে শান্তির বানী শুনিয়েছিল তা তার পিছনে যে ধোকাঁবাজী নীহিত ছিল তা যখন প্রমানীত হয়ে যায় তখন সমাজতন্ত্রের মেরুদন্ড ভেংগে চূর্নবিচূর্ন হয়েছে। কেননা তাদের আপ্তবাক্য হলো লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রত্যরনা শঠতা ছলনা হত্যা কোন কিছুই অন্যায় নয়।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার মধ্যে নেই কোন ধরনের হঠকারীতা,ছলনা, জুলুম-নির্যাতন এ অর্থ ব্যবস্থা বাস্থবায়নের মধ্যেই রয়েছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে অনাবিল শান্তি। তাই আমরা যারা ইসলামের অনুসারী রয়েছি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো সকলের প্রচেষ্টায় ইসলাম বিরোধী শক্তিকে প্রতিহত করে ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন করা। পরম করুনাময় আল্লাহ তা'য়ালার কাছে প্রার্থনা। আমরা যেন সে লক্ষ্যেই পৌঁছতে পারি। আমিন ॥

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থাবলীর তালিকা

০১। তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ), আধুনিক প্রকাশানী, ঢাকা, ১৯৯১

০২। তাফসীরে মা'আরীফুল কুরআন, হযরত মাওলানা মুফতী মুহম্মদ শফী (রহঃ), ই.ফা.বা. ১৯৮৮

০৩। আল-কুরআন সঞ্চায়ন, ডাঃ ফরিদ উদ্দিন আহমদ, আল মা'রূফ পাবলিকেশন্স, ১৯৯২

০৪। বুখারী শরীফ, আবু আব্দুল্লাহ মুহম্মদ ইব্ন ইসমাইল আল-বুখারী আল-জুফী (রহঃ), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ই.ফা.বা. ডিসেম্বর ১৯৮৯

০৫। মুসলিম শরীফ, ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নিশা পুরী (রহঃ), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, ই.ফা.বা. জুন ১৯৯২

০৬। কাজী আবু ইউসুফ (১৩২০ হিঃ) কিতাবুল খারাজ

০৭। ডঃ মুঃ ইয়াসীন মাজহাব সিদ্দিকী, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সরকার কাঠামো, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৪

০৮। মাওলানা আবু তাহের মেছবাহ্, আল-হিদায়া (বঙ্গানুবাদ) ঢাকা, ই.ফা.বা. ১৯৯৮

০৯। ইমাম আবু উবায়দ আল-কাসিম ইব্ন সাল্লাম (রঃ), কিতাবুল আমওয়াল, ১ম খন্ড, অনুবাদ, ফরিদ উদ্দিন মাসউদ - ১৯৯৭

১০। ইসলামী বিশ্বকোষ

১১। শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, ইসলামী অর্থনীতিঃ নির্বাচিত প্রবন্ধ, (১৯৯৬, স্কয়ার পাবলিকেশনস, রাজশাহী)।

১২। মোঃ আব্দুল হামিদ, ইসলামী অর্থনীতি (১৯৯৯, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা)।

Dhaka University Institutional Repository

১৩। মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, ইসলামী অর্থনীতি (১৯৮৭, খায়রুল প্রকাশনী)।

১৪। মুহাম্মদ আঃ মান্নান চৌধুরী, ইসলামী অর্থনীতি, রূপরেখাঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ, অনুবাদঃ আলী আহম্মদ রুশদী (ঢাকা ইসলামিক ইকোনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো ১৯৮৩)।

১৫। শামসুল আলম, ইসলামী অর্থনীতির রূপ রেখা, (ঢাকা, ই.ফা.বা. ১৯৮৭)।

১৬। আব্দুল খালেক, অর্থনীতি ব্যবস্থায় যাকাত, (ঢাকা, ই.ফা.বা. ১৯৮৭)।

১৭। সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী, ইসলামী অর্থব্যবস্থার মূলনীতি, অনুবাদঃ আব্দুল মান্নান তালিব (ঢাকা, খোশরোজ কিতাব মহল, ১৯৭৬)।

১৮। মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামী সমাধান, (খায়রুল প্রকাশনী)।

১৯। শাহ্ মোঃ আব্দুল হান্নান, ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা (ঢাকা সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৭)।

২০। মুফ্তী মুহাম্মদ শফী, ইসলামের অর্থ বন্টন ব্যবস্থা, অনুবাদঃ ফরিদ উদ্দিন মাসউদ, ই.ফা.বা. ঢকা, ১৯৮৬)।

২১। মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান চৌধুরী, ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা, তথ্য ও প্রয়োগ, (মাইজ ভান্ডার দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম, ১৯৯৮)।

২২। এম এ হামিদ, পল্লি উন্নয়নে বাংলাদেশ, (মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৮৮)।

২৩। শেখ মাহমুদ আহমদ, ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান, অনুবাদঃ গুলশান মুহাম্মদ আব্দুল হাই, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৭৬)।

২৪। ডক্টর মুহাম্মদ ইসুফুদ্দীন, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, ১ম ও ২য় খন্ড, অনুবাদঃ আব্দুল মতিন জালালাবাদী, (ই.ফা.বা. ঢাকা, ১৯৮০)।

Dhaka University Institutional Repository

২৫। ইউসুফ আল কারযাভী, ইসলামের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, অনুবাদঃ আব্দুল কাদের, (সুজন প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯১)।

২৬। ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, অনুবাদঃ মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, শাহ্ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, (ঢাকা, ইনষ্টিটিউট অব ইসলামিক থট, ২০০০)।

২৭। হিফজুর রহমান, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অনুবাদঃ আব্দুল আউয়াল, (ই.ফা.বা. ঢাকা, ১৯৬৫)।

২৮। ইরফান মাহমুদ রানা, হযরত উমর (রাঃ) এর শাসন আমলে অর্থব্যবস্থা, অনুবাদঃ জয়নাল আবেদীন মজুমদার, (ই.ফা.বা. ঢাকা, ১৯৯০)।

২৯। আল-কুরআনে অর্থনীতি, ১ম ও ২য় খন্ড, সম্পাদক মন্ডলী, (ই.ফা.বা. ঢাকা, ১৯৯০)।

৩০। সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ, (আধুনিক ও প্রকাশনী, ২০০২)।

৩১। ইসলামে যাকাত ব্যবস্থা, (ই.ফা.বা. ঢাকা, ২০০৫)।

৩২। সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী, ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা, অনুবাদঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, (আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫)।

৩৩। আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, ইসলামের যাকাত বিধান, দ্বিতীয় খন্ড, মুহাম্মদ আঃ রহীম, (খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৪)।

৩৪। ইসলামী অর্থনীতি, গবেষণা বিভাগ, (ই.ফা.বা. ঢাকা, ২০০৪)।

৩৫। ইসলমিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, (৭ম খন্ড, সংখ্যা ১, জুন, ১৯৯৯)।

৩৬। ইসলমিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, (৮ম খন্ড, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর, ১৯৯৯)।

৩৭। সামষ্টিক অর্থনীতি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৬।

৩৮। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০০৫।

Dhaka University Institutional Repository

অভিসন্দর্ভে ব্যবহৃত বাংলা, ইংরেজী ও আরবী সাংকেতিক নির্দেশনা

(আঃ)	– আলাইহিস সালাম
(সঃ)	– সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাম
(রাঃ)	– রাদিয়াল্লাহু আনহু
(রহঃ)	– রহমাতুল্লাহি আলাইহি
তাং	– তারিখ
তা.বি	– তারিখ বিহীন
ইং	– ইংরেজী
হিঃ	– হিজরী
বাং	– বাংলা
খৃঃ	– খ্রীষ্টাব্দ
পৃঃ	– পৃষ্ঠা
ডঃ	– ডক্টর
ই.ফা.বা.	– ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
১ম খন্ড	– প্রথম খন্ড
২য় খন্ড	– দ্বিতীয় খন্ড
মেঃটন	– মেট্রিক টন